# বিচিত্র প্রসঙ্গ

MOHARAJA … LIBRARY
18 FEB 193
COOCH BEHAR

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

মূল্য পাঁচ সিকা।

কলিকাতা
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

---

কলিকাতা
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা
মুদ্রিত

---

১৩২১

# আমার নিবেদন।

দুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথাগুলা প্রকাশ পাইবার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত সেগুলাকে বাহির করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না।

বাহির না হইলে হয়ত ভালই হইত। অসুস্থ দেহে বিপিন বাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে যা' কিছু মনে আসিয়াছে, তাই বলিয়া গিয়াছি। প্রাসঙ্গিক হইল কি না, বিবেচনা করি নাই। কেবল স্মরণ শক্তির উপর ভর দিয়াই বলিয়াছি; পুঁথিপত্র দেখিয়া মিলাইতে পারি নাই। সে জন্য যদি ভুলচুক ঘটিয়া থাকে, তাহা থাকিয়াও গেল।

যাহা কিছু বলিয়াছি উহার অধিকাংশই আমার suggestion মাত্র; সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও বলিনা। সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে যে প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক, তাহা ইহাতে নাই; আমার মনে যাহা আছে, সব কথা বলিতেও পারি নাই। কথাচ্ছলে ইহার অধিক সম্ভবও হয় নাই। যদি আমার উক্তির মধ্যে কিছু পদার্থ থাকে, অন্যে প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা ফলাইয়া তুলিবেন; এই আমার আশা।

আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ misconception চলিত আছে; এতদ্দ্বারা যদি তা'র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই আমার প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নিরূপণে কতকটা প্রয়াস করিয়াছি; বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইবারও কতকটা চেষ্টা করিয়াছি। আমার এই চেষ্টায় যদি কোন

আঁধার জায়গায় আলো পড়ে, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সাধিত হইবে।

এত বড় কথা গুলা এত অল্প চেষ্টায় বুঝান যায় না। আমিও যে বুঝাইতে পারিয়াছি, এমন দুঃসাহস করি না। ভাষার দোষে অনেক জায়গায় হয়ত অসঙ্গতি বাহির হইবে। আমার বন্ধুগণ হয়ত বহুস্থলে আমার মতিভ্রমের আশঙ্কা করিবেন। তবে নিজের পক্ষে এইটুকু বলিতে পারি যে, যে কথাগুলা বলিয়াছি, আমার মনের মধ্যে তাহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। আমার নাই বলিয়া অন্যকেও মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ অন্যায় আব্দার করিব না।

ভাষার সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। অনেক ইংরেজি শব্দ কথার মুখে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বিপিন বাবুও তাহার কতক রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা রুচিবিরুদ্ধ। সাহিত্য পরিষদের স্থাপনার সময়ে ৺রাজনারায়ণ বসু পরিষদে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার মধ্যে যে ব্যক্তি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করে, he should be hung, drawn, and quartered." ঠিক্ কথা, উহাই উচিত শাস্তি; তবে রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গলা চিঠিতে ঐ উপদেশ দিতে গিয়াও ইংরেজি ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। তিনি যদি এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পান, আমিও পাইতে পারি।

কলিকাতা<br>ভাদ্র ১৩২১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

# বিচিত্র প্রসঙ্গ

## ১

শ্রাবণ মাসে একদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কক্ষে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। কবিবর "শ্রাবণে ডেপুটিপনায়" আপত্তি করিয়াছেন, রুদ্ধকক্ষে আলোচনায় আপত্তি ত করেন নাই। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। রোগশয্যায় শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রামেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমার অনেক কথা বলিবার ছিল ; বোধ হয় আর বলা হ'ল না। আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা, ব্রাহ্মণ্য সমাজের কথা আমার অনেক বলিবার ছিল। যখন সামর্থ্য ছিল, তখন লিখিলাম না ; লিখিতে পারিলে হয় ত দুটো নূতন কথা শুনাইতে পারিতাম।"

আমি বলিলাম "আজ পর্য্যন্ত একটা ভাল রকম ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইল না, ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! মারামারি, কাটাকাটি, বিপ্লব, বিদ্রোহ, হূণ, শক, মোগল, পাঠান, এ সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তবুও যেন যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাসটাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম প্রথম য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে এ দেশের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একখানা ইতিহাস

খাড়া করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের ইতিহাস লুপ্ত। ইদানীং দেখিতেছি কেহ কেহ প্রাচীন খোদিত লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে কিছু কিছু নূতন কথা শুনাইতেছেন; কেহ কেহ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের সাহায্যে আমাদের ইতিহাসের ধারা নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আর্টের দিক হইতে, ললিত কলার দিক হইতে ভারতের সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেহ যে আজ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এমন ত আমার বোধ হয় না। অথচ নব নব যুগের নবীন ভাবোন্মেষের প্রভাবে সেই যুগের cultural development কতটা হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সুকুমার কলায় যতটা ধরা পড়ে এমন আর কিছুতেই ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের প্রাচ্য সুকুমার কলার নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করি। ইটালীয় ও গ্রীসীয় আর্টকেই আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। আর আমাদের ভাবুক সাধকের হৃদয়-পদ্মাসনে "কোন দূর অতীতের কোন এক অখ্যাত দিবসে" সমগ্র জনগণপতির কলাবধূ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আজ সে কথার আলোচনা করিবার অবসর পর্য্যন্ত কাহারও নাই। আমরা তাঁহাকে বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম; সহসা কোথা হইতে একজন বিদেশী পূজারী আসিয়া তাঁহার অলক্তকরাগ-রঞ্জিত চরণচিহ্নের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হ্যাভেল সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়া বিলাতের টাইম্‌স্ চমকিয়া উঠিয়াছে, প্রয়াগের পাইয়োনীয়র অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন ভারতের কলালক্ষ্মীকে মুসলমান বরণ করিয়া লইয়াছিল। আগ্রার তাজমহল এতদিন Saracenic artএর চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল; হ্যাভেল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন,—চারি কোণে চারিটি ছোট গম্বুজ আর মধ্যস্থলে বড় গম্বুজ,—

জগতের কুত্রাপি Saracenic artএর এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি? অথচ ভারতের পূর্ব্বতন শিল্পশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়; হিন্দুশিল্পীরা তাজ গড়িয়াছিল হিন্দু শিল্পের আদর্শে, এত বড় কথাটা এত দিন আমরা কেহই ধরিতে পারি নাই। কিন্তু এই শিল্পকলার মধ্যে আর্য্যজাতির ইতিহাস কিরূপভাবে প্রচ্ছন্নস্তরবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। এই যে আমাদের বঙ্গদেশের অনতিদূরে জগন্নাথদেবের মন্দির রহিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কৌতূহল অল্পেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইজিপ্টের স্বপ্নাবিষ্ট Sphinx মূর্ত্তির সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণামূলক আলোচনা পণ্ডিতসমাজে হইয়াছে; কিন্তু উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে বীভৎস erotic figuresএর সমাবেশ কেন হইল, এই প্রশ্ন উত্থিত হইবামাত্রই আমরা তাহাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছি; অনেকে স্থির করিয়াছেন যে উহা আর কিছু নহে, কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই?

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি আজ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির-গাত্রে ঐ সকল বীভৎস মূর্ত্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন; কখনও কাহারও কোনও দ্বিধাবোধ হয় না। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের শিব মন্দিরে,—কণারকের সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে, এই প্রকার বীভৎস মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

আমি বলিলাম—"তমলুকের বৃহৎ প্রাচীন বর্গভীমাদেবীমন্দিরের গাত্রে

একস্থানে ঐ প্রকার একটি বীভৎস মূর্ত্তিসমাবেশ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।”

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—“নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিল্পকলার উহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যদি অন্যত্র কোথাও ঐরূপ মূর্ত্তিসমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, সে সকল উড়িষ্যার শিল্পকলার অনুকরণের ফলস্বরূপ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুরাতন পুঁথি পাইয়াছেন, বোধ হয় খ্রীষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিল্পশাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দিরনির্ম্মাণসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। মন্দিরগাত্র সুশোভন করিবার জন্য এইরূপ erotic figuresএর আবশ্যকতা লিপিবদ্ধ করা আছে। উড়িষ্যার দেবমন্দিরগুলি যাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে গঠন-কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া দেশী ও বিদেশী কোনও কোনও মনীষি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Antiquities of Orissa নামক গ্রন্থে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই; কিন্তু যতদূর স্মরণ হয়, স্যর উইলিয়ম হণ্টার তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্ত্তি বৈষ্ণবধর্ম্মসম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জগন্নাথের মন্দির বৈষ্ণবদের প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ; কাজেই সেখানে যে বৈষ্ণবের সাধনা পদ্ধতির অনুরূপ আদিরসাশ্রিত চিত্র চিত্রিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

“কিন্তু স্যর উইলিয়ম হণ্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রধান আপত্তি এই যে, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোনও কিছুরই আভাস এই সকল মূর্ত্তির সমাবেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; কোনও প্রকারেই এগুলিকে কোনও

একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না। এই চিত্রগুলা এতই জঘন্য, এতই অশ্লীল, যে ইতর সাধারণ নরনারীর কুৎসিত পাশবতা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না। এ গুলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বোধ হয় কোনও বৈষ্ণবেরও মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিবে না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি ইহা বৈষ্ণবঘটিত ব্যাপারই হইবে, তাহা হইলে ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরের ও কণারকের সূর্য্যমন্দিরের গাত্রে ঐরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল কেন?

"হণ্টারের কথা ছাড়িয়া দিই; বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার অনুমান অমূলক। আর একটা মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ এই মূর্ত্তিগুলির সহিত লিঙ্গপূজার (phallic worship) সম্পর্ক পাতাইতে পারেন।

"লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী, এ কথা সত্য। সভ্যতার আদিম যুগে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল,—সৃষ্টিতত্ত্ব; এখনও আমরা কি সেই সৃষ্টি-প্রহেলিকাসম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে পারিয়াছি! কিন্তু তখন মানুষ সৃজন প্রক্রিয়ার স্থূল symbol এর পূজা করিয়া সৃজনরহস্যের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়াছিল। সর্ব্বত্র লিঙ্গপূজা প্রচলিত হইল।

"প্রাচীন মিশরে লিঙ্গপূজা নানা আকারে প্রবর্ত্তিত ছিল। বিশেষতঃ আইসিস অসাইরিসের পূজায় ভারতবাসীর একটু ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ আছে। ঈর্ষাপরবশ দৈত্য অসাইরিসকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া নীলনদের ধারে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল; স্বামীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া আইসিস একটি একটি করিয়া তাঁহার মৃত স্বামীর দেহখণ্ড খুঁজিয়া বাহির করিলেন; তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর একটি অঙ্গ কোথাও পাইলেন না। মিসরের অধিবাসী কিন্তু আইসিস অসাইরিসের পূজায় লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা করিয়া সে সমাস্ত

পূরণ করিয়া লইল। আইসিস সব পাইলেন, কিন্তু সৃজন-রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন না ; যদি পারিতেন, তাহা হইলে জীব হয়ত মুক্তিতত্ত্বও বুঝিতে পারিত। কিন্তু সেই বিপুল রহস্য মিসরবাসীর নিকট চিরকালের হেঁয়ালি রহিয়া গেল। কেবল অসাইরিসের দেহখণ্ড যেখানে যেখানে নিপতিত ছিল, সেই সকল স্থান মিসরের পীঠস্থানরূপে পরিণত হইল।

"ভারতবর্ষের বায়ান্ন পীঠের কথা মনে পড়ে না কি? কাহিনীটি ভারতে ও মিসরে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সেখানে স্ত্রী স্বামীর দেহের খণ্ডাংশগুলির অন্বেষণ করিতেছেন; এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। অসাই-রিসকে মিসরবাসীরা কখনও মেষ কখনও বা বৃষরূপে কল্পিত করিয়াছে; আইসিসকে ভগবতী গাভীরূপে পূজা করিয়াছে। আবার এমন একদিন ছিল যখন আইসিস দেবী সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন,—সঙ্গিহীনা, কাহাকেও তিনি স্বামীরূপে বরণ করেন নাই ; একাকিনী আপন মায়াপ্রভাবে একটী পুত্র প্রসব করিলেন, এবং সেই শিশুটিকে শরবনে স্তন্যপান করাইয়া-ছিলেন। একদিন সেই পুত্র তাহার পিতৃহন্তারক টাইফন দৈত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। আমাদের দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা মনে পড়িয়া যায় না কি ?

"দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞোৎসব উপলক্ষে যখন মহা ধুমধাম হইতেছিল, তখনই সতীর দেহত্যাগ হয়। পিঙ্গলকেশ, শ্বেতচর্ম্ম, টাইফন ও আনন্দোৎ-সবের মধ্যে অসাইরিসক হত্যা করিয়াছিল ; দিগ্বিজয় করিয়া অসাই-রিস প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর টাইফন তাঁহাকে একটি বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন ; বহু রাজকর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিল ; সেখানে কৌশল করিয়া তাঁহাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পূরিয়া ফেলা হয়। পরে তাঁহার দেহ দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিল।

"কিন্তু আসল কথাটি এই যে অসাইরিস প্রথমে ভগবান বৃষরূপে পূজিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার পূজা লিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়া দাঁড়াইল।

"এ ত গেল মিসরের কথা। আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেষ্টাইন সর্ব্বত্রই কোনও না কোনও আকারে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের ডাইওনীসিয় উৎসব, রোমানদিগের ব্যাকাসপূজা, সর্ব্বত্রই ঐ ব্যাপার দৃষ্ট হয়; রোমের গণতন্ত্ররাষ্ট্রের শেষাবস্থায় ও সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় ইহার বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যতটা স্মরণ হয়, ঋগ্বেদের এক স্থানে একটা শব্দ আছে 'শিশ্ন দেবাঃ'। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কথাটিকে লিঙ্গ-পূজক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অর্থ সায়ণাচার্য্য অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, উহার অর্থ কদাচারী মানুষ; উহার অর্থ লিঙ্গপূজা নহে।"

রামেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম "দেখুন, দাক্ষি-ণাত্যের East and West পত্রিকা যে বৎসর প্রথম প্রকাশিত হইল, সেই বৎসর Artaxerxes নাম স্বাক্ষর করিয়া একব্যক্তি ওঁ শব্দের এক চমৎকার অর্থ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহা আর কিছুই নহে—"সৃষ্টিরহস্যের আনন্দের পরিচায়ক বৃষের আনন্দধ্বনি মাত্র!" একটু হাসিয়া রামেন্দ্র বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমি বলিতেছিলাম যে, বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে বৈদিক সময়েও symbol of repro-duction ব্যবহৃত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে আছে। যজমান যখন যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার পুনর্জন্ম হইত। সাহিত্যপরিষদের জন্য যখন আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদ

করিয়াছিলাম, তখন এ বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগিয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থে সেই পুনর্জন্ম ব্যাপারটিকে যজ্ঞের নানাবিধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষসংসর্গঘটিত নানা প্রক্রিয়ার বর্ণনার দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যদি কাহারও কৌতূহল হয়, তিনি আমার অনুবাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবর্গ্য নামক অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিলেই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"পরবর্ত্তী যুগে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে যে জগতের উৎপত্তি এই তত্ত্বটি বৈষ্ণবেরা একদিকে ও শাক্তেরা অন্যদিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। বেদান্তের মায়াও স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ম হইলেন সাংখ্যের পুরুষ; বেদান্তের মায়া হইলেন সাংখ্যের প্রকৃতি। বৈষ্ণব ও শাক্ত বিভিন্ন দিক হইতে এই ভাবটি পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, শাক্তেরা ঐ মায়া বা প্রকৃতিকে সৃজনীশক্তি বা বিশ্বজননী ভাবে কল্পনা করিয়া সেই দিক হইতে সে তত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহাদের মতে বেদান্তের ব্রহ্ম সাংখ্যের পুরুষের মত মায়া বা প্রকৃতিতে উপগত হইয়া সৃজন করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা কিন্তু ঐ মায়া বা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের অথবা পুরুষের হ্লাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া লীলার দিক হইতে, আনন্দের দিক হইতে, সেই ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন;—লীলাময় পুরুষ আপনার মায়ার সংযোগে আনন্দ অনুভব করেন; মায়ার সহিত তিনি এইরূপ নিত্যসম্বদ্ধ আছেন বলিয়াই তিনি আনন্দময় পুরুষ। আধুনিক বৈষ্ণব ও শাক্ত—বিশেষতঃ বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তান্ত্রিকবৈষ্ণব, ও বামাচারী, কৌলাচারী, প্রভৃতি তান্ত্রিক শাক্ত,—এই ভাবটিকে এত নূতন রকমে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন, যে তাহাতে অনেকের জুগুপ্সার সঞ্চার হয়।

"কেহ কেহ বোধ হয় মনে করিয়া থাকেন যে বৌদ্ধধর্ম্মে এই সকল ভাব প্রবেশ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব। সেখানে হ্লাদিনী কিম্বা বিশ্বজননী শক্তির স্থান কোথায়? কিন্তু একটু স্থির হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যাহা অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের স্তরে স্তরে এই সকল ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

"যাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ লইতে হইত;—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। কালক্রমে কিন্তু একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল,—'ধর্ম্ম' রূপান্তরিত হইয়া 'প্রজ্ঞা' নামে পরিচিত হইলেন; প্রজ্ঞার স্ত্রীমূর্ত্তি কল্পিত হইল। বুদ্ধও বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন; ধর্ম্ম প্রজ্ঞা নামে পরিচিত হইয়া বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যের প্রকৃতির তুল্য হইয়া গেলেন। এইরূপে মহাযানী বৌদ্ধমত সৃষ্ট হইল। কণিষ্কের সময়ে এই মহাযানী বৌদ্ধমত যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল।

"এই মহাযানী বৌদ্ধমতের পরিণাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম। অল্পে অল্পে ক্রমশঃ এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মকে জনসাধারণের গ্রাহ্য করিবার জন্য নানা নূতন তত্ত্ব ও নূতন অনুষ্ঠান দেশ বিদেশ হইতে আনিয়া উহার মধ্যে স্থান দিতে হইল।

"দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধ মহাযান বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান প্রভৃতি নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিল। সেই সকল দলের মধ্যে নানাপ্রকার গোপনীয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, আমাদের এই হিন্দু সমাজের বহু তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সেই সকল বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধ তন্ত্র ও হিন্দু তন্ত্র, কে কাহার নিকট ঋণী ইহা লইয়া একটা বিবাদ আছে। উভয়ের মধ্যে

সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। এই সকল মতের ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেরই বৈদিক মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু স্বদেশের ও বিদেশের অনেক অনার্য্য অনুষ্ঠানও যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সংশয় করা কঠিন। হিন্দু সমাজ সেই অনার্য্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য বৈদিক আচারের নিকট ঋণী নহে; বরং দেখা যায় যে, বৈদিক আচারের সহিত এই সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের যেন একটা বিরোধ রহিয়াছে। অন্ততঃ এই সকল হিন্দু তন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্রের নিকট ঋণী মনে করা যাইতে পারে।

"সভ্য জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানেই monastic life, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, গঠিত করা হইয়াছে, সেই খানেই গোল বাধিয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যখন সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন, তখন স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকিবে না এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও মাতা সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; অগত্যা তিনি রাজি হইলেন; কিন্তু তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম তাঁহার আশানুরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিবে না।

"এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। একটা জিনিষ প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দলবাঁধা সন্ন্যাসীর প্রশ্রয় দেয় না। আর এই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সহজ ব্যাপার ছিল না। সন্ন্যাস আশ্রম দ্বিজাতির শেষ আশ্রম; বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তবে সন্ন্যাস আশ্রমের সম্ভাবনা হইত; বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরিত্রগত দৌর্ব্বল্যের তেমন আশঙ্কা ছিল না। আর একটি সুন্দর অথচ কঠোর ব্যবস্থা ছিল। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থ প্রৌঢ় বয়সে উপস্থিত হইলে পৌত্রমুখ দর্শন

করিয়া, একাকী কিম্বা সস্ত্রীক বনে গমন করিতে পারিতেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে তাঁহার ভিক্ষা করিবার অধিকার নাই; লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হইত; বনজাত ওষধি ও ফলমূলদ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইত; কঠোর তপশ্চর্য্যারও ব্যবস্থা ছিল। আমার মনে হয় এই সমস্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা ছিল বলিয়া যে সে লোক হঠাৎ বনে যাইতে পারিত না। এই বানপ্রস্থের পর যিনি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন, তখন তিনি ভিক্ষার অধিকারী হইতেন; তখন তিনি লোকালয়ে আসিতে পারিতেন; তখন আর তাঁহার যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কোনও কিছুরই আবশ্যকতা থাকিত না।

"বেদে কিন্তু একটা ফাঁক ছিল। সেখানে দেখিতে পাই,—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

অর্থাৎ যখনই প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখনই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিত। কালক্রমে অনেকগুলি সন্ন্যাসীর দল সৃষ্ট হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই আজীবক নির্গ্রন্থ প্রভৃতি কতকগুলি সন্ন্যাসীর দল আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু মোটের উপর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুকূল নহে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বয়বাদ রক্ষার ও প্রচারের জন্য দেশ জুড়িয়া যে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠন করেন, তাহা বৌদ্ধগণের অনুকরণ।

"বুদ্ধ কিন্তু গোড়া হইতেই নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ জাতিনির্ব্বিশেষে, অধিকারী অনধিকারীর নির্ব্বাচন না করিয়াই তিনি সকলকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত করিলেন; দ্বিতীয়তঃ যুবা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে কোনও বয়সের যে কোনও ব্যক্তিকে তিনি নিজ

সম্প্রদায় মধ্যে টানিয়া আনিলেন; তৃতীয়তঃ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্য করিতে লাগিলেন; চতুর্থতঃ, দলবদ্ধ সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। এই সকল সন্ন্যাসীর দল বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত। বর্ষাকালে কয়েকমাস তাহারা একত্রে কোথাও বসবাস করিত। কাজেই ভূসম্পত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হইল। অনাথপিণ্ডকের নিকট হইতে স্বয়ং বুদ্ধই ভূমি গ্রহণ করিলেন; সেই ভূমির উপর সন্ন্যাসীদিগের বাসোপযোগী সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইল। অনেক ধনী গৃহস্থ উপাসক ও উপাসিকা ঐ সঙ্ঘের জন্য সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ভূসম্পত্তি, সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। এম্নি করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘ মধ্যে communism প্রবেশ করিল।

"এমন অবস্থায় কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না করিলে গোলযোগের যথেষ্ট সম্ভাবনা। য়ুরোপের মঠগুলিতে যেমন abbots, prior প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, এই সকল বিহারেও সেই প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয়পিটকে এই সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে। অনেকে আমাদের হিন্দুসমাজের ব্রত নিয়মাদির কঠোরতা দেখিয়া মনে করেন যে, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখিতে চাহিয়াছিল; বৌদ্ধ বিনয়পিটকের শাসনের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনের তুলনায় সমালোচনা যদি তাঁহারা করেন, তাহা হইলে ভাবিবার কথা অনেক পাইবেন।

"বিহার ও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইল; শাস্ত্রগ্রন্থও রচিত হইল; কিন্তু সামান্য খুটি নাটি লইয়া সঙ্ঘের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক হইতে

লাগিল; সঙ্ঘের ছোট বড় যাবতীয় অনুষ্ঠান লইয়াই তর্ক উঠিত; ধর্ম্মের doctrine লইয়াও বাদানুবাদ হইত। ইহার কারণ আর কিছু নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও Revealed Scriptures ছিল না, বুদ্ধের কথার উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, তিরোভাবের পরে হইয়াছিল। এই সকল বাদানুবাদের ফলে অনেকগুলি সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। গোল মিটাইবার জন্য বৌদ্ধ-সম্রাট্‌গণের আদেশে মহাসভা আহূত হইত। কণিষ্কের আহূত সভার পূর্ব্বেই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

"একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে;—বুদ্ধ নিজে একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু করেন নাই। কোন বেদবিরুদ্ধ আচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র, সাময়াচারিক সূত্র প্রভৃতি বৈদিক সূত্রে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে, মোটামুটি তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল; চীন, তিব্বত, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিল; তখন হইতেই বেদবিরুদ্ধ আচার ভারতের দেশাচারের সহিত মিশ্রিত হইল। বাকৃত্রীয় গ্রীক জাতি বৌদ্ধ হইয়া গেল; শকেরাও বৌদ্ধ হইল। কিন্তু গ্রীকেরা মূর্ত্তিপূজক ছিল; শকেরাও মূর্ত্তিপূজা করিত; কিন্তু যখন তাহারা বৌদ্ধ হইয়া গেল, তখনও মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিতে পারিল না; চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধের অস্থি পূজা, ভস্ম পূজা এবং পরে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, ফ্রিজিয়া, সাইপ্রস প্রভৃতি স্থানে Astarte Cybele প্রভৃতি দেবীর পূজায় নানা বীভৎস অনুষ্ঠান ছিল; এই সূত্রে তাহা ভারতবর্ষে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। এসিয়ার পশ্চিমে ও ইউ-

য়োপের পূর্ব্বাংশে সেকালে এক Mother of the Gods পূজা পাইতেন। তান্ত্রিক শক্তি-পূজার ও মাতৃ-পূজার সহিত ইহার কতটা সম্পর্ক কে জানে? লিঙ্গপূজা মিসরদেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ লাভ করিল, কি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দিগের নিকট হইতে আসিল, ইহারও আলোচনা হয় নাই।

"অশোকের রাজত্বকালে মিসর, কাইরীনি, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ-প্রচারক গিয়াছিল। নানাপ্রকারে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিল। গ্রীক, শক, কুশান, হূণ, আর্য্যাবর্ত্তে দেখা দিল; বহুকাল রাজত্ব করিয়া ভারতবাসীর সহিত তাহারা মিশিয়া গেল। ইহাদের সহিত নানাবিধ বৈদেশিক mystery সকল ভারতের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল; সে বিষয়ে সংশয় করা কঠিন।

"কিন্তু, সন্ন্যাসধর্ম্মের কথা বলিতেছিলাম;—আর্য্যাবর্ত্তের সন্ন্যাসধর্ম্ম মিসরের ও প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা না মানিলে বোধ হয় উপায় নাই!

"যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে "এসীনি" নামক সন্ন্যাসীর দল ও মিসরে "থেরাপিউট" সন্ন্যাসীর দল আবির্ভূত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন doctrine আমাদের দেশ হইতে য়ুরোপে রপ্তানি হইল, মনে করা যাইতে পারে।

"প্রথমে দেখুন—Doctrine of Regeneration: এটি খাঁটি বৈদিকতত্ত্ব; যজ্ঞে দীক্ষা হইলেই নবজীবন লাভ হইত। যজ্ঞের উদ্দেশ্যও—দেবরূপে নূতন জন্ম লাভ।

আর একটা দেখুন—Doctrine of Logos: বেদের শব্দব্রহ্ম; শব্দ বা বাক্যই ঈশ্বর; ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে দেবীসূক্তের এইটি স্পষ্ট তাৎপর্য্য।

"পুনশ্চ দেখুন—Doctrine of atonement : বেদে ইহার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞে যজমানের প্রতিনিধি বা নিষ্ক্রয় স্বরূপে পশুকে যজ্ঞে অর্পণ করা হইত (Vicarious sacrifice) ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকার মতে পশুমাংসের পরিবর্ত্তে পুরোডাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সোমযজ্ঞে সোমরসের সহিত পশুমাংস এবং পুরোডাশ ( অর্থাৎ চাউল কিম্বা যবের পিষ্টক ) আহুতি দেওয়া হইত ; পরে সোম-রসের অবশেষের সহিত সেই মাংসের এবং পুরোডাশের অবশেষটুকু সেবন করিলে যজমানের দেবত্ব লাভ হইত। Roman Catholic Massএর কথা মনে পড়ে না কি ?

"আর একটা কথা—doctrine of Incarnation : অবতারবাদ। দেবতার উরসপুত্র মানুষ হইতে পারে, গ্রীক ও রোমানেরা মানিত। দেবতা স্বয়ং মানুষ হন, এতটা বোধ করি মানিত না। ইহাদিগের পক্ষে এ কল্পনা অসম্ভব। ভারতবর্ষে দেবতায় ও মানুষে বিশেষ ভেদ নাই। মনুষ্যমাত্রই দেবতা ; ঈশ্বরও যখন তখন মানুষ হইয়া নামিতে পারেন।"

রামেন্দ্র বাবু একটু চুপ করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কখন রাত্রে পরিণত হইয়াছে তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করা হয় নাই। তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভৃত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"রোমান ক্যাথলিক Massএর কথা বলিতেছিলাম,—বৈদিক যজ্ঞের সহিত ইহার যে কতদূর সাদৃশ্য আছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দ্বাদশটি শিষ্য লইয়া যীশুখ্রীষ্ট ভোজন করিতে বসিলেন। নিজহস্তে একখণ্ড রুটি ও কিছু মদ্য তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া বলিলেন—'আমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; এই রুটি আমার মাংস, এবং এই মদ্য আমার রক্ত ; তোমরা ইহা সেবন কর। ভবিষ্যতে এই

নিয়মটি তোমরা পালন করিবে; তাহা হইলেই আমার সঙ্গে তোমাদের একীকরণ হইবে।' এখন দেখিতে হইবে যে, যীশুর দুইটা দিক ছিল,—একটা ঐশ্বরিক আর একটা মানবিক। এক হিসাবে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার পিতা এক; তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। আর এক হিসাবে তিনি মানুষ; এবং সেই কারণে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি। পাপমোচনের জন্য যখন Sacrifice বা যজ্ঞ আবশ্যক, যীশু মানুষের প্রতিনিধি বা নিষ্ক্রয় স্বরূপে আপনাকে যজ্ঞপশুরূপে (Lamb of god) আহুতি দিলেন। তাঁহার আদেশমত শিষ্যেরা যে মন্ত্রপূত রুটি ও মদ্য সেবন করিল, তাহা বৈদিক যজ্ঞাবশেষ পুরোডাশের মত ও সোমরসের মত দাঁড়াইল। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ করার মত খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত সেবন করিয়া মানব যজমান খ্রীষ্টের সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যায়। তদবধি সমস্ত খ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন; সমস্ত খ্রীষ্টানের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারই নাম Sacrifice of the Mass ও Eucharist ভক্ষণ। সকল খ্রীষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, এই Eucharistএর দ্বারা যজমান ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায়; সেই জন্যই ইহার নাম Holy Communion। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যাজক রুটি ও মদ্যকে মন্ত্রপূত করিলে বাস্তবিক উহা যথাক্রমে মাংস ও রক্তে পরিণত হয়। যাঁহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা নাকি চর্ম্মচক্ষে রক্তমাংস দেখিতে পান; এবং তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসর্গক্রিয়ায় খ্রীষ্টের আত্মাহুতিই পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম Sacrifice of the Mass। এই Sacrificeএর পদ্ধতি ক্যাথলিক চর্চ্চে যেরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সহিত সোমযজ্ঞের চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের বাঁধা liturgy তুলনাযোগ্য। ইহুদিদিগের মধ্যে পশু বলি ছিল বটে, কিন্তু

vicarious sacrifice নিষ্ক্রয় আহুতি বোধ হয় ছিল না। একটা অনুষ্ঠান ছিল—Scapegoat, ছাগলের উপর পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু মানুষের নিষ্ক্রয় স্বরূপে পশু আহুতি দেওয়া তাহাদিগের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ। ঐ যে doctrine of atonement, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মানুষের একীকরণ, ওটা ইহুদিদিগের মধ্যে আদৌ ছিল না; তাহাদের স্রষ্টা এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, ওরূপ একীকরণের কল্পনা একটা বিষম sacrilege বলিয়া পরিগণিত হইত। যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; তাই তাঁহার উপর ইহুদীর এত আক্রোশ। ইহুদী এক Messiah'র পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সেই Messiah ঈশ্বর নহেন; তিনি কেবল ইহুদী জাতির উদ্ধারকর্ত্তা। কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ যে ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারেন, ইহা তাহার কল্পনাতীত। কিন্তু আমাদের বৈদিক যজ্ঞের গোড়ার কথাটাই এই যে, মানুষ যজ্ঞের দ্বারা একেবারে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং বেদের শেষ ভাগে, অর্থাৎ উপনিষদের চরম কথা এই—"আমিই ব্রহ্ম"। যীশুর 'আমিই ঈশ্বর" ইহুদীর কল্পনাতীত; কিন্তু ঐটিই ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মূল কথা। তাই বলিতেছিলাম, অন্যান্য অনেক নূতন doctrine এর সহিত ঐ কথাটা খ্রীষ্টান ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না।

"প্রসঙ্গক্রমে আরও দুইটা কথা বলা যাইতে পারে। তান্ত্রিকদিগের পঞ্চমকার সাধনার সহিত ইহার সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক। মৎস্য ও মাংস —আমাদের বৈদিক যজ্ঞীয় পশুমাংস, ও খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টের মাংস মনে করা যাইতে পারে। মুদ্রা অর্থাৎ চাল কলাই ভাজা,—বৈদিক পুরোডাশ এবং খ্রীষ্টানের রুটি; সোমযজ্ঞে পুরোডাশের সহিত যব ভাজা, খই, ছাতু প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হইত, এবং যজমানকে তাহার অবশেষ ভক্ষণ করিতে

হইত। মন্ত্র,—বৈদিক সোমরস, খ্রীষ্টানের wine। বৈদিক সোমরসের আর এক নাম অমৃত। তান্ত্রিক মদ্য মন্ত্রদ্বারা শোধিত হইলে অমৃতে পরিণত হইত। পঞ্চমতত্ত্ব—যজমানের নবজীবন লাভের উপযোগী অনুষ্ঠান, বৈদিক সোমযাগের পুনর্জন্ম; ক্যাথলিক Mass এর যীশুর সঙ্গে এক হইয়া মৃত্যুকে পরাজয় করতঃ অমরত্বলাভ।

"ধর্ম্মমাত্রেরই দুইটা দিক আছে। একটা সমষ্টিগত, communal; আর একটা ব্যক্তিগত personal। চর্চ্চ ও সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পালন করিতে হইবে; এ বিষয় কাহারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। আর একটা দিক—personal ব্যক্তিগত; এখানে সাধক নিজের মনের মত সাধনা করিতে পারেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তনের পর প্রথম হইতেই church সমষ্টিগত communal হইয়া দাঁড়াইল; মোড়লেরা একত্র হইয়া আপনাদের বিধিব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইত, কাহারও মুখাপেক্ষী হইত না; এই দলবাঁধা communal ভাব দেখিয়া রোমের সম্রাট রুষ্ট হইতেন। রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির একটা বিশিষ্ট কথা ছিল, যে রাষ্ট্র মধ্যে কেহ কোনও অজুহতে দল বাঁধিতে পারিবে না; রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত দলবাঁধা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন রোমসম্রাট খ্রীষ্টান হইলে state ও church এক হইয়া গেল; তখনও সম্রাট Council ও Synod ডাকিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা ধার্য্য করিয়া দিতেন; এইরূপে পূর্ব্বতন communal ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিল। প্রথম দুইটা বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধমোড়লেরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিত। পরে সম্রাট অশোক এবং কণিষ্ক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া নেতৃত্ব করিতেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘের communal ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। খ্রীষ্টানের সেই সকল Universal Church Councilএ যে নিয়মাবলী ধার্য্য করা হইত; কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিলে heretic বলিয়া পরি-

গণিত হইত, খ্রীষ্টান community হইতে বহিষ্কৃত হইত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত; এই শাস্তিটা সম্পূর্ণ communal। এখনও রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চের আদেশ তত্তৎ মতাবলম্বী লোকে শিরোধার্য্য করিয়া থাকে। প্রটেষ্টাণ্ট্ চর্চ্চ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কতকটা যেন স্বাধীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেখানেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। কোথাও বা State বিসপদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত করে; কোথাও বা মণ্ডলী বা Congregation একত্র হইয়া সেই সকল ব্যবস্থা করে। আবার দেখুন খ্রীষ্টানের Mass সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নহে; সমস্ত সমাগত ব্যক্তির যীশুর সহিত একীকরণ ব্যাপার। তৎকালে পূর্ণদীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই গির্জ্জায় উপস্থিত থাকিতে পায় না। যাজক পূতরুটি যথা নিয়মে বিতরণ করিবেন; এক কণিকা অপচয় কিম্বা ভূমিস্পর্শ করিতে পাইবে না; খ্রীষ্টান ব্যতীত কাহারও তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই।

"ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ত অতি প্রাচীন কালে communal ছিল; তাহার কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণযুগেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে communal অপেক্ষা personal দিক্‌টাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা আমরা বেদের যুগ হইতেই প্রাপ্ত হই; ধর্ম্ম Stateএর অধীনে নহে। যজ্ঞের ঋত্বিক ঠিক ইংরাজী priest নহেন; যজমান যে কোন ব্যক্তিকে ঋত্বিকরূপে বরণ করিতে পারিতেন। Priestকে যেমন চর্চ্চের কর্ত্তা কিম্বা congregation গ্রাহ্য করিয়া লইলে তবে তিনি পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন; বৈদিক ঋত্বিকের সে রকম public character কিছুই ছিল না। খ্রীষ্টানের পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট ceremony'র ভিতর দিয়া ordained হইয়া থাকেন; এবং সমস্ত চর্চ্চের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। তিনি

যতদিন পদস্থ থাকেন, ততদিন সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাজকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য; অন্য কাহারও যাজকতা অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ। কিন্তু ঋত্বিক যজ্ঞের আহুতির পর আবার সমাজের জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া পূর্ব্বের মত একজন private individual মাত্র হইতেন। যজ্ঞ-কালে তাঁহার সহিত যজমানের যে কিছু সম্পর্ক; তৎপরে কোন সম্পর্ক থাকিত না। সমাজের অন্য কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিত না। জনসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্দির বা যজ্ঞভূমি বেদের আমলে ছিল না। অধিকাংশ যজ্ঞই কাম্য (optional)। যে যজ্ঞ প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ছিল, তাহাতে ঋত্বিকেরও প্রয়োজন ছিল না। Priest যেমন ঈশ্বর ও জীবের মধ্যস্থ, আমাদের ঋত্বিকের সেরূপ মধ্যস্থ ভাব কিছুই ছিল না।

"খাঁটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কোনও পোপ নাই; রাষ্ট্রের আধিপত্য নাই; চর্চ্চের মোড়ল নাই; পুরোহিত সম্প্রদায় Priesthood, hierarchy নাই। ব্রাহ্মণ,—পুরোহিত নহেন, সমাজের বর্ণবিশেষ মাত্র। তিনি যাজক হইতে পারেন, যজমানও হইতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা যাজকত্বে বরণ করা যাইতে পারে। যিনি যজমান, তিনিও ঋত্বিকের কার্য্য করিতে পারেন।

"বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; কাজেই এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল না; সেখানে গোড়া হইতেই communal ভাবটা প্রবল। বুদ্ধের তিরোভাবের পর হইতে সঙ্ঘের প্রধান ব্যক্তিরা সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া যে বিধিব্যবস্থা করিতেন, সমস্ত সঙ্ঘই তাহা মানিয়া লইত। সম্রাট অশোক ও কণিষ্ক সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

"তান্ত্রিক সাধনার চক্রগত ব্যাপারটাও কতকটা communal। এ সাধনায় সকল বর্ণের সমান অধিকার আছে। ভৈরবীচক্রে বসিলে সকল

বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়। চক্রে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশে সমান অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং গুহ্যতম সাধনাচক্রে বসিয়া সাধনা করিতে পারেন।

"এই সকল তান্ত্রিক গুপ্ত সাধনা বৌদ্ধবিহারের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট হেতু আছে। তথাগত গুহ্যকাদি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা যায় যে ভৈরবীচক্রের অনুরূপ ব্যাপার বৌদ্ধ সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হইত; নেপালে তিব্বতে এখনও হয়। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও communal; বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ও ভেকধারী নেড়া নেড়ীর ভিতরেও communism এর প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জগন্নাথক্ষেত্রেও সেই communismএর প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। সেখানে নিতান্ত অন্ত্যজ ভিন্ন সকল বর্ণের সমান অধিকার। পুরীতে বর্ণবিচার নাই। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের মুখে অর্পণ করিতে পারে। বৈদিক পুরোডাশের সহিত, খ্রীষ্টান Eucharist এর সহিত, ইহার সাদৃশ্য আছে। মহাপ্রসাদ সামান্য অন্ন মাত্র নহে; ইহা পরম দেবতা স্বরূপ, স্বয়ং জগন্নাথ; ইহার কণিকামাত্র অপচয় করা চলিবে না, সমস্তটুকু গলাধঃকরণ করিতে হইবে। ইহা উচ্ছিষ্ট হয় না; কোনও আসনে বসিয়া খাইতে নাই, ভূমিতে বসিয়া খাইতে হইবে। ভোজনের পর ইহা দেবতার সহিত মানবের একত্ববিধান করে।"

রামেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "যে প্রসঙ্গে এই আলোচনার সূত্রপাত হইল, সেটী কিন্তু অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সে কথাটার আলোচনা করিব বৈ কি? কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাটার আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।" সেদিনকার মত আমরা বিদায় হইলাম।

## ২

রোগশয্যায় শয়ান শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট এমন গুরুতর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া অন্যায় করিয়াছি কি না বুঝিতে পারিতেছি না ; আমার কিন্তু নেশা ধরিয়া গিয়াছে ; তাই দুইদিন পরে আবার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দুই একটি কথার পর তিনি বলিলেন—"আমার অনেক কথা বলিবার ছিল ; অনেক দিন কলেজে আপনার সঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তখন যদি কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতেন ! এখন সামর্থ্যে কুলাইবে কি না বলিতে পারি না।" কোলের উপর বালিশ সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষের নিকট কত ঋণী, ইতিহাস হিসাবে তাহা বলা কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ঋণস্বীকারে যে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। তবে কতকটা স্বীকার না করিয়াও তাঁহারা পারেন না। অশোকের সময় হইতে খুব বেশীমাত্রায় গ্রীস ইজিপ্ট ও সীরিয়ার সঙ্গে ভাব বিনিময় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আলেকজান্দার সিন্ধুপারে এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন ; তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে যে সকল গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ও শ্রমণধর্ম্মের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিত —বাক্‌ত্রীয়া। বাক্‌ত্রীয় গ্রীকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ভাগবত ধর্ম্মকে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

"আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। বিদেশী পরিব্রাজক জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন, এই কথাই ইতিহাসরচয়িতা খুব বড়

করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষের পরিব্রাজক ও একদিন তিব্বতে, চীনে, জাপানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা তুষারকিরীট হিমালয় অতিক্রম করিয়া, দুরধিগম্য গোবি মরুভূমি পার হইয়া, বর্ব্বরজাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অপেক্ষাকৃত সুগম পথে সুসভ্য পারসিক, গ্রীক, ও য়ুডীয়দিগের দেশের ভিতর দিয়া য়ুরোপে দলে দলে যান নাই, কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি য়ে, কয়েকটি doctrine, যথা যজমানের নবজীবন লাভ, দেবতার সহিত সাযুজ্য বা একাত্মতালাভ, যজ্ঞে যজমানের আত্ম-নিক্রয় ইত্যাদি, ভারতবর্ষের পক্ষে অতি পুরাতন, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সে সময়ের পক্ষে অতি নূতন। John the Baptist তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে জলের দ্বারা baptise করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন; সেই অবধি ঐ অভিষেকপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে উহা অতি পুরাতন বৈদিক প্রথা। Neo-Platonic Philosophy ও Gnostic Christianity,—এই উভয়ের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের ভাব কিরূপ অনুপ্রবিষ্ট তাহা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিতেছেন। Demiurgus ও Sophia'র মূলে বেদের বিরাটপুরুষ ও বাগ্দেবতা এবং বৌদ্ধ প্রজ্ঞা কতটুকু প্রচ্ছন্ন-ভাবে আছে, সে কথা বলা বড়ই কঠিন। Gnostic খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরকে বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল কাল্পনিক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার চরম পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় Trinityতে দাঁড়াইয়া সমস্ত খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত ভাগবত বৈষ্ণবদিগের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহের; এবং মহাযান বৌদ্ধদিগের আদিবুদ্ধ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের; ও সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, অবলোকিত, ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্বের; এবং ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, শাক্যমুনি ও মৈত্রেয় এই

পঞ্চ মানুষবুদ্ধের কল্পনার প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। আধুনিক বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ভগবানকে বিশ্লেষণ করিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠপতি মহাবিষ্ণু, এমন কি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নানারূপে কল্পিত করিয়াছেন। ভাগবতগণের ও বৌদ্ধগণের বহুপূর্ব্বে বৈদান্তিকেরা তুরীয় ব্রহ্মের সগুণরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং বৈশ্বানর বিরাট হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সকল রূপ-কল্পনার মূল ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই এরূপ বিশ্লেষণ ব্যাপার ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মজ্জাগত। প্রাচীন ইহুদির মধ্যে বা প্রাচীন গ্রীসে এরূপ কল্পনার অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় কি না জানি না। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণবধর্ম্ম এতদুভয় তুলনামূলক সন্দর্ভে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। নারদ ঋষি পশ্চিমে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের ভক্ত একান্তিগণের নিকট হইতে নূতন ধর্ম্ম আনয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নূতন কলেবর দান করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা মহাভারত মধ্যে ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে ; ভাগবত এবং পঞ্চরাত্রমতের ইহাই মূল বলিয়া গৃহীত হয়। ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন। বহু বৎসর হইল রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এই আখ্যায়িকার মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নিকট হইতে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঋণ গ্রহণ দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ও উক্ত সন্দর্ভে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রয়োগদ্বারা সেই মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপ যে প্যালেষ্টাইন, এবং একান্তিগণ যে প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টান, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি প্রচুর গবেষণার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, মহাভারতের যে অংশে এই আখ্যায়িকা আছে, উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়া

মনে করিতে হয়; অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনেরও পরে রচিত। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে গ্রীক কর্ত্তৃক ভাগবতধর্ম্মের আনুগত্যস্বীকার স্তম্ভ-লিপিতে আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই মতের ভিত্তি অনেকটা টলিয়া গিয়াছে। মহাভারতের বাক্য তুলিয়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে উহাতে একটা অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তাহা খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টানদিগের eucharist ভক্ষণ; উহা যদি eucharist ভক্ষণই হয় তাহা হইলে মহা-ভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পর প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হয়। কিন্তু eucharist ভক্ষণ ভারতবর্ষেরই একটা অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। ইহা দেখিবার জন্য নারদের প্যালেষ্টাইন যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না; বরং আমরাই এখানে উল্টা চাপ দিতে পারি।

"প্রকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণের অভাবে কে কাহার নিকট কতটুকু ঋণ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা বড়ই দুঃসাহসের কাজ। খ্রীষ্টীয় যাজকেরা ও খ্রীষ্টীয় ইতিহাস-লেখকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকাশে এবং অভিব্যক্তিতে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা যথাসাধ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-দিগের ধর্ম্মের নিকট হইতে, এমন কি জার্ম্মাণ heathen দিগের নিকট হইতেও অনেক মত ও অনেক প্রথা খ্রীষ্টধর্ম্ম আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। কিন্তু প্রাচ্যদেশের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে একালের বড় বড় পণ্ডিতেও একটু কুণ্ঠাবোধ করেন। পারসীকদিগের মিথ্রপূজা রোমসাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় সমস্ত রোমরাজ্য, এমন কি সুদূর ব্রিটীশদ্বীপ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে সময়ে উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল, এবং বোধ হয় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম এই মিথ্রপূজার অনেক অংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা অস্বীকারের আর উপায় নাই। ব্যাপারটা খ্রীষ্টীয় ঐতি-

হাসিকেরা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতবর্ষের বোধিসত্ত্ব খ্রীষ্টীয় সমাজে আজ পর্য্যন্ত সেণ্ট্ জোসাফাৎ রূপে canonised হইয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, ইহাও অধিকদিনের আবিষ্কার নহে। যিনি এ সংবাদ জানেন না, তিনি এ সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের আলোচনা পাঠ করিয়া দেখিবেন।

রামেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া অর্দ্ধ আউন্স আনারসের রস পান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজে monasticismএর উদ্ভব আর একটি অদ্ভুত ঘটনা! প্রাচীন গ্রীসে, রোমে এবং ইহুদিদিগের মধ্যে এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের তুলনীয় জিনিষ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

"ভারতবর্ষে কিন্তু এই সন্ন্যাসী ধর্ম্ম অতি পুরাতন ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না থাকিলেও বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই দলবদ্ধ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচারিত উপনিষদের মধ্যে কুটীচর বহূদক, হংস পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দলের উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য মতের অনুসরণ করিয়া যদি এই উপনিষদগুলিকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়াও মনে করা যায়, তথাপি বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পূর্ব্বে বর্ত্তমান আজীবক নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ভুলিলে চলিবে না। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্বপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীসঙ্ঘকে একেবারে যন্ত্রবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং দেশে বিদেশে সদ্ধর্ম্মের প্রচার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। অশোকের সময় হইতে রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এই প্রচার-কার্য্য ভারতবর্ষের বাহিরে মহাসমারোহে আরব্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মকালে বা তাহার অব্যবহিত পরেই, যে সন্ন্যাসীর দল আধুনিক য়ুরোপীয়ের পক্ষে দুরতিক্রম্য মধ্যএসিয়া পার হইয়া চীনের মধ্যে

বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহারা যে প্যালেষ্টাইনে এবং মিশরে ততোধিক বিপ্লব ঘটায় নাই, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। খ্রীষ্টের সমকালবর্ত্তী এসীনি ও থেরাপিউটদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অল্পদিন পরেই মিশর এবং কাইরীনিতে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদিগকে বিজন মরুভূমিও গুহা আশ্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর দলের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। গ্রীক ও রোমান চর্চ্চমধ্যে সন্ন্যাসীদের নানাদল যন্ত্রবদ্ধ হইয়া উঠিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস এই সকল সন্ন্যাসীদলের ঘটনায় পরিপূর্ণ; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন, এই সকল সন্ন্যাসীদলের প্রভুত্ব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘের ন্যায় ইহারাও বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করে; রাজার অনুমতিতে এই সকল বিহার ভূমিসম্পত্তির অধিকারী হইত; এবং য়ুরোপের মধ্যযুগে য়ুরোপের ভূমির বৃহৎ ভগ্নাংশ এই সকল বিহার ও সঙ্ঘারামের অধিকৃত ও করতলগত হয়। এই সকল খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীসঙ্ঘের ভিতরে St. Benedict প্রভৃতি মহাত্মগণ যে সকল আচার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে প্রচলিত আচার নিয়মের সহিত তাহাদের তুলনায় সমালোচনা আবশ্যক। তিব্বতে ও জাপানে বৌদ্ধমন্দিরে যে সমস্ত উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, রোমের অনুগত খ্রীষ্টীয় মন্দিরে তাহার অনুরূপ আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া খ্রীষ্টান পর্য্যটকেরা বিস্মিত হইয়া থাকেন, তাহা ভূয়োভূয়ঃ দেখিয়াছি। সে কালের খ্রীষ্টানেরা এই সাদৃশ্যে শয়তানের কারসাজি দেখিতেন। বৌদ্ধযাজকদিগের ও লামাদিগের বেশভূষা পরিচ্ছদ; অস্থি, ভস্ম প্রভৃতি relic পূজা; saint সাধু ভক্ত পূজা; মূর্ত্তিপূজা; সাধুগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের উপলক্ষে উৎসবের ও উপবাসের বিধান; মালাজপ; ধূপ-দীপ প্রভৃতি নানা উপচারের প্রয়োগ; যাত্রা (procession);

মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ ও নিবেদন ; confession এর দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত ; এই সকল এবং আরও নানাবিধ বিধিব্যবস্থার বৌদ্ধমন্দিরে এবং খ্রীষ্টীয় মন্দিরে সাদৃশ্য আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল আচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় সর্ব্বত্র সুসাধ্য না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। সবই যে শয়তান কারসাজি করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুকরণে চীনে তিব্বতে ও জাপানে আনয়ন করিয়াছে, এমন কথা বলিতে সাহস হয় না।

"এই শয়তানের কথাটাই লওয়া যাক্। ইহুদিদিগের প্রাচীন ধর্ম্মে শয়তান ছিল না। যে খল সরীসৃপ আদি মানবদম্পতিকে প্রতারিত করিয়াছিল, বাইবেলে সে সর্পমাত্র। পরবর্ত্তী কালে সেই সর্পের উপর শয়তানি আরোপিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা শয়তান বলিতে যাহা বুঝেন, প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে তাহা ছিল না ; প্রাচীন ভারতবর্ষেও ছিল না। শয়তানের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি অমঙ্গলের, অধর্ম্মের, পাপের প্রেরণাকারী। শয়তান প্রকৃতই পাপপুরুষ। এই পাপের ফল অবশ্য মৃত্যু বটে। কাজেই শয়তানের প্ররোচনাতেই পাপও মৃত্যু Sin and Death উভয়েই আসিয়াছে। শয়তান ঈশ্বরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, শয়তান তাহা প্রায় ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। শয়তানকে দমন করিতে বিধাতাকে হিমসিম খাইতে হয়। মানুষকে শয়তানের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানকে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, এবং আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে বলি দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয় নাই ; Kingdom of God স্থাপিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। খ্রীষ্টের পুনরাগমন ( second advent ) কবে হইবে, সে বিষয়ে খ্রীষ্টানেরা বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। এই শয়তান ও তাঁহার গণের অর্থাৎ অনুচর-

দিগের ভয়ে তামসযুগ ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় য়ুরোপ সন্ত্রস্ত থাকিত; বহু খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া গোপনে শয়তানের শরণ লইত। তাহার ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজের বুকের উপর একটি শয়তানতন্ত্র ( devil worship ), খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী একটা নূতন ধর্ম্ম,আবির্ভূত হইয়াছিল। সেকালের black magic, witchcraft, necromancy প্রভৃতি তামসিক অনুষ্ঠান এই অপধর্ম্মের অন্তর্গত। বড় বড় পণ্ডিত হইতে গলিতনখদন্ত বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিত; অন্ততঃ সেই সন্দেহে কত পণ্ডিতকে ও কত বুড়ীকে যে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

"এই যে শয়তান মানুষকে পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়া মৃত্যুর অধীন করিয়াছে, মানুষের সর্ব্বনাশসাধনই যাহার একমাত্র কর্ম্ম,—এই শয়তান কোথা হইতে আসিল? ইহুদিদিগের ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শয়তানকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহুদিরা পারসীকদিগের সংসর্গে আসিয়াছিল; মহাপ্রতাপ ব্যাবিলনাধিপতি ইহুদিজাতির অধিকাংশ লোককে বন্দী করিয়া তাহাদিগের স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পারস্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসর পরে পারস্য সম্রাটের অনুগ্রহে সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নবজীবন লাভ করিয়া, তাহারা নূতন উদ্যমে আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্ম পুনর্গঠিত করিয়া তুলে। তখন মুসাপ্রবর্ত্তিত আচার নিয়মের বন্ধন খুব শক্ত করা হয়। Prophet দিগের উদার ধর্ম্ম সেই বন্ধন শিথিল করিতে পারে নাই। অনেকে অনুমান করেন, পারস্য হইতে এই শয়তানকে এই সময়ে ইহুদিধর্ম্মশাস্ত্রে আমদানি করা হইয়াছিল। পারস্যদেশের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রধান দেবতা—অহুর মজ্‌দ; ইনি ধর্ম্মের এবং

মঙ্গলের দেবতা। অনেকে মনে করেন, ইনি বেদের বরুণ দেবতার সহিত অভিন্ন। অহুর মজ্‌দের প্রবল প্রতিপক্ষ,—অঙ্গ্র্‌মৈন্যু বা আহ্রিমান, অধর্ম্মের বা অমঙ্গলের বিধাতা। অহুর মজ্‌দের সহিত ইঁহার সনাতন বিরোধ; সেই বিরোধের নিবৃত্তি নাই; এবং তাহার ফলেই এই বিশ্বজগৎ ভালোয় মন্দয় মিশিয়া চলিতেছে। এই আহ্রিমানই প্রকৃত শয়তান। মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও জাতি কল্পনা করে নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রচুর প্রতিপত্তি হইল। খ্রীষ্টীয় বিহার গুলির মধ্যে গুপ্তভাবে শয়তানের পূজা খুব প্রসার লাভ করিল। শয়তানপূজার অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ, যাঁহারা শেকস্‌পীয়ারের ম্যাকবেথের witchদের কারখানা পড়িয়াছেন, তাঁহারা কতকটা বুঝিবেন। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন চাপা রাখা গেল না। য়ুরোপের এই সমস্ত মঠগুলি একদিকে পোপ এবং অন্যদিকে রাজার সম্পূর্ণ অধীন ছিল; ভারতবর্ষের বিহারের মত তাহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল না। কাজেই যখন লোকে কাণাঘুষা করিতে লাগিল যে এই সকল মঠে গোপনে শয়তানপূজা চলিতেছে, তখন রাজবিধি দ্বারা কঠোর উপায়ে তাহা বন্ধ করা হইল। এই কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা য়ুরোপের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মসীলিপ্ত করিয়াছে। যাহাকে ডাইন বলিয়া সন্দেহ করা হইত, তাহাকেই নানা যাতনা দিয়া শেষে দগ্ধিয়া পোড়াইয়া মারা হইত। তথাপি নানাস্থানে নানারূপে শয়তান পূজা চলিতে লাগিল। Knights Templars এবং knights Hospitallers গোপনে শয়তান পূজা করিত। তাহাদের অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে কিরূপে কঠোর উপায়ে ইহার উচ্ছেদ সাধন ঘটে।

"আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শয়তানের অনুরূপ কিছু ছিল না।

য়ুরোপীয়েরা শ্মশানচারী ভূতপ্রেতগণপরিবৃত মহাদেবকে Devil মনে করিয়াছেন; হিন্দু তাহা শুনিয়া হাসেন। খ্রীষ্টান জানে না যে, হিন্দুর মহাদেব মানুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেন না। তিনি শিব, শঙ্কর, আশুতোষ; পাপের প্রেরণাদ্বারা মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করা কি তাঁহার কাজ? বেদের রুদ্রদেবকে উপাসকেরা ভয় করিত। তাঁহার পিণাক ও তাঁহার বাণ ত যথেষ্ট ভয়জনক ছিল; তাহার উপর আবার প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহার কোপদৃষ্টি হইতে পালিত পশুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। এই ভয়ঙ্কর দেবতার নাম স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার সাহস কাহারও হইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে কোনও মন্ত্রে রুদ্র নাম স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারিবে না; তৎপরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাষায় "রুদ্রিয়" বলিতে হইবে। কি জানি যদি স্পষ্ট নামের উল্লেখে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়! তাঁহার দৃষ্টিপাতকেই লোকে ভয় করিত। রুদ্রের উদ্দেশে কোনও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান করিলে জলস্পর্শ করিতে হইত। অসুর, রাক্ষস, এবং পিতৃগণের উদ্দেশেও কোনও অনুষ্ঠান করিতে হইলে ঐরূপ জল স্পর্শ করিতে হয়। বহুস্থলে রুদ্র দেবের স্তবস্তুতির তাৎপর্য্য তাঁহার রোষ নিবারণ করা। এই উগ্র দেবতাটির মধ্যে খ্রীষ্টানের শয়তানি ভাব কিন্তু দেখিতে পাই না। তিনি কুপিত হইলে মানুষের অনিষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু মানুষকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিবার প্রয়াস আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম প্রথম তাঁহাকে খুসী রাখিবার জন্যই তাঁহাকে শঙ্কর বলা হইত বটে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের কল্পনা এই উগ্র ভীম কপর্দ্দী দেবতাকে আশুতোষ শিবে পরিণত করিয়াছিল। অসুর ও রাক্ষস devil নহে; কিন্তু মনে হয় যে এই ভুল ইংরাজি অনুবাদ বহুস্থলে দেখিয়াছি। যজ্ঞের ভাগ লইয়া দেবতার সহিত অসুর ঝগড়া করিত; মানুষের সম্পাদিত যজ্ঞকার্য্যে রাক্ষস

বিঘ্ন উৎপাদন করিত; কিন্তু এরকম কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই যে তাহারা মানুষকে পাপপথে লইয়া যায়। বেদে আর একটি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, নির্ঋতি; তাঁহাকেও কতকটা ভয় করিয়া চলা হইত। নির্ঋতির পাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাকে শয়তান বলা যায় না; পাপপ্রবর্ত্তনার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। আর যে যমদেবতা পরবর্ত্তিকালে মৃত্যুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তাঁহাকে হিন্দু ভয় করেন বটে, কিন্তু তিনিও খ্রীষ্টানের শয়তানের মত নহেন; তিনি একজন দেবতা; তিনি পিতৃগণের অধিপতি, বিচারকর্ত্তা; তিনি ধর্ম্মরাজ। আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও শয়তান আধিপত্য লাভ করেন নাই; এমন কি তন্ত্রশাস্ত্রেও শয়তান প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। স্কন্দ ও তাঁহার অনুচর গ্রহগণ, মাতৃকাগণ, ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতাগণকে লোকে ভয় করিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকেও শয়তানের অনুচর বলা যায় না; পাপে প্রবর্ত্তনা তাহাদের কার্য্য নহে। মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকায় অগ্নিপুত্র স্কন্দে যেন একটু শয়তানী ভাব দেখা যায়, কিন্তু সন্দেহ হয় এই স্কন্দও যেন বাহির হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছেন; এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তৎকর্ত্তৃক দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়া এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পুত্রত্বে গৃহীত হইয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা স্কন্দঘটিত এই ব্যাপারটুকু জানেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখি, স্কন্দের অনুচরেরা আঁতুরঘরে ছেলে খাইত, এবং স্কন্দ নিজে সিঁদচোরদিগের আশ্রয় ছিলেন; সাক্ষী মৃচ্ছকটিকনাটক। তন্ত্রে অনেক ডাকিনী যোগিনীর উল্লেখ আছে; তাহারা হয় ত মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পাপে প্রবর্ত্তিত করে না। শয়তানের বা Devilএর প্রধান লক্ষণ,—পাপে প্রবর্ত্তনা। মানুষের ছল ধরিয়া তাহাকে

প্রলোভিত করিয়া কুপথে লইয়া যাইবার জন্য সে বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অনেক উগ্র ভয়ানক দেবতার ও অপদেবতার উল্লেখ আছে; তাহারা অনিষ্ট করে, কিন্তু পাপে প্রবর্ত্তিত করে না। আমাদের প্রাত্যহিক তান্ত্রিক সন্ধ্যোপাসনায় ও পূজায় এক পাপপুরুষের কল্পনা দেখা যায়; এই পাপ-পুরুষকে কতকটা শয়তানের স্থলাভিষিক্ত বলা যাইতে পারে। তাহার একটা রূপবর্ণনাও আছে;—ব্রহ্মহত্যা তাহার শির, চৌর্য্যবৃত্তি তাহার বাহু, ব্যভিচার তাহার কটিদ্বয়, ইত্যাদি। উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উপাসকের শরীর হইতে এই পাপপুরুষকে দহন করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানে ইহা নিষ্পন্ন হয়। এই পাপ পুরুষ শয়তান হইলেও খ্রীষ্টানের শয়তানের মত প্রভুত্ব বা ভয়ানকত্ব লাভ করে নাই। হিন্দু কখনও পাপপুরুষের পূজা করে নাই, তাহার শরণাপন্ন হয় নাই। বেদে মৃত্যু দেবতার উল্লেখ আছে; মৃত্যুর ভয় চিরকালই আছে। নিঋ´তি নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিঋ´তির পাশ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়; ইঁহাকেও লোকে ভয় করিত। এই নিঋ´তি হইতে নৈঋ´ত-গণের উৎপত্তি; ইঁহারা কতকটা রাক্ষসের মত। কিন্তু মৃত্যু বা নিঋ´তি কেহই শয়তানের মত পাপে প্রবর্ত্তক নহে। বেদে মন্যু নামক দেবতাকে ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। আমাদের আহ্নিক সন্ধ্যোপাসনায় "মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ" মুক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকে যখন "ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" এবং দুর্য্যোধনকে "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" বলা হইয়াছে, তখন ইহার সহিত পাপের ও অধর্ম্মের সম্পর্ক আছে বলিতে হইবে। কিন্তু গোড়ায় ইঁহাকেও দেবতারূপেই পাওয়া যায়; এমন কি, ইনি বৃত্রেরও শত্রু। এই বৃত্র ইন্দ্রের প্রধান শত্রু, অতএব দেবগণেরও শত্রু। ইঁহার বিশেষণ অহি বা সর্প। এই সর্পের সহিত শয়তানরূপ সর্পের কোনও সম্পর্ক আছে কি না বিবেচ্য। যাহাই হউক, বৃত্র যে মানুষের শত্রু, এবং মনুষ্যকে

পাপে প্রবর্ত্তনা করেন, এইরূপ খুলিয়া বলা হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যে কলির দর্শন পাওয়া যায়। এই কলিযুগে তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব। পাপের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু তাঁহার পূজাপদ্ধতি নাই। হিন্দু শাস্ত্রে খ্রীষ্টানের শয়তানের মত তিনি একাকী ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান নাই; কেবল পাপের ছিদ্র অন্বেষণ করেন মাত্র। সম্ভবতঃ কলির আবির্ভাবও বৌদ্ধ বিপ্লবের পরবর্ত্তী। য়ুরোপের শয়তানপন্থীদের Black Magicএর মত অনুষ্ঠান আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় বটে; সাধনদ্বারা, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক প্রয়োগদ্বারা, তাল বেতাল ডাকিনী যোগিনীকে বশ করিয়া মারণ, উচাটন, বশীকরণ,—সংক্ষেপে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ও অন্যের অনিষ্টচেষ্টা—এ সকল এদেশেও আছে। অবহিত হইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই সকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশই দেশী ও বিদেশী অনার্য্যসংস্রব হইতে আসিয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের জন্য বৌদ্ধগণই অনেকটা দায়ী; ভবভূতি যে ইহা বুঝিতেন, তাহা মালতীমাধবে প্রকাশ। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিলেও ইহা বুঝা যায়। সম্প্রতি মধ্য এসিয়ার খোটান প্রভৃতি স্থানে যে বৌদ্ধ-সাহিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। বৈদিক-কালে খাঁটি আর্য্যগণের মধ্যে যে এ সব ছিল না, তাহা বলিতেছি না। অথর্ব্ব বেদে মন্ত্রবলে অনুষ্ঠানবলে শান্তি পুষ্টি অভিচারাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অনেকের মতে ইহার কোনও কোনও অংশ ঋগ্বেদ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শ্রেণীর বিশ্বাস সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক,—সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছে। ইহা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা বৈজ্ঞানিকেরাও বলিতে পারেন নাই। Hypnotism অর্থাৎ আধুনিক বশীকরণ বিদ্যার আলোচনার পর তাহা বলা চলে না। সে যাহা হউক, অথর্ব্ববেদেই হউক, আর আধুনিক হিন্দুতন্ত্রেই হউক, শয়তানের পূজা,

একজন Tempter অর্থাৎ পাপে প্রণোদকের পূজা, আবিষ্কার করা চলিবে না।

"কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে বৌদ্ধ-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাতে শয়তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। মার ষোলো আনা শয়তান, Tempter। বুদ্ধদেবের জন্মকালে মারের আসন টলিল; নানা উপায়ে তাঁহার বুদ্ধত্বলাভে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল; তাঁহার মহাভিনিস্ক্রমণকালে কত প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার প্রয়াস পাইল; বোধিদ্রুমতলে তাঁহার সম্বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বয়ং মারের, মারসেনার, মারবধূগণের কত ঐশ্বর্য্য প্রলোভন, কত ভয় প্রদর্শন, কত হাব ভাব বিলাস বিভ্রম! যীশুর Temptation in the Wildernessএর কথা মনে পড়ে না কি? এই মারপরাজয়ের কথায় বৌদ্ধ-সাহিত্য পূর্ণ। পরবর্ত্তী বৌদ্ধপন্থীদিগের কল্পনা এই পরাজয় ব্যাপারটিকে কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, শিল্পকলায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। খ্রীষ্টানের মত বৌদ্ধ ও মারের ভয়ে সন্ত্রস্ত; বিশেষতঃ তিব্বতে ও চীনে মারের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে Eucharist ভক্ষণ প্রচলিত আছে, তাহাতে মারের অনুচরদের দূরীকরণ প্রথমেই অনুষ্ঠেয়। অমিতায়ুনামক বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া লামা একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা অমিতায়ুর হস্তস্থিত একটি পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করেন। এই কাষ্ঠখণ্ডটিকে "বজ্র" নামে অভিহিত করা হয়; বজ্রের এক প্রান্ত পাত্রটির উপর স্থাপিত; অপর প্রান্তটি লামা নিজের বক্ষের সহিত সংলগ্ন করেন। এই প্রক্রিয়ায় সেই যাজক লামার দেহে অমিতায়ুর প্রভাব সঞ্চারিত হইল; তখন তিনি মন্ত্রের দ্বারা মারকে বিদূরিত করেন; পরে পাত্রস্থিত জল, নরকপালস্থিত মদ্য, অপরপাত্রস্থিত পিষ্টক ও ময়দার বটিকা মন্ত্রের দ্বারা শোধিত

করিয়া অমৃতে পরিণত করা হয়; সকলেই তাহা সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করে। বৌদ্ধদিগের নরকের নিকট খ্রীষ্টানের নরক হার মানে; মারের অনুচরেরা পাপীকে কত কঠোর শাস্তি দেয়, তাহাই প্রধানতঃ তিব্বতীয় শিল্পকলায় প্রকটিত হইয়াছে। যে বৌদ্ধগণের নিকট সকলই অনিত্য ও ক্ষণিক, তাঁহারাও যে অমৃতের বা অমরত্বের প্রয়াসী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। মার পাপে প্রবর্ত্তক; তাঁহার নামেই প্রকাশ যে মৃত্যুও তাঁহারই খেলা।

"ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে মার প্রবেশ লাভ করিলেন। সেখানে তিনি পাপপ্রবর্ত্তক ও শাস্তি-বিধাতার মূর্ত্তিতে দেখা দেন না; সেখানে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পুষ্পবাণে দেবতার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়, যোগী ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয়, কিন্তু তিনি কখনও কাহাকেও পাপে প্রণোদিত করেন না। কখনও কখনও কাহারও স্বর্গগমন রোধ করিবার জন্য দেবরাজ তাঁহার সাহায্য লইতেন; কিন্তু নরকে পাঠাইবার জন্য নহে। মহাদেবের কন্দর্পধ্বংস ব্যাপারটি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক মারজয় ব্যতীত আর কিছু নহে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। কে বলিতে পারে, বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে এ বিষয়ে কে কাহার নিকট ঋণী?

"প্রাচীন বা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে শয়তানরূপী মারের উপদ্রব দেখিতে পাই না; অথচ মার বৌদ্ধ সাহিত্যে ও বৌদ্ধশিল্পে খুব বেশী জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন; বেশ বুঝা যায় যে, এই শয়তানি ভাব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধাতের সঙ্গে খাপ খাইল না। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, এই শয়তান বা মার কোথা হইতে আসিলেন?

"বুদ্ধদেবের সময়ে ও কিছু পরে পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ণগৌরব; তথায় জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত; পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ দরিয়াবুশের

(Darius) অধীন ছিল, ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমন অবস্থায় পারসীকদিগের সহিত ভারতবাসীর ভাবের আদান প্রদান হইবার সম্ভাবনা ছিল। যে শাক্যকুলে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত বটে; কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত বংশ খাঁটি দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিল কি না সন্দেহ জন্মে। এমন কি, শাক্য নামটা শাকদ্বীপ বা Scythiaকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শাকদ্বীপবাসী বিজেতা পারসীকের সংশ্রবে আসিল। বিজেতার শয়তানরূপী আহ্রিমান শাকদ্বীপের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়া শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী মাররূপ পরিগ্রহ করিল, এমন কথা মনে আসিতে পারে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে নিশ্চিত কোনও কথাই বলা যায় না। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টানের শয়তান যেমন বিদেশ হইতে আমদানি, বৌদ্ধের মারও তেমনি বিদেশ হইতে আমদানি, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

"ভাল, তাহাই যেন হইল; কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে এই শয়তানের এত প্রভুত্ব হইল কেন? অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে হইল না কেন?

"প্রথমে খ্রীষ্টানের কথা ধরা যাউক। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূলসূত্র এই যে, মানুষ আজন্মপাপী; আদিম পিতামাতার স্খলনজনিত পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সে জন্মগ্রহণ করে; সেই গোড়ার পাপের ফলে পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যু (Sin and Death) আবির্ভূত। ইহাই হইল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূলসূত্র। মনুষ্য মাত্রই পাপী sinner, মানবজীবন পাপময় (sinful), ইহা স্বীকার করিয়া খ্রীষ্টান জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। এই পাপের বোঝা দুর্ব্বহ; ঈশ্বরের কৃপা (grace) ব্যতীত এই বোঝা মানুষ নিজের শক্তিতে

নামাইতে পারিবেনা। এই পাপ ও তাহার আনুষঙ্গিক মৃত্যু হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য পরিত্রাতা (Saviour) আবশ্যক; ভগবান দয়া করিয়া অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতির পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে লইয়া আপনাকে বলিরূপে অর্পণ করিয়াছেন ও আপনার রক্ত দিয়া মানুষের মুক্তি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টান সমস্ত জগৎকে মলিন, অপবিত্র, কুৎসিত মনে করেন। সমস্ত জগৎটা একটা অশুদ্ধ আবর্জ্জনা। তাই খ্রীষ্টীয় প্রথম যুগে খ্রীষ্টানের ভাবনা ছিল, কেমন করিয়া এই fleshরূপ ক্লেদ বর্জ্জন করা যায়। আদিম মানবজননীর স্খলনের পর হইতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি খ্রীষ্টানের অবজ্ঞা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; নারী যে নরকস্য দ্বারং, temptress, এই ভাবটাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বহুশত বৎসর পরে এই ভাব সমাজের একস্তরে পরিবর্ত্তিত হইল; তখন য়ুরোপে একটা ক্ষত্রসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; সেই chivalry'র দিনে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজ আপনাকে পাপভারপীড়িত মনে করিত—ইহজগৎকে কদর্য্য ও হেয় মনে করিত। জ্ঞানমার্গের (science) প্রতি খ্রীষ্টানের বিদ্বেষের মূল ও এইখানে; খ্রীষ্টানধর্ম্ম যখন রোমান সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইল, তখন হইতে সম্রাটদের প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল কেমন করিয়া গ্রীকসভ্যতাকে, গ্রীসীয় বিদ্যাকে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। য়ুরোপের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল; Dark Age, তামস যুগের অন্ধকারে য়ুরোপ নিমজ্জিত হইল। কত শত বৎসর পরে গ্রীকসভ্যতার পুনরুত্থানে য়ুরোপ নবজীবন Renaissance লাভ করিল! চর্চ্চ কিন্তু স্থির করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে শয়তানের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে; তাই জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রই শয়তানের উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইত; বিজ্ঞান হইল Black

Art, তামস বিদ্যা। রজার বেকন, ব্রূনো, গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রতি আচরণই ইহার পরিচয়। আজিও খ্রীষ্টান জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিরোধভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে নাই। Lyall ও Darwin তাহার সাক্ষী। এইটুকু না বুঝিলে খ্রীষ্টান সাহিত্য বুঝা যায় না; ডাণ্টে ও মিল্টনকে বুঝা যাইবে না; গয়টের ফাউষ্ট্ ও বুঝা যাইবে না। সংসারের, সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা খ্রীষ্টানের প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করে; মানুষের সমাজব্যবস্থার অন্তস্তলে এমন কিছু আছে যাহা হইতে অপার দৈন্তের, অসীম বেদনার, অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। সেক্ষপীয়রের উপর চর্চ্চের আধিপত্য যে বড় বেশী ছিল, এমন বোধ হয় না; কিন্তু তিনিও যেন মানবজীবনের এই গোড়ায় গলদটার বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন নাই; তাঁহার হ্যামলেট্, ওথেলো, লীয়র, ম্যাক্‌বেথে এই প্রকাণ্ড জীবনরহস্যের বিভীষিকা প্রকট হইয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, এইটাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূলসূত্র। পাপের পূর্ণ অবতার, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তান যে খ্রীষ্টীয় সমাজের উপর ছায়া বিস্তার করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে জগতের সহিত মানবের সম্পর্ক ইউরোপীয়ের পক্ষে কতকটা অন্যরূপ হইয়াছে; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবির কাব্যে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল; তখন বিদ্রোহী মানব আপন মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

“কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে শয়তান নাই। বরং স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, আনন্দ হইতেই সমস্ত চরাচর, সর্ব্বভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আনন্দেই ভূত সকল জীবিত আছে; সংহার বা লয়কালে তাহারা আনন্দেই প্রবেশ করিবে। যাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন, তাঁহারা মৃত্যুকে

ভয় করেন না ; যেখানে আনন্দে জন্ম, আনন্দে জীবন, আনন্দে লয় সেখানে শয়তানের প্রভুত্ব থাকিতেই পারে না। বেদপন্থীর নিকট ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; তাঁহার কোনও রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারে না, এবং নাই। ব্যবহারিক জগতে যে অমঙ্গল বা দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ। যে মায়া হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই মায়া অর্থাৎ বিশ্বজননী শক্তি ও আনন্দরূপিনী; এই মায়া কখনও বিভীষিকা-ময়ী কল্পিত হয় নাই। অনার্য্যপূজিতা ভয়ঙ্করী বিন্ধ্য-বাসিনী এবং চামুণ্ডাও ব্রাহ্মণের হস্তে আনন্দময়ী শিবশক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। ঈশোপনিষদের একটি কথাতে বেদপন্থীর জগত্তত্ব অল্পের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—

যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

অর্থাৎ সমস্ত ভূতই আত্মায় বর্ত্তমান, এবং আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, সুতরাং এই জগৎকে ঘৃণা করিবার প্রয়োজন নাই। এইটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গোড়ার কথা। এ কথাটি স্মরণ করিয়া রাখিলে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, এবং অন্যদেশের সামাজিক ইতিহাসের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝা যাইবে। এইটুকুই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ইতিহাসের গোড়ার কথা। ঈশোপনিষদের অনেক পূর্ব্বে ঋগ্বেদসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে নাসদাসীয়সূক্তে জগৎসৃষ্টি বর্ণনে বলা হইয়াছে

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ,

বিশ্বজগৎটা কামনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এই কামনা বা কাম সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে উৎপন্ন ; এই যে কামনা, ইহা মায়া হইতে অভিন্ন ; বৈষ্ণবের ভাষায় ইহা—লীলা। একালে শোপেনহোয়ার জগৎকে যখন

একটা Will ও একটা Idea বলিয়াছেন, তখন সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উত্তরকালে কামকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হইয়াছে। এই জন্য তাঁহার নাম মনসিজ। তিনি আদি দেবতা ; মার বা মৃত্যু বা শয়তান নহেন। বৈদিক ঋষি জগৎকে মধুময় বিবেচনা করিতেন; জগৎকে ভয় করিতেন না। মধু বাতাঋতায়তে প্রভৃতি যে কয়টি মন্ত্র প্রত্যেক হিন্দুর মুখস্থ আছে, তাহা বৈদিক ঋষির একেবারে মনের কথা ; তিনি জগৎকে মধুময়, আনন্দময়, দ্যুতিময় দেখিতেন। বেদের দেবতাতত্ত্বের মূল ও এইখানে পাওয়া যায়।

"বেদের দেবতাতত্ত্বসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্ম বহু-দেববাদী বা একদেববাদী ; শুধু Theism না polytheism না pan-theism না Heno-Theism ; ইহা লইয়া বিস্তর বিচার বিতর্ক হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে নিরুক্তকারগণ ও মীমাংসাদর্শনের আচার্য্য-গণ এই বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় পদার্থের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিতেন; বেদে তাঁহারই পূজা হইত। কাহারও মতে এই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন ; একই ঈশ্বর সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাতা। আধুনিক পাশ্চাত্য মত এই যে, এককালে বৈদিক ঋষিগণের বহুদেবতায় বিশ্বাস হইয়াছিল ; ক্রমে তাঁহারা বহির্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগতের স্রষ্টার সমীপে from Nature to Nature's God এ পৌঁছিয়াছেন। প্রাচীন নিরুক্তকারেরা এই সকল দেবতাকে প্রাকৃতিক শক্তি স্বীকার করিতেন ; এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া, কোন্ দেবতা কোন শক্তির পরিচয় দেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও মতে দেবতারা এককালে প্রসিদ্ধ ক্ষমতাবান মনুষ্য ছিলেন (heroes), মৃত্যুর পরে দেবত্ব পাইয়াছেন।

বেদের মধ্যেই সাধ্যদেব বলিয়া এক শ্রেণী দেবতার উল্লেখ আছে; পূর্ব্বে তাঁহারা মানুষ ছিলেন; পরে তপস্যাদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর মানে না, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে; তবে সেই দেবগণ সিদ্ধপুরুষ মাত্র। মীমাংসাদর্শনের আচার্য্যগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করেন, সমস্ত হিন্দুসমাজ তাহা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা নিজে ঈশ্বর ও দেবতা কিছুই মানিতেন না। নৈয়ায়িকগণ এবং ঈশ্বর-কারণিকগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মানিতেন,—প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা একেশ্বরবাদী ছিলেন,—অথচ দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু সমুদয় বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; এমন কি, মহাযানী বৌদ্ধগণ ম্লেচ্ছজাতি হইতেও বহু দেবতা গ্রহণ করিয়াছিলেন; নিজেরাও নানা কাল্পনিক দেব দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"নানা মুনির নানা মত দেখিয়া বেদের দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। সমুদয় বৈদিক সাহিত্যের এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় যে, যাজ্ঞিক-দিগের মতে যে মন্ত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারণ করা হয়, সেই মন্ত্রের মধ্যে যাহার নামোল্লেখ আছে, তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা। কোনও কোনও মন্ত্রে ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নির কথা বলা হইয়াছে; তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের দেবতা। কোনও মন্ত্রে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠের কথা বলা হইতেছে; যূপকাষ্ঠ সেই মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পিতৃগণ হইতে পারেন; অশ্ব-মেধের ঘোড়া হইতে পারেন; ধনুর্ব্বাণ শিলাখণ্ড হইতে পারেন; অরণ্য নদী বা মণ্ডূক হইতে পারেন; বনস্পতি ওষধি হইতে পারেন; জ্ঞান শ্রদ্ধা বা বাগ্‌দেবতা হইতে পারেন; সংবৎসর ঋতুগণ, বা পূর্ণিমা অমাবস্যা হইতে পারেন; বিরাট পুরুষ হইতে পারেন; "ক" নামক অনির্দ্দেশ্য

দেবতা হইতে পারেন। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে, হ্রী, শ্রী, ধৃতি, শুচি, মেধা, স্বাহা, স্বধা, ওঁকার, বষট্‌কার (অগ্নিতে আহুতি দিবার সময়ে মন্ত্র—বৌ ষট্), ইত্যাদি দেবতা হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ জগতের মধ্যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর, অনুমানগোচর বা কল্পনাগোচর হইতে পারে, সমস্তই বৈদিক মতে দেবতারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

"দেবশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ,—যাহা দীপ্তিমান, দ্যুতিমান। বৈদিক ঋষি সমস্ত জগৎটা দ্যুতিমান দীপ্তিমান দেখিতেন। সুতরাং সমস্ত জগৎ এবং তাহার খণ্ডাংশ—যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর বা কল্পনাগোচর আছে বা হইতে পারে, সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে দেবতা। এই ভাবটি বেদান্তে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে;—আত্মা বা ব্রহ্ম যখন সকল ভূতেই বর্ত্তমান, এবং সকল ভূতই যখন আত্মাতে বর্ত্তমান, তখন সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক দ্রব্য যে দেবতা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এবং সবই যখন আনন্দময় দীপ্তিমান এবং সুন্দর, তখন ঋষি যে সকল দ্রব্যকেই স্তুতি করিবেন, তাহাতেই বা বিচিত্র কি? দীপ্তি দ্যুতি বা প্রকাশ যাহার আছে তাহাই দেবতা। আত্মার নিকট যাহা কিছু জ্ঞানগম্য হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাই দেবতা। জ্ঞানে এই প্রকাশ স্বরূপতঃ আত্মারই প্রকাশ; আত্মা আপনার দীপ্তিতে সকল পদার্থকেই দীপ্ত করেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে বেদান্তবাদকে আমরা পরিণতাবস্থায় দেখিতে পাই। দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত ইহার প্রমাণ। ঐ দুই সূক্তে যাহা আছে, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র তাহার উপরে নূতন কথা বলে নাই। ঐ দুই সূক্তের অর্থ না বুঝিয়া কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত বলেন যে, বেদান্ততত্ত্ব অনেক পরে উদ্ভূত। এই মতকে যদি কেহ Pantheism বলিয়া গালি দিতে চাহেন, তাহাতে বৈদিক ঋষির কোন ও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বেদানু-মোদিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে যখন সমস্ত জগৎটাই দেবতা,—আনন্দময়, দ্যুতিময়,

সুন্দর, তখন সেখানে দুঃখের, অমঙ্গলের বা শয়তানের স্থান হইতে পারে না। ব্যবহারজগতে দুঃখ, কুৎসিত, শয়তানি যাহা দেখা যায়, ব্রাহ্মণের হাতে পড়িলে তাহাও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

Edward Tylor এবং Andrew Lang হয়ত বলিবেন—ইহা ত savage philosophy। পৃথিবীর যাবতীয় savageই জাগতিক দ্রব্য মাত্রকেই জীবন্ত মনে করে, অথবা প্রত্যেক জিনিষের অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে, ইহা কল্পনা করে। ইহার নাম Animism। সাঁওতাল ও Hottentotএর সহিত এ বিষয়ে বৈদিক ঋষির কোনও পার্থক্য নাই। এ কথা আমি অস্বীকার করি না। Primitive animism ও প্রেতপূজা হইতেই সভ্য জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। Shakespeare বা Newton এর পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষ ছিলেন, ইহা স্বীকারেও তাঁহাদের মাহাত্ম্য যেমন কোনও রূপে খর্ব্ব হয় না; কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বা বৈদিক ঋষির মত জগৎকে জীবন্ত দেখিলে, এই দৃষ্টির সূত্রপাত savageএর মধ্যে পাওয়া যায় তাহা অঙ্গীকারে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বা বৈদিক ঋষির কোনও লজ্জার কথা নাই।

"সাংখ্যদর্শন, প্রথমে দুঃখকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন, এবং দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। বেদান্ত দুঃখকেই মানে না; উড়াইয়া দেয়; কাজেই তাহার কাছে দুঃখ নিবৃত্তির কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শন দুঃখকে পুরুষ ও প্রকৃতির অমূলক সম্মিলন হইতে উৎপন্ন বলেন। পুরুষ যে প্রকৃতির স্পর্শে বস্তুতঃ আসিতে পারে না, এই তত্ত্ব-টুকু জানিতে পারিলে সাংখ্যমতে দুঃখ অলীক হইয়া যায়, এবং উহার অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে।

"বুদ্ধদেব অতি স্পষ্টভাবে জগৎকে দুঃখাত্মক স্বীকার করিয়া দুঃখটাকেই

খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বোধিদ্রুমতলে সম্বোধিলাভের সময়ে যে চারিটি আর্য্য সত্য আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে জগৎ দুঃখ-ময়। এই দুঃখের অস্তিত্বে সমস্ত জগৎ পীড়িত; জগতের সেই পীড়া দেখিয়া তিনি নিজে পীড়িত হইয়াছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সকল দুঃখ হইতে দূরে রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; দৈবগত্যা রাজপথে পরিভ্রমণকালে জরা, ব্যাধি, এবং মৃত্যু, এই তিনরূপে দুঃখ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল। তদবধি তিনি আর শান্তি পাইলেন না; জগৎকে কি প্রকারে দুঃখভার হইতে মুক্ত করিবেন, সেই চেষ্টাতেই রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বোধিদ্রুমতলে দ্বিতীয় আর্য্যসত্য আবিষ্কার করিলেন, দুঃখের হেতু আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সত্যে তিনি সেই দুঃখনিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। ব্যাধির নিদান না জানিলে যেমন চিকিৎসা হয় না, সেইরূপ দুঃখের নিদান না জানিলে চিকিৎসা হয় না। তাই বৈদ্যরাজ তথাগত দুঃখের হেতু অর্থাৎ নিদান আবিষ্কার করিয়া পরের দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই নিদানতত্ত্বের নাম,—প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব। আমার "জিজ্ঞাসা" গ্রন্থে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই তত্ত্বই বৌদ্ধগণের সৃষ্টিতত্ত্ব; সাংখ্যের ও বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ইহার খুব বেশী প্রভেদ নাই। মূলে অবিদ্যা হইতে দুঃখ উৎপন্ন; অবিদ্যা হইতে দুঃখে পৌছিতে বারোটা ধাপ আছে। প্রসঙ্গতঃ এইখানে এই তত্ত্বের বর্ণনা একটু আবশ্যক।

"একালের sensationalist ও phenomenalist প্রভৃতি empirical philosopherগণ জগৎকে কতকগুলা sensationএর সমষ্টি বলিয়া জানেন। এই মতটা হিউমই স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেন। বুদ্ধের মতেও প্রতীয়মান জগৎটা কতকগুলা রূপরসস্পর্শাদির, সুখদুঃখ

হর্ষবিষাদ প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র। এই গুলার বৌদ্ধ পারিভাষিক নাম—"সংস্কার," হিউমের Idea। এই সংস্কারের মধ্যে সমস্ত Sensations Emotions, Cognitions, volitions রহিয়া গেল। ইহাদিগের মূল কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে বৌদ্ধ বলিবেন,—অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে; মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলিবেন-'শূন্যে'; হিউম ও হক্সলি বলিবেন,—জানি না; এই জন্য হিউম skeptic, হক্সলি agnostic। এখন এই গুলোর মধ্য হইতে কোনও রকমে "বিজ্ঞান" বা consciousness উৎপন্ন হয়। সেই বিজ্ঞানের ফলে জগৎটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়।—প্রথম, অন্তর্জগৎ Psychical world, (পারিভাষিক সংজ্ঞা—নাম); দ্বিতীয় বাহ্যজগৎ,—Physical world (পারিভাষিক সংজ্ঞা—রূপ); Psychical ও Physical world না বলিয়া world of concepts (নাম) ও world of percepts (রূপ) বলিলে বোধ করি ঠিক হয়। এই ভাগক্রিয়ার সঙ্গে "ষড়ায়তন" বা ছয়টি ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ উভয় জগতের মধ্যে 'স্পর্শ' ঘটে। সেই স্পর্শের ফলে 'বেদনা' অর্থাৎ বাহ্যজগতের অনুভূতি হয়। এই বেদনার ফল "তৃষ্ণা" অর্থাৎ বাহ্যজগৎকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি। তৃষ্ণার ফল,—"উপাদান" অর্থাৎ উপ—সমীপে, আদান গ্রহণ—সমীপে গ্রহণ, বাহ্যজগৎকে নিকটে টানিয়া আনা। এই ভোগকালে জীবের "ভব" অর্থাৎ অস্তিত্বটা পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে তাহার "জাতি" আসে; অর্থাৎ জীব তখন মনে করে যে, সে জন্মলাভ করিয়া একজন person ব্যক্তিবিশেষ হইয়াছে। এই "জাতি"র অর্থাৎ মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র ফল—"দুঃখ" দৌর্মনস্য; জরা, মরণ। এই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের আবিষ্কারের পর বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভ করেন।

"পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এই তত্ত্ব নানা উপায়ে জনসমাজে প্রচারিত করেন। ভবচক্রের উদ্ভাবনা তাহার মধ্যে অন্যতম। নিদান গুলিকে একখানা চক্রের নেমিতে চিত্রিত করা হয়। এই চিত্রের নাম "ভবচক্র"। চক্রের

কেন্দ্রে রাগ, দ্বেষ, ও মোহ; সেই কেন্দ্র ও পরিধির মাঝখানে সমস্ত নর লোক, দেবলোক, অসুরলোক ইত্যাদি ভবচক্রের অধীনে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; সমস্ত চক্রটাকে আঁকড়াইয়া জড়াইয়া কামড়াইয়া ধরিয়া আছেন—শয়তান। তাৎপর্য্য এই যে, রাগ দ্বেষ ও মোহকে কেন্দ্র করিয়া শয়তানের নিপীড়িত ভবচক্র ঘুরিতেছে। কেন্দ্রস্থ রাগ অর্থাৎ আসক্তি কপোতরূপে, দ্বেষ সর্পরূপে, ও মোহ শূকররূপে চিত্রিত হইয়াছে; ইহারা তিন-জনে পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া আছে। দ্বাদশটি নিদানের মধ্যে "তৃষ্ণা"র প্রতিকৃতি—সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি; "স্পর্শে"র—আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতি, উপাদানের চিত্রে বৃক্ষ হইতে একজন ফল পাড়িতেছে; "অন্তিম নিদানে"র চিত্রে—বাঁশের দোলায় চড়া শবমূর্ত্তি। প্রসিদ্ধি আছে যে, নাগার্জ্জুন এই ভবচক্রের উদ্ভাবয়িতা; ডাক্তার ওয়াডেল অজন্তা গুহা হইতে ইহার প্রতি-লিপি প্রকাশিত করেন। তিব্বতের মঠে এই ছবি অনেক আছে।

"প্রথম নিদান কয়টি বাদ দিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা হইতে দুঃখ; কাজেই এই তৃষ্ণাকে দমন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের আগ্রহ। বাহ্যজগৎকে কোনও রূপে হেয়, কদর্য্য, বর্জ্জনীয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে, তৃষ্ণাকে দমন করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টানের মত বৌদ্ধও বাহ্য জগৎটাকে Evil অশিব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; বৌদ্ধদিগের সমস্ত বিনয়ের ( discipline ) উদ্দেশ্য এই।

"এইখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ব্যবহারিক জগতে কদর্য্য কুৎসিত আছে, এ কথা ব্রাহ্মণ অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি কদর্য্যকে বিনাশ করিতে, কুৎসিতকে সুন্দর করিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের practical disciplineএর উদ্দেশ্য ইহাই। কুৎসিতের ভিতর হইতে সৌন্দর্য্যকে টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে, তিনি সেই কুৎসিতকে চাপা দিতে

চেষ্টা করেন। বিশ্লেষণ করিয়া কদর্য্যকে বাহির করিয়া দেখান ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে। বৌদ্ধ কদর্য্যকে দেখাইতে চায়; গাঢ় রং ফলাইয়া বীভৎস করিয়া তুলে। এইখানে খ্রীষ্টানের সহিত বৌদ্ধের মিল দেখিতে পাই।

"শ্রীমতী রিস ডেভিস সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত চেতন জগতের দুঃখের বেদনায় বৌদ্ধ ভারতবর্ষের হৃদয় ও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; বেদান্তের সুখময়, তৃপ্তিময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে; হিম উষালোক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম হিসাবে, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া গণ্য করিত; ইন্দ্রিয় গুলাই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে; গলিত ন্যক্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রূপজমোহ জয় করিতে হইবে।

"এই ভাবগত বিরোধ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বেশ ধরা পড়ে। স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বার্দ্ধক্যে গৃহ হইতে বিদায়গ্রহণের বা ছুটি লইবার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া বনে পলাইবার ব্যবস্থা কোনও কালেই ছিল না। গৃহস্থ আশ্রমকে এইজন্য শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে; এবং বিবিধ সংস্কার, সদাচার, ব্রত, অনুষ্ঠান, প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যের বাহ্য ও অভ্যন্তর দেহকে সমর্থ, সুন্দর, ও বিশুদ্ধ করিবার বিধান হইয়াছে। দেশ কাল ভেদে সেই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনীয় কিনা, সে বিচারের এ স্থল নহে। রামায়ণ, মহাভারতে অপরিসীম দুঃখের কথা আছে; দুঃখকে দূরে পরিহার করিয়া পলায়নের ব্যবস্থা নাই। সমস্ত ভগবদ্গীতায় মানুষকে গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে কাব্য সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। জাতকগ্রন্থে বা অবদানগ্রন্থে বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগের প্রচুর উদাহরণ আছে; কিন্তু উহাতেও এমন একটা morbidness আছে, যে দেশের সাধারণের মন ভিজে নাই। সে আখ্যায়িকাগুলি প্রায় লুপ্ত ও বিস্মৃত; পক্ষান্তরে জগৎকে ও মানবকে

সুন্দর, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ দেখাইবার জন্যই যেন—কালিদাস ও ভবভূতি জন্মিয়াছিলেন।

"নারীজাতির প্রতি ব্যবহারেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সীতা সাবিত্রীর ত কথাই নাই; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর মহিমা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোনও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাব্য সাহিত্যে স্থান পান নাই এমন অনেক নারী আছেন, সামান্য ইঙ্গিতে আভাসে যাঁহাদের রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; অথচ কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে তাঁহাদের তুলনা মিলে না। আদর্শ পুরন্ধ্রী অরুন্ধতী, অনসূয়া ও লোপামুদ্রা ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের বাহিরে দেখা যায় কি? তাঁহাদের পুণ্য চরিতে এমন একটা গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, মর্য্যাদা dignity আছে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে অতুল্য। সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যে ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদিগের মধ্যে অনেক বিশুদ্ধচরিত্র মহাভাগ স্ত্রীলোক ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটের উপরে বৌদ্ধেরা নারীজাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রথম যুগে নারীর প্রতি খ্রীষ্টানের ভাব ও এইরূপ ছিল। সেইজন্যই উভয়ত্র চিরকৌমার্য্যের মাহাত্ম্য এত বেশী। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু পুরুষ ও নারীর বিবাহসংস্কার একান্ত আবশ্যক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"সুন্দর ও কুৎসিতের কথা বলিতেছিলাম,—আধুনিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মে ও শাক্তধর্ম্মে বৌদ্ধপ্রভাব খুব বেশী; কিন্তু তাহারাও সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ দুঃখবাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই; জগৎকে কদর্য্য ও কুৎসিত দেখিতে পারে নাই। বৈষ্ণবের ভগবানের মূর্ত্তি,—মদনমোহন; তাঁহার লীলাভূমি বৃন্দাবন, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ, সৌন্দর্য্যময়। শাক্ত তাঁহার জগন্মাতাকে আনন্দময়ী বলিয়া জানেন, এমন কি ঘোররূপা কালীমূর্ত্তিতে পরম সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। রামপ্রসাদ সংসারের দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার

গানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার মনে সম্পূর্ণ জোর ছিল যে তিনি তাঁহার মায়ের চরণ ধরিয়া যমকে ফাঁকি দিতে পারিবেন ; শমনের ভয় তাঁহার ছিল না।

"আধুনিক হিন্দুত্বের মধ্যে বোধ হয় মোটামুটি একটা সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত ; যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ভাব প্রবল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের মাধ্য এই শ্লোকটি আছে :—

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিবররশেষৈর্গুরুকৃতম্।

"বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরাও নারীদেহ চিরিয়া এমন করিয়া অন্ত্র বাহির করিয়া দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। ব্রাহ্মণ ভবভূতির বোধ হয় এ শ্লোকে হৃৎকার হইত। এবং যে প্রকৃত বৈষ্ণব নারীতে হ্লাদিনী শক্তি দেখেন, কিম্বা যে প্রকৃত শাক্ত নারীতে জগজ্জননীর অংশ কল্পনা করেন, তাঁহারা এ শ্লোক শুনিলে কাণে অঙ্গুলি দিবেন। ভর্তৃহরি আপন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ তিনি শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু এই বৈরাগ্যশতকের এই নারীর প্রতি জগুপ্সা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব মহৎ। ভোগের পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ভোগনিবৃত্তির জন্য নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণের পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রেও যেখানে এইরূপে জগৎকে

কদর্য্য, নারীকে অপবিত্র করিয়া বর্ণনা হইয়াছে, সেখানে মূল অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধভাব পাওয়া যাইবে, ইহা আমার বিশ্বাস।

"বাহ্য জগতের প্রতি এই অবজ্ঞার দরুণ বৌদ্ধেরা Physical Science এ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এখানে ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে হিতসাধন বৌদ্ধের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল; সেই জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং তৎসম্পৃক্ত Alchemy ও Chemistryতে সে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুস্তকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু যে বিদ্যার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ জ্ঞানের উন্নতি; মানবহিতের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই,—যেমন গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি,—সে বিদ্যায় বৌদ্ধ কালক্ষেপ করে নাই।

৩

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা বলিলাম তাহাতে অনেকে ঘাড় নাড়িবেন, তাহা আমি জানি। এ কালের হিন্দুসমাজে এরূপ বৈরাগীর দল আছে যাঁহারা জগৎকে হেয় ও মানব-দেহকে জঘন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অনিত্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের মতটাকে আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ্যের অনুমোদিত বলিতে পারি না। এ কালের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও সাম্প্রদায়িক শাক্তদিগের মধ্যেই এই মতের প্রবলতা দেখা যায়; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শাক্ত যে অনেকটা বৌদ্ধ ভাবে অভিভূত হইয়াছেন, তাহা ইতিহাসের কথা। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বা বিশুদ্ধ শাক্ত এই মত ঘাড় পাতিয়া লইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস নহে। যে বৈষ্ণব জগৎকে কুৎসিত ও হেয় বলিয়া মনে করেন, তিনি বৃন্দাবন-লীলার তত্ত্ব সম্যক বুঝেন নাই। যিনি দেহটাকে কুৎসিত ও অপবিত্র বলিয়া জানেন, তিনি সেই দেহকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করিতে অধিকারী নহেন। আর তান্ত্রিক শাক্ত ত সেরূপ ভাবিতেই পারেন না। যে দেহের নিম্নে কুণ্ডলিনীবেষ্টিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, ও উর্দ্ধে সহস্র-দলপদ্মস্থিত পরম শিব, সেই দেহ তাঁহার নিকট অশুদ্ধ হইতে পারেই না। তান্ত্রিক পূজায় বসিতে হইলে দেহটাকে বাগ্‌দেবতার দেহ হইতে অভিন্ন মনে করিতে হয়; উহা কি কখনও অপবিত্র হইতে পারে?

"কথাটা যখন উঠিল, তখন আমাদের পূজার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিয়া লই। ইতর সাধারণে জানে যে, পূজার অর্থ ঢাক,

ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্য উপহার দিয়া দেবতাকে খুসী করিয়া দেবতার নিকট ইহলোকের বা পরকালের জন্য কিছু আদায় করা। উহা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু ষোল আনা ঠিক নহে। শাস্ত্রকারেরা দেবপূজা সম্বন্ধে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন, তাহা আমরা লইতে বাধ্য ; কেন না পূজার পদ্ধতিটাও সেই theory অনুসারে রচিত। বৈদিক যুগে পূজা ছিল না, যজ্ঞ ছিল। যজ্ঞের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে কতক বলিয়াছি। যজমান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার সহিত একত্ব লাভ করিতেন; আপনাকে বা আপনার নিষ্ক্রয় রূপে অন্য কোনও দ্রব্য আহুতি দিয়া ও হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া দেবতার সহিত এক হইতেন। এই দেবতা যিনিই হউন, তিনি আত্মারই প্রকাশ; কেন না আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। অতএব শেষ পর্য্যন্ত theoryটা দাঁড়াইল এই যে, যজ্ঞের উদ্দেশ্য আত্মাকে লাভ। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই মত তত স্পষ্ট না হউক, আরণ্যকে ও উপনিষদে ( যাহা ব্রাহ্মণেরই অংশ ) ইহা প্রায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, পরমায়ু লাভ হয়, ইত্যাদি প্রলোভন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রচুর আছে বটে, কিন্তু সেগুলা মীমাংসা-দর্শনের মতে অর্থবাদ মাত্র বা ছেলে ভুলানো কথা মাত্র। মীমাংসা-দর্শন বেদের যে ব্যাখ্যা দিবেন, সামাজিক হিন্দু তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য।

"এ কালের অধিকাংশ পূজা তান্ত্রিক পূজা ; সকল বর্ণের ইহাতে সমান অধিকার। শূদ্র আপন ঘরে কালীপূজা করিতে পারে ; ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা আবশ্যক নহে। বেদের যেটা শেষ কথা, তন্ত্র সেটা গোড়ায় মানিয়া লইয়াছেন। সেই কথাটা—সোহহং—আমিই সেই ব্রহ্ম, আমা ছাড়া অন্য ব্রহ্ম কল্পনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের নামান্তর আত্মা বা আমি। এই তত্ত্বটুকু লোকে জানে না ; জানিলেই মুক্তিলাভ।

তান্ত্রিক পূজার তাৎপর্য্য—এই মুক্তি লাভের চেষ্টা ; আপনাকেই ব্রহ্ম বা আত্মারূপে জানিবার চেষ্টা। যিনি পূজায় বসেন, তিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে সাব্যস্ত করেন। ইহাকে যজমানের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সাধন মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বৈদিক যজ্ঞের ও তান্ত্রিক পূজার উদ্দেশ্য একরূপই হয়। তান্ত্রিক পূজার পদ্ধতি আলোচনা করিলেই ইহা দেখা যাইবে। তান্ত্রিক পূজার প্রধান ও সাধারণ মন্ত্র "হংসঃ সোহহম্" আমিই সেই হংস। অনেকের ধারণা যে বেদের সোহহংএর অক্ষর উল্টাইয়া তন্ত্র হংস করিয়া লইয়াছেন। তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। এই হংস মন্ত্রের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ঋগ্-বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে ৪০ সূক্তের শেষ ঋক্ "হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্ত-রিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ" ইত্যাদি। ইহার নাম হংসবতী ঋক্, এবং ইহার ঋষি বামদেব, ইহার দেবতা সূর্য্য। হন্তি গচ্ছতি এই অর্থে সর্ব্বত্র গতি-শীল বলিয়া সূর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। মন্ত্রটি মোটের উপর বুঝায় যে, ঐ যে হংস বা সূর্য্য, উহা ভূলোকে দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে জলে পর্ব্বতে ব্যোমে মনুষ্যমধ্যে সত্যমধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বৎসরব্যাপি গবাময়ণ সত্রের মধ্য দিনে দ্বাদশাহ যাগের ষষ্ঠাহে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইত। আমার অনুবাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঐ প্রসঙ্গে ঐ মন্ত্রের সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। শুক্ল যজুঃ সংহিতায় দেখিবেন, রাজসূয় যজ্ঞেও ইহার ব্যবহার হইত। মহীধর সেখানে সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়া-ছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য সূর্য্যপক্ষে ও ব্রহ্মপক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমার জ্ঞানগম্য বলিয়াই দেবগণের দেবত্ব ; এই অর্থে ব্রহ্মরূপী আত্মার প্রকাশেই দেবগণের প্রকাশ। এই জন্য ব্রহ্মকে স্বয়ংপ্রকাশ ও অন্য দেবতাকে ব্রহ্মের দ্যুতিতে প্রকাশমান বলা হয়। ব্রহ্মই সকল দেবতাকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন।

স্থূল জগতে সূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশ; জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দীপ্তিতে অন্য সমস্ত দীপ্তিমান হয়; সূর্য্য সর্ব্ব প্রাণীকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন; ইত্যাদি কারণে সূর্য্যকে ব্রহ্মের সহিত উপমিত করা যায়। গায়ত্রী মন্ত্র ইহার প্রমাণ। উপনিষদেও আদিত্যমধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষের উল্লেখ আছে, তিনি আত্মা। প্রচলিত নারায়ণের ধ্যানে সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়বপু পুরুষের কথাও স্মরণ করুন। হংসবতী ঋকের হংস শব্দ সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, ব্রহ্মপক্ষে প্রযুক্ত হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। যাজ্ঞিকী উপনিষদে ও কঠোপনিষদের পঞ্চম বল্লীতে ঐ হংসবতী ঋকের হংস শব্দ স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রও হংস শব্দে আত্মা বা ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। "হংসঃ সোঽহম্" এই তান্ত্রিক মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়াইল—আমিই সেই হংস বা ব্রহ্ম। দেহমধ্যে কল্পিত ষট্‌চক্রের উর্দ্ধতম চক্রে, অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে ইঁহার অবস্থান কল্পিত হইয়াছে। সেই স্থানে শিবরূপী হংস বিদ্যমান। তান্ত্রিকেরা সুরাশোধনের জন্য এই হংসবতী ঋক্ প্রয়োগ করেন; ইহা দ্বারা মদ্য অমৃতে পরিণত হয়।

"তান্ত্রিক পূজার কথা বলিতেছিলাম। এই পূজার মুখ্য অঙ্গ,—ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস। এই দুই ক্রিয়ার পর দেবতাপূজার অধিকার জন্মে। ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য এই। মানবদেহ ক্ষিত্যাদি পাঁচটা স্থূলভূতে নির্ম্মিত। সর্ব্বসাধারণে মনে করে, এই স্থূল দেহটাই আমি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। স্থূল ভূতগুলি বিশ্লেষণ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র পাওয়া যায়। শব্দ স্পর্শাদি প্রত্যয়গুলির সমষ্টিতেই স্থূলভূত নির্ম্মিত। এই শব্দস্পর্শাদি আবার বিজ্ঞানের বা অহঙ্কারের বা Self-consciousnessএর আনুষঙ্গিক ফল। এই বিজ্ঞান বা অহঙ্কার শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্যের

ভাষায় পুরুষযোগে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়; বেদান্তের ভাষায় আনন্দস্বরূপ আত্মা কর্তৃক মায়াযোগে উৎপন্ন হয়। ইহা খাঁটি Idealism। সাংখ্যের ও বেদান্তের এই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় একরূপ; বেদান্তের আত্মা বা আমি,—সাংখ্যের পুরুষ। বেদান্তের আত্মা আমি একমাত্র পুরুষ; তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম, ইঁহাদের অস্তিত্ব কল্পিত। সাংখ্যে আমি তুমি সে সকলেই পুরুষ,—বহুপুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতিকে বেদান্ত মানিতে চাহেন না। যাঁহারা উভয় মত মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতিকে আত্মার মায়াজাত কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া মিলাইয়া দেন। বৌদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্বের সহিতও এই দুই সৃষ্টিতত্ত্বের বড় ভেদ নাই। তবে বেদান্ত যেখানে আত্মাকে এবং সাংখ্য পুরুষকে বসান, বৌদ্ধ সেখানে একটা শূন্য বসাইয়া দেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধকে বসাইয়া বেদান্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চাহেন। যাহা হউক, মানুষের স্থূলদেহটা একটা কাল্পনিক পদার্থ, এ বিষয়ে তিনেরই এক মত। আসল জিনিষটা, the thing-in-itselfটা,—আত্মা; এইটা বুঝিলেই মুক্তিলাভ ঘটিল। তান্ত্রিক পূজার ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়াটা ইহাই;—স্থূল দেহটাকে বিশ্লেষণ করিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আত্মাকে বাহির করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াতে সাংখ্যের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু কাণ্ডটা বেদান্তঘটিত। যিনি পূজায় বসিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, আমি আত্মাস্বরূপ,—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। আর জন্মমৃত্যু, ইহকাল পরকাল, সুখদুঃখ, জগৎ সংসার সবই আমার কল্পিত। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ব্যবহারিক জগৎটাই কল্পনাতে পর্য্যবসিত হয়। এই ভূতশুদ্ধির পর দেহের মধ্যস্থিত পাপপুরুষটা স্বভাবতঃই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাপপুরুষের কথা আগে বলিয়াছি।

"ভূতশুদ্ধির পর ন্যাস। নানাবিধ ন্যাসের মধ্যে মাতৃকান্যাস প্রধান। পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিয়া কং খং গং ঘং করিয়া সমস্ত

alphabetটা পুনঃ পুনঃ আওড়ান, ও দেহের নানা স্থান স্পর্শ করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা মনে করেন, না জানি কি একটা কারখানা হইতেছে; যাঁহারা আমাদের মত mocker, তাঁহারা মনে মনে হাসেন। কিন্তু ব্যাপারটার যাহা হৌক একটা তাৎপর্য্য আছে, তাহার খোঁজ কেহই বোধ করি রাখেন না। পূজক পূজায় বসিয়া ভূতশুদ্ধি দ্বারা ঠিক করিয়া লইয়াছেন, আমিই ত ব্রহ্ম; আমার পূজা আবার আমি কি করিব? এই খানে হিন্দুর ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট কথা, একটু মজার কথা আছে। খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি একেশ্বরবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরেরই পূজা করেন, অন্য কাহারও পূজা sacrilege বা অধর্ম্ম ভাবেন। বেদপন্থী হিন্দু এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজা করেন না; তৎপরিবর্ত্তে বহুদেবতার, বহুদ্রব্যের পূজা করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্ম ত আমিই; আমি আবার আমার পূজা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থানী বেদান্তী নিশ্চল দাস নাকি তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিবার দেবতাই খুঁজিয়া পান নাই। যাঁহাকে পূজা, প্রার্থনা, স্তুতি করিতে হইবে, তাঁহার উপর কোনও না কোনও একটা গুণের বা উপাধির আরোপ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইলে তিনি খাটো হইয়া গেলেন। যাঁহাকে পূজা করিব, তিনি যখন স্তুতির বা প্রার্থনার বিষয় বা বস্তু, তখন তিনি সগুণ হইয়া গেলেন। তিনি আর সাক্ষী নিরুপাধিক আত্মা থাকিলেন না; তিনি আর খাঁটি Subject থাকিলেন না, খাটো হইয়া Object হইয়া গেলেন। হউন না কেন তিনি Object of worship, তথাপি তিনি আমার পক্ষে object; Object হইলেও তিনি যখন আমার বা আত্মার object, আত্মার ধ্যান ধারণার বিষয়, তখন নিম্নাধিকারীর পক্ষে আত্মারই প্রকাশ বলিয়া পূজার যোগ্য হইতে পারেন। যে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, সে মুক্ত; সে কাহাকে পূজা করিবে? যিনি কোনও দেবতার পূজায় বসিয়াছেন, তিনি যে মুক্ত নহেন,

তাহা স্বীকার করিয়াই বসিয়াছেন। নতুবা পূজার কোন অর্থই হয় না। ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা মাত্র; তিনি আত্মায় কোনও না কোনও গুণ আরোপ করিয়া তাহাকে পূজাযোগ্য—object of worship করিয়া লউন।

"মাতৃকান্যাসের অর্থ আত্মাকে পূজাযোগ্য করিয়া লওয়া, আত্মার একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার পূজায় বসা। ভূতশুদ্ধির দ্বারা স্থির হইয়াছে—আমিই পরম দেবতা। আচ্ছা, পূজার জন্য তাহার একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লওয়া যাউক। মাতৃকা শব্দের অর্থ বাগ্‌দেবতা। বাক্ (বা বাক্য) শব্দরূপা। শব্দব্রহ্মের কথা শুনিয়াছেন; শব্দে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তের কথা আগে বলিয়াছি। সেখানে বাক্ দেবী অম্ভৃণঋষির কন্যারূপে কল্পিতা হইয়াছেন। উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিবাদকালে মণ্ডণমিশ্রের পত্নী উভয়-ভারতী সরস্বতীর অবতাররূপে কল্পিতা হইয়াছিলেন। এও কতকটা সেই-রূপ। ঐ সূক্তের ঋষি বাগ্দেবী, দেবতাও বাগ্দেবী। বাগ্‌দেবী বলিতেছেন—আমিই ইন্দ্রাদি দেবতাকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছি; আমিই পৃথিব্যাদি জগতের সৃষ্টি করিয়াছি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। কাজেই যিনি ঋষি, তিনিই দেবতা। এই বাগ্‌দেবী ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ; ইনিই শব্দরূপা। বাগ্‌দেবী Gnosticদের Sophia বা wisdom, প্রজ্ঞা; আর শব্দ বাইবেলের logos, word or Christ। বেদের ব্রাহ্মণে আমরা এই বাগ্দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকা আছে, ইনিই দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে আছে যে, গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। অতএব গায়ত্রী বাগ্‌দেবীর অন্য রূপ; উভয়েই শব্দরূপিণী বা ব্রহ্মরূপিণী। শব্দ বর্ণাত্মক; অ আ হইতে হ ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটা বর্ণ পরস্পর মিলিত হইয়া সকল শব্দের সৃষ্টি করে।

তান্ত্রিকেরা এই বাগ্‌দেবীকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রমতে তিনি "পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলা"—পঞ্চাশটা বর্ণে বাগ্‌দেবতার মুখ, হাত, পা, মাঝা, বুক নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। তিনি "সুধাঢ্যকলস" ধরিয়া আছেন,—তাঁহার হাতে অমৃতপূর্ণ কলসী। এই অমৃত বেদের সোম ও তন্ত্রের সুরা। বৈদিক বিশ্বামিত্র বলিতেন, সোমপানে আমি অমৃত পান করিয়াছি, "অপাম সোমমমৃতা অভূম।" তান্ত্রিক রামপ্রসাদ বলিতেন—'সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।'

"এখন মাতৃকান্যাসের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ভূতশুদ্ধির দ্বারা পূজক আপনার স্থূল দেহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া আত্মাকে সৎ পদার্থ স্থির করিয়াছেন। এখন পূজার জন্য এই আত্মার মূর্ত্তির কল্পনার আবশ্যক। বাগ্‌দেবতা সেই মূর্ত্তি; পঞ্চাশটা বর্ণে সেই মূর্ত্তি গঠিত। আচ্ছা, মোটামুটি যে মানবদেহকে আত্মার অধিষ্ঠান মনে করা যায়, সেই দেহটাকেই সেই মূর্ত্তি মনে করুন। তাহার নানাস্থানে, মুখে বুকে হাতে পায়ে অ আ হইতে হ ক্ষ পর্য্যন্ত বসান যাউক। বাহিরের শরীরটা বড় মোটা, অন্তঃশরীরটা আরো সূক্ষ্ম; সেখানে কল্পিত ছয়টা চক্রেও সেই পঞ্চাশটা বর্ণ বসান যাউক। আন্তর ও বাহ্য মাতৃকান্যাস অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে অক্ষরগুলির এইরূপে ন্যাস বা স্থাপনা দ্বারা বাগ্‌দেবীর বা ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইল। এখন তাঁহার পূজায় বসা যায়। এই পূজাটা মানসপূজা হিসাবে ঠিক; কাজেই আগে মানসপূজাই করিতে হয়। পূজা সেই আত্মরূপা দেবতারই। সম্মুখে যে প্রতিমা বা যন্ত্র থাকে, সে উপলক্ষ মাত্র; নিত্যপূজায় তাহা আবশ্যকও নহে। মানসপূজাটাই পূজা; উহা personal। বাহ্য পূজাটার জন্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যের আড়ম্বর করা হয়; উহা personal নহে। উহার তাৎপর্য্য communal; বাড়ীর ছেলে পিলে, বৌ ঝি, পাড়াপড়সী, সমাজের পাঁচটা

লোককে দেখাইয়া ভুলাইয়া একত্রে বাঁধিবার জন্য উহার প্রয়োজন থাকিতে পারে; উহার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন, লোকসংগ্রহ, লোকস্থিতি। আত্মার লাভে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে উহা আবশ্যক নহে। প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে কেহ বাধ্য নহে; না করিলে কোনও প্রত্যবায় নাই; সমাজের অধিকাংশ লোকই করে না, বা করিতে পারে না। উহাকে পুতুল পূজা বলিয়া গালি দিলেও কাহারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তাহার পাল্‌টা জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না।

"কথাটা এই যে আমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, তাঁহার পূজার কোনও অর্থ নাই; দেবতার পূজার অর্থ আছে; এবং আমরা দেবতারই পূজা করি। আমাদের মধ্যে যে নব্য সম্প্রদায় সমাজবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান, স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ দেবতা পূজা করেন, এবং ঐ পূজাতেই communal ভাবটাই অধিক স্পষ্ট দেখা যায়। উহার সহিত বৈদিক বা তান্ত্রিক পূজার কোনও বিরোধ নাই।

"এক কথা বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। স্থূল-ভূত নির্ম্মিত মানবদেহটা আমাদের নিকট অলীক কাল্পনিক পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু কদর্য্য হেয় আবর্জ্জনা হইতে পারে না। হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৌদ্ধ মঠে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতেছি; কিন্তু বেদের সহিত গোড়ায় মিল না থাকিলে উহা বেদপন্থী সমাজে স্থান পাইত না।"

রামেন্দ্র বাবু একটু চুপ করিলেন। ভৃত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আধ আউন্স আঙুরের রস সেবন করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এইবার জগন্নাথের মন্দিরের কথা বলিব। কথাটা প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এই রকম মনে হইতে

পারে, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এত কথা বলিলাম, মনে করিবেন না যে বড় বেশী অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। জগন্নাথের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসটা জানা আবশ্যক; সমস্ত ভারতবর্ষ যেন ঘনীভূত হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। অনার্য্য, আর্য্য, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, সকল ভাবের মিশ্রণ আমরা এখানে দেখিতে পাই। হণ্টর সাহেব এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যান মতে মধ্য-ভারতবর্ষের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুচরগণ সমুদ্রতীরে নীলাদ্রির নিকট অরণ্যমধ্যে নীলমাধবের আবিষ্কার করেন। তাঁহার মাহাত্ম্যে সেই অরণ্য পূর্ণ ছিল। অরণ্যবাসী শবরেরা তাঁহার পূজা করিত। তাঁহার আকৃতি মণিময়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিন্তু সদলবলে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, অরণ্য হইতে দেবতা অন্তর্হিত। বহু যুগব্যাপি তপস্যার পর তিনি বর পাইলেন যে, দেবতা দারুরূপে সমুদ্রে ভাসিয়া আসিবেন, এবং সেই দারু হইতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাজা তাঁহার পূজা করিবেন। যথাকালে দারু সমুদ্রতটে আসিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাসমারোহে সেইটিকে তুলিয়া আনিয়া বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে তিনমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই তিন মূর্ত্তি, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। ইঁহাদের সঙ্গে সুদর্শনচক্রের একটি প্রতিকৃতি পূজিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে জগন্নাথের এই দারুমূর্ত্তির ভিতরে বিষ্ণুপঞ্জর বা শ্রীকৃষ্ণের অস্থি গুপ্ত আছে।

"এই যে বটতলার ছাপা নারদসংবাদ নামে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ রহিয়াছে, উহা হইতে খানিকটা তুলিয়া লইতে পারেন। পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান অল্প রূপান্তরিত হইয়া বুদ্ধ-অবতারের বিবরণ দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

এই যে আমার বংশ কিছু না রহিবে
আত্মবন্ধু যুদ্ধ করি সকলি মরিবে॥
একা আমি নিম্ববৃক্ষে রহিব যখন।
বালির নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন॥
অবশেষে অস্থি মম কিছু না রহিবে।
ব্যাধগণে সব অস্থি লইয়া যাইবে॥
নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন।
নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব্ব জন॥
এক দিন ব্রহ্মা যাবেন কৈলাস শিখরে।
কহিবেন এই কথা দেব দিগম্বরে॥
শুনহ পার্ব্বতীকান্ত বচন আমার।
কেমনে হবেন প্রভু বুদ্ধ অবতার॥
ব্যাধগণ রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
দরশন তাহার না পায় কোন জন॥

তাহার পর মহাদেবের উপদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সদলবলে বাহির হইলেন,—

বহুযত্নে রাজা সব পাইবে সন্ধান॥
যত্ন করি আমারে আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে॥
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
এই নিম্বকাষ্ঠ ভাসি আসিবে আপনি॥

সেই কাঠে চারি মূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন ॥

*　　*　　*　　*

হেন মতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার।
হইবে কহিলাম মুনি প্রকার তাহার ॥
কৃষ্ণদাস কহে এই অবতার সার ॥
যে দেখে তাহার জন্ম নাহি হয় আর ॥

গ্রন্থশেষে জগন্নাথের স্তোত্রমধ্যে দেখুন,—

সিন্ধুতট নীলগিরির মধ্যে স্থাপনং।
ধন্য কীর্ত্তি, ধন্য, ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং ॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনং।
নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপ দেহি পদশরণং ॥

"এই কৃষ্ণদাস যিনিই হউন, তিনি ইংরাজিনবিশ ছিলেন না। অতএব জগন্নাথে বুদ্ধত্ব আরোপ কেবল ইংরাজি নবিশের খেয়াল নহে। কিন্তু তিনি স্বীকার করিতেছেন জগন্নাথই বুদ্ধ অবতার, এবং আদিতে তিনি ব্যাধগণের দেবতা ছিলেন।

"দেখা যাইতেছে যে, জগন্নাথদেব প্রথমে অনার্য্য শবরদিগের দেবতা ছিলেন; পরে তিনি আর্য্যদিগের পূজা লাভ করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত জগন্নাথের যাত্রা প্রভৃতিতে শবরদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। রথযাত্রায় রজ্জু টানিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শবরবংশ আছে; তাহারা রজ্জুতে হাত দিলে পর অন্য লোকে হাত দিতে পারিবে। এই তিন মূর্ত্তির সঙ্গে হিন্দুমন্দি-রের আর কোনও দেবতাবিগ্রহের সাদৃশ্য নাই। জগন্নাথের পূজা এখনও communal,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ও অনেক অন্ত্যজ জাতির মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার সমান। মহাপ্রসাদভক্ষণে জাতিবিচার বা বর্ণবিচার

নাই। পূজাপদ্ধতির ও যাত্রাদির সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুবিগ্রহের পূজাপদ্ধতির তেমন মিল নাই। এই সকল অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলা বিশিষ্ট ভাব আছে যাহাতে হিন্দুবিগ্রহের চেয়ে বৌদ্ধবিগ্রহের পূজার সাদৃশ্য দেখা যায়। মৃতের অস্থিপূজা বৌদ্ধদিগের প্রধান অনুষ্ঠান; সম্ভবতঃ তাঁহারাই ইহার প্রবর্ত্তক। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে ইঁহারা প্রথমে বৌদ্ধ-বিগ্রহই ছিলেন; আদিতে এই তিন মূর্ত্তি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মূর্ত্তি ছিল। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলরাম—সঙ্ঘ, সুভদ্রা—ধর্ম্ম।

"ধর্ম্ম কিরূপে স্ত্রীমূর্ত্তি পাইলেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বৌদ্ধ-গণ ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় পরিণত করিয়া তাঁহার এই স্ত্রীরূপ কল্পনা করিয়া ছিল। ঐ যে চক্রকে সুদর্শন চক্র বলা হয়, উহা, এই মত অনুসারে বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র। বৌদ্ধচৈত্যে ও মন্দিরে এই ত্রিরত্নের ও ধর্ম্মচক্রের পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ত্রিরত্নের মূর্ত্তি—মানবী মূর্ত্তি; কিন্তু বহুস্থলে যন্ত্রে পূজা প্রচলিত আছে। এই তিনটি রত্নের প্রত্যেকের অনুযায়ী যন্ত্র কল্পিত হইয়াছিল। হিন্দুদেরও যন্ত্রপূজা আছে। বৌদ্ধরত্নত্রয়ের যন্ত্র কেমন করিয়া রূপান্তরিত হইয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রায় পরিণত হই য়াছে, কানিংহাম সাহেব তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' দ্বিতীয়ভাগেও ইহার বর্ণনা আছে। জগন্নাথের পূজা যে আদিতে বৌদ্ধপূজা ছিল, তাহা কানিংহাম সাহেব এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাহেবি মত বলিয়া উহা উপেক্ষা কিম্বা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, জগন্নাথই বুদ্ধ অবতার। জগন্নাথ যে বুদ্ধদেব, তাহা অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থেও দেখিয়াছি। উড়িষ্যায় এখনও আপামর সাধারণে জগন্নাথকেই বুদ্ধ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে। উড়িয়া সাহিত্য হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু তাঁহার

Modern Buddhism নামক গ্রন্থে স্তূপীকৃত করিয়াছেন। কাজেই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে এই ত্রিমূর্ত্তি হিন্দুর দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, এবং ইঁহাদিগের নূতন নামকরণ হইয়াছে। সমস্ত হিন্দু-জাতি ইঁহাদিগকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জগন্নাথক্ষেত্র শুধু বৈষ্ণবের পুণ্যক্ষেত্র নহে ; শাক্তের বায়ান্ন পীঠের মধ্যে একটা মহাপীঠ। মন্দিরপ্রাচীরের ভিতরেই বিমলা দেবীর মন্দির। সেখানে পশুবলি হয় ; স্বয়ং জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব, আর কোনও ভৈরব নাই। এই প্রাচীরের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, নানা সম্প্রদায়ের নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পুরীর মঠ তাহাদিগের অন্যতম। এখনও সেই মঠের অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত। পুরীতে চৈতন্যপন্থীর ও অন্যান্য পন্থীর (কবিরপন্থী, নানকপন্থী) মঠও আছে। প্রকৃতপক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ক্ষেত্র। এই জন্যই জগন্নাথক্ষেত্রের এত মাহাত্ম্য। সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করেন। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের পক্ষে বৃন্দাবন ব্যতীত আর কোনও স্থানের মাহাত্ম্য জগন্নাথক্ষেত্রের সমতুল্য নহে।

"সম্প্রতি "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মূল অনু-সন্ধান করিতে গিয়া লেখক নানাস্থানের নানাধর্ম্মের উক্তরূপ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। প্রচলিত মত এই যে, জগন্নাথের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের রথে চড়িয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরা-যাত্রার অনুবৃত্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধলেখক দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরেন নাই।

কিন্তু রথের পুনর্যাত্রা আছে। অনেকের মতে এই রথযাত্রা বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ। বুদ্ধদেব রথে চড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর কপিলাবস্তুতে একবার ফিরিয়া আসেন, তখন ত আর রথে চড়িয়া আসেন নাই; পদব্রজে আসিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজকেরা মধ্য-এসিয়ায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সমারোহসহকারে যাত্রা বৌদ্ধ-উৎসবের প্রধান অঙ্গ বটে; কিন্তু বেদপন্থী হিন্দুর যাগযজ্ঞে কিম্বা পূজায় সেরূপ procession বা যাত্রার প্রাধান্য বা সার্থকতা নাই। আধুনিক কালে হিন্দুর দেবতা-পূজায় যে সকল যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধযাত্রার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত মনে করা যাইতে পারে। তথাপি এই যাত্রার এবং পুন-র্যাত্রার মূল বুঝা গেল না। অনুমান করা যাইতে পারে, রথযাত্রা মূলে সৌর অনুষ্ঠান; সূর্য্যদেবের রথযাত্রা। সূর্য্যদেবের সঙ্গে রথযাত্রার যেমন সম্পর্ক, এমন আর কিছুর সঙ্গে দেখা যায় না। প্রত্যহ রথে চড়িয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যান; এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে ফিরিয়া আসেন। এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে রথযাত্রার বৈদিক মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সূর্য্যের রথের হরিদশ্ব বাহন অরুণ সারথি, জ্যোতির্ম্ময় কেতু, অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। সূর্য্য রথে চড়িয়াই বৎসরের পর বৎসর পৃথিবী পরিক্রমণ করিতেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক স্নানকালে মৃত্তিকা-শোধনের যে বৈদিক মন্ত্র আছে (অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে) তাহাও ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিষ্ণু অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া বসুন্ধরা পরিক্রমণ করেন, এই অতি প্রাচীন বৈদিক উপাখ্যানই নিশ্চয় ঐ মন্ত্রের লক্ষ্য। এই জন্য বসুন্ধরার মাটীও বিশুদ্ধ ও পাপনাশক। তান্ত্রিক মতেও ভারত ভূমিকে অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা এই তিন ভূমিতে বিভক্ত

করা হইয়াছে। বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম আদিত্য। তিনি ত্রিপাদদ্বারা জগৎ আক্রমণ করেন। ঔর্ণবাভ, শাকপূণি প্রভৃতি অতি প্রাচীন নিরুক্তকারদিগের মতেও বিষ্ণুর এই জগৎ আক্রমণের তাৎ-পর্য্য সূর্য্যদেবের জগৎ পরিক্রমণ। বেদের ঐ উল্লেখ হইতেই বিষ্ণুর বামন অবতারে ত্রিপাদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণের আখ্যায়িকার উৎপত্তি। রথস্থিত জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি ত বটেই, বিশেষতঃ উহা বামনমূর্ত্তি। "রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শ্লোকার্দ্ধ সকলেই জানেন। অতএব জগন্নাথ = বামন = বিষ্ণু = সূর্য্য ; এই equation অনুসারে জগন্নাথের সাংবৎসরিক রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা সূর্য্যেরই রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা। আষাঢ় মাসে সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ শেষ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, প্রায় সেই সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। ইহাতেও উক্ত অনুমান কতকটা সমর্থিত হয়। নিকটে কণার্ক মন্দিরে সূর্য্যদেবের রথযাত্রা এককালে অনুষ্ঠিত হইত। জগন্নাথের রথযাত্রাতে সম্ভবতঃ তাহার প্রভাব আছে। ভুবনেশ্বরের মহাদেবের রথযাত্রায়ও সম্ভবতঃ ঐ প্রভাব আছে।

"বৈদিক যাগযজ্ঞের জন্য কোনওরূপ মন্দিরের আবশ্যকতা ছিল না। গৃহস্থের নিত্য-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য গৃহসংলগ্ন অগ্ন্যাগার ছিল ; তাহাতে অগ্নি রক্ষিত থাকিত। অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্মের জন্য খোলা ময়দানে অস্থায়ী ভাবে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া হইত। রামায়ণ মহা-ভারতের মধ্যেই দেবায়তনপ্রসঙ্গ আছে; কিন্তু ঐ সকল প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা স্থির করা কঠিন। প্রচলিত রামায়ণে রামের সহিত জাবালির কথোপকথনে যখন বুদ্ধ তথাগতের নাম দেখা যায়, এবং মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত জনগণের মধ্যে রোমক-নাম দেখা যায় ; এবং উভয়গ্রন্থে যখন শক, যবন, প্রভৃতি জাতির

উল্লেখ দেখা যায়, তখন ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কোন্ কোন্ অংশ বুদ্ধের পরবর্ত্তী, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। গৃহ্যসূত্রাদির মধ্যে দেবমূর্ত্তির দেবায়তনের প্রসঙ্গ থাকিলেও সেখানেও এই সমস্যা আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধগণও প্রথমে মন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই। নিরেট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গর্ভমধ্যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ (ধাতু) রক্ষা করিতেন। এই সকল স্তূপ ক্রমশঃ বৃহদায়তন এবং নানা অলঙ্কারে শোভিত হইতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই স্তূপের পরিণতিতে চৈত্যশালা বা মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে এবং ভিতরে নানাবিধ চিত্র এবং ভাস্কর্য্য খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দিরের গায়ে যেমন বীভৎস চিত্র আছে, তেমন চিত্র আছে কি না ঠিক জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগন্নাথমন্দিরে এই সকল উৎকীর্ণ চিত্রে বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলা, পরকীয়া সাধন, প্রকৃতিসাধন গোপীভাবে সাধন, কোনও সাধনেরই চিহ্ন নাই। শাক্তের শক্তিসাধনা ও পঞ্চতত্ত্ব সাধনার কোনও সম্পর্ক নাই; শৈবের লিঙ্গপূজার আভাস মাত্র নাই। যাহা আছে তাহাকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। মূর্ত্তি গুলা নিরতিশয় কদর্য্য, হেয়, বীভৎস। ইহার কি কোনও অর্থ নাই?

“আছে বৈ কি। নহিলে এত কথা বলিতাম না। আট নয় শত বৎসরের পূর্ব্বেকার য়ুরোপের কথা স্মরণ করুন। য়ুরোপের মধ্যযুগে চারিদিকে cathedral ও গির্জ্জাঘর বিচিত্র কারুকার্য্য সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গির্জ্জার মধ্যে বেদি; তদুপরি বলি নিবেদন করা হইত। দেওয়ালগুলি নানাচিত্রে শোভিত;—বেথলহেমে কুমারীগর্ভে নর-নারায়ণের জন্ম হইয়াছে; তারকার আলোকে প্রাচ্য ঋষিগণ অর্ঘ্যহস্তে পূজা

করিতে যাইতেছেন। দুরাত্মা হেরডের আজ্ঞাকারী অনুচরগণ তাঁহার অন্বেষণে শিশুহত্যায় নিযুক্ত। মিশর দেশে তিনি গুপ্ত রহিলেন। শয়তান তাঁহাকে একাকী পাইয়া প্রলোভিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে; শয়তান তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল না। সরীসৃপরূপে শয়তান এতদিন মানবের পদে দংশন করিতেছিল; মানবরূপী নারায়ণ এখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। করুণাময় পরমপিতার পার্শ্বে প্রেমের আধার পুত্র উপবিষ্ট; পাপী মানবাত্মার উদ্ধারকল্পে পিতার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়কে ঘিরিয়া সমস্ত দেব-যোনি, angels, seraphim, cherubim জয়গান করিতেছেন। খ্রীষ্টানের স্বর্গপুরের সমস্ত আনন্দ সেই বেদিকে ঘিরিয়া স্তম্ভ হইতে, প্রাচীর হইতে ছাদ পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিত। এই ত স্বর্গ; চর্চ্চের ভিতরই ত মানবের সমস্ত দুঃখের, সমস্ত কর্ম্মের অবসান। তাপক্লিষ্ট শয়তান-ভয়ভীত মানবাত্মা মানবসখা নরনারায়ণের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া তাঁহার চর্চ্চের ভিতরে অমৃতের ভোজে বসিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "Come unto me, and thou shalt be saved"; তিনি স্বয়ং সেই অমৃত বণ্টন করিয়া দিতেছেন; মহিমামণ্ডিত তাঁহার সেই শ্রীমূর্ত্তি হয় ত আমার নয়নগোচর হইতেছে না; কিন্তু আমি যে চর্চ্চের ভিতরে আসিয়াছি, আমার ভয় কি? তাঁহার প্রেমের নিগূঢ় স্পন্দন অনুভব করিতেছি, আমার ভয় কি? পাপ শয়তান ত এখানে আসিতে পারিবে না, আমার ভয় কি? আমার অমৃতভাণ্ড সে ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি এই চর্চ্চের ভিতরে অমৃতের আস্বাদ পাইয়া মানবের মহাসখার প্রসাদে অভয় অমরত্ব লাভ করিয়াছি। পাপ ও মৃত্যু চিরদিনই এই চর্চ্চের বাহিরে থাকিয়া মানবের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করুক; কিন্তু তাহারা চর্চ্চের ভিতরে প্রবেশ

লাভ করিতে পারিবে না, চর্চ্চের দ্বার অহোরাত্র উন্মুক্ত থাকিলেও তাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।

"এমনই করিয়া খ্রীষ্টান তাহার চর্চ্চের ভিতর অংশটিকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিল। মানব যখন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘভুক্ত হয়, তখন সে পাপ শয়তানের হাত এড়াইয়া অভয় স্বর্গের অধিকারী; অখ্রীষ্টান মানব নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। তাই ভাবুক সাধক খ্রীষ্টান ভাস্করের হাতে সঙ্ঘরূপ চর্চ্চ যখন গির্জ্জারূপে প্রকটিত হইল, গির্জ্জার ভিতরটি অভয়, সুন্দর স্বর্গের বিবিধ চিত্রে সুশোভিত করা হইল; আর প্রাচীরের বহিরংশে শয়তানের অনুচরবর্গের হস্তে পাপীদিগের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

"এখন বুঝিতে হইবে চর্চ্চ শব্দটির দুই অর্থ—উহাতে খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ বা Christian community বুঝায়, আবার উপাসনামন্দির বা গির্জ্জাঘর ও বুঝায়। এই মন্দির খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘেরই প্রতিকৃতি। মন্দিরের ভিতর ও বাহির উভয়ের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। যাহারা inside the Church অর্থাৎ সঙ্ঘের ভিতর আসিয়াছে, তাহারা saved; স্বর্গরাজ্য kingdom of Heaven তাহাদেরই; তাহারাই অন্তিমে ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে বসিতে পাইবে। স্বয়ং খ্রীষ্ট তাহাদের নেতা হইবেন। আর যাহারা Church এর বাহিরে, তাহারা খ্রীষ্টীয় সমাজের বাহিরে; তাহারা damned; তাহারা শয়তানের রাজ্যে Hell মধ্যে স্থান পাইবে; শয়তানের অনুচরেরা তাহাদের মাথা চিবাইবে, তাহাদিগকে গন্ধকের আগুণে পোড়াইবে। ইউরোপের মধ্যযুগের গির্জ্জাঘরের দেওয়াল ও বাহিরের দেওয়াল সেইজন্য ভিন্নরূপে চিত্রিত। ভিতরে খ্রীষ্টীয় লীলা ও অবদানের চিত্র, angels, সাধু saint, martyrদের চিত্র; তাহারা প্রভুর জয়গানে তৎপর। বাহিরের দেওয়ালে নরকের চিত্র, শয়তান ও তাহার অনুচরদের হাতে পাপীরা

নানা নরকের যাতনা সহিতেছে। Churchএর ভিতর ও বাহির, এই দুইটি প্রভেদ মনে রাখিতে হবে;—ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

"এখন জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতারা ত্রিমূর্ত্তির স্তব করিতেছেন;—অনন্ত শয্যায় শয়ান নারায়ণ, ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র, দেবাদিদেব মহাদেব জগন্নাথ-দেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। অভ্যন্তরে কোনও কদর্য্য চিত্র নাই। মন্দিরের বহির্ভাগে ঐ সকল বীভৎস মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। হয়ত এ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধমন্দিরই ছিল; কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হইলে মার বা শয়তান বড় একটা আমল পাইলেন না। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধেরা জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করিয়া-ছিল,—কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক। যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর, যাহার সঙ্গে কোনওরূপ সংস্পর্শে আমাদিগকে আসিতে হয়, সেটা কামলোক। এই কামলোকে অবস্থিত জীবমাত্রই তৃষ্ণার বা কামের অধীন, এই জন্য দুঃখভোগী। স্বর্গের দেবতা হইতে নরকের পাপী পর্য্যন্ত সকলেই এই কামলোকের অন্তর্গত। স্বর্গলোক বা দেবলোক নরলোক তির্য্যক্‌লোক এমন কি নরকলোক পর্য্যন্ত সকলই এই কাম-লোকের অন্তর্গত। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বিশেষতঃ তাহাদেরই জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। রূপলোকের অধিবাসীর কেবল রূপমাত্র আছে; তাহারা সর্ব্বদা ধ্যানাবস্থিত, সর্ব্বথা কামবর্জ্জিত; বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহার নামান্তর ব্রহ্মলোক। বলা উচিত, এই ব্রহ্ম বেদান্তের ব্রহ্ম নহেন, বরং পুরাণের ব্রহ্মা হইলেও হইতে পারেন। অরূপলোকবাসীদিগের রূপ পর্য্যন্ত নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের দুইটি তত্ত্ব স্মরণ করুন,—তৃষ্ণা ও উপাদান, ভোগ্যবস্তুর প্রতি প্রবল আসক্তি ও ভোগ্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়িয়া

ধরিবার বাসনা। এই তৃষ্ণা ও উপাদান—এই দুইটিই ত কামলোকের অধিবাসীর সর্ব্বনাশের মূল; কামলোকের জীবমাত্রই এই তৃষ্ণা ও উপাদানের বশ, ও তদধীন হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। এই দুইটাকে বর্জ্জন করিতে না পারিলে রক্ষা নাই; অতএব এই দুইটাকে হেয়, জঘন্য, বীভৎস করা চাই; ন্যক্কারজনক চিত্রে ইহাদিগকে চিত্রিত করা হউক, যাহাতে তৃষ্ণা ও উপাদানের প্রতি মানুষের নিরতিশয় ঘৃণা হয়। মন্দিরের বাহিরের গায়ে কামলোকের অন্যান্য চিত্রও থাকিতে পারে; সকল চিত্রই যে বীভৎস হইবে তাহার হেতু নাই। নরলোক, সুরলোক, অসুরলোক, সকলই কামলোকের অন্তর্গত। জীবমাত্রই কামনাধীন হইয়া যে সকল লীলা খেলা করে, সবই মন্দিরের বহিঃপৃষ্ঠে চিত্রিত হইতে পারে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির সমূহে ঘটিয়াছেও তাহাই। এই দুইটার পরবর্ত্তী তত্ত্ব "ভব"। কাম ও তৃষ্ণা হইতে অব্যাহতি পাইলে তবে ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইবে।

"অনেক স্থানে রথযাত্রার রথের গায়ে এইরূপ জঘন্য চিত্র অঙ্কিত থাকে। জগন্নাথের মন্দিরের গঠনে রথযাত্রার রথ গঠিত হয়; ভ্রমণের পক্ষে বা যুদ্ধকার্য্যে এই রথ সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জগন্নাথের রথ জগন্নাথের মন্দিরেরই অনুকরণ; এবং উভয়ের তাৎপর্য্যও এক। বাহিরের তৃষ্ণা ও উপাদানের চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া রথারূঢ় বামনকে দেখিতে পাইলে আর "ভব" অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইবে না; জীবের কামলোক হইতে মুক্তি হইবে। বেদান্তের "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" ইত্যাদি স্মরণ করুন; মানবদেহরূপ রথে অরোহণ করিয়া আত্মারূপ রথী ভগবান বসুন্ধরায় বিচরণ করিতেছেন। বৈদান্তিকের চোখে ভগবানের রথস্বরূপ এই মানবদেহ অবিশুদ্ধ বা হেয় না হইতে পারে; কিন্তু বৌদ্ধের নিকটে, ও বৌদ্ধপ্রভাবে অভিভূত হিন্দুর নিকটে, এই

দেহটা দুঃখভাগী ও হেয়, কারণ ইহা কামলোকে বিচরণ করে।' সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের স্থান এই জগন্নাথক্ষেত্রে যে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক মিলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

"আমার এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না। এমন কি, ইহাতে কোনও নূতনত্ব আছে কি না তাহাও জানি না। আমি অনধিকারী ; নানা কথা সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। এই ধরণের ব্যাখ্যা কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না ; হয় ত কেহ না কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই কয়টি ; প্রথমতঃ—উপাসনা-মন্দির কেবল মন্দিরমাত্র নহে ; উহা সমুদয় সঙ্ঘের বা community'র প্রতিকৃতি ; উহা আবার মানবের জড়দেহেরও প্রতিকৃতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির, দুইটা দিক আছে। ভিতরটা শুদ্ধ,—শয়তানের সেখানে প্রবেশ নাই। বাহিরটা অশুদ্ধ ; সেটা শয়তানের রাজ্য। Community সম্বন্ধে এ কথা খাটে ; মানবদেহ সম্বন্ধেও খাটে। community'র শরণ লইলে, সঙ্ঘের শরণ লইলে পরিত্রাণ, নতুবা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে যে কেহ দীক্ষিত হইত, তাহাকে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সহিত সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইত। খ্রীষ্টানের পক্ষেও সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান ও তাঁহার ভক্তগণ ; বাহিরে শয়তান ও তাহার অনুচরগণ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, ইঁহারা কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাদৃশ্য শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দৃশ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগন্নাথমন্দিরের বাহিরের চিত্র গুলির সহিত প্রকৃতিসাধনা বা লিঙ্গপূজার কোনও সম্পর্ক থাকিলে

মন্দিরের ভিতরেও ঐরূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রগুলি এতটা জঘন্য এতটা বীভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বেদান্ত বলেন—"ততো ন জুগুপ্সতে," সংসার হইতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, জুগুপ্সার কোনও কারণই নাই। বৌদ্ধ বলেন,—সংসার হেয়, ইহা হইতে জুগুপ্সার হেতু আছে। শয়তান বা মার ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিষয়াসক্তি দ্বারা প্রলোভিত করেন। তাঁহার অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টকে ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় সেই ভয়ের দিকটা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধভাবাভিভূত হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মূর্ত্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্ণার পরবর্ত্তী "স্পর্শ" বা বিষয়ভোগ নামে নিদানের চিত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায় তাহাকেই ফলাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই অশ্লীল মূর্ত্তিতে পরিণত করা গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এক মূল হইতে, এককাণ্ড হইতে দুইদিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাত্র, ইহাই আমার বক্তব্য।

"আর একটা কথা। যাঁহারা কারুকার্য্যখচিত এত বড় মন্দির গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিতরে আলো প্রবেশের সুব্যবস্থা করেন নাই কেন? রত্নবেদীর উপরে যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্গম; অতি সাবধানে সোপান অতিক্রম করিয়া দীপের সাহায্যে দেবতাকে কতকটা দেখা যায়। অন্যান্য দেবমন্দিরের ভিতরও অন্ধকার; নিকটে সাক্ষী কালীঘাটের মন্দির। জগতের অধিকাংশ লোকই বাহিরের দেহটাকেই সার বস্তু বলিয়া জানেন; দেহের ভিতরে যে আত্মা বা ভগবান আছেন, তিনি অধিকাংশেরই অলক্ষ্য। উপ-

নিষদেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গুহার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করিয়া যোগীরা তাঁহাকে দেহের মধ্যে হৃদপুণ্ডরীকে বা শিরস্থিত সহস্রদলকমলে কিম্বা আরও নিগূঢ় প্রদেশে দেখিতে পান। জ্ঞানের বা ভক্তির প্রদীপ না জ্বালিলে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে না। অথবা তিনি কৃপা করিয়া হয় ত আপনার অনুগৃহীতকে দেখা দেন। বস্তুতঃ এ রকম প্রসিদ্ধি আছে যে, লক্ষ যাত্রীর মধ্যে দু একজন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান। সাহেবদের বর্ণিত hideous মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। সুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তি তাঁহারা দেখেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদীর নিকটে যাইতেন না; বেদী হইতে অনেক দূরে একটি ছোট পাষাণস্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সেই মদনমোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বেদ পুলক কম্পন ও মূর্চ্ছা হইত। ইতর সাধারণ লোকে কিন্তু সে স্থান হইতে দেবতাকে দেখিতে পায় না বলিলেই হয়। আমাদের মত লোকের এই জন্যই জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া বৃথা। ভক্তির চক্ষু বা জ্ঞানের চক্ষু জগতে বড় দুর্লভ সামগ্রী। অন্ততঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চক্ষু না লইয়া গেলে জগন্নাথের মহিমা কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যে কথাগুলি বলিলাম, তাহাতে সেই বিজ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে যদি কিছুমাত্র সাহায্য হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

# আলোচনা।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সমভিব্যাহারে রোগশয্যায় শয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলাম; তিনি উঠিয়া বসিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েকটি কথার পর আমরা "বিচিত্র প্রসঙ্গ"র কথা তুলিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'মন্দির গাত্রস্থ চিত্রগুলির সম্বন্ধে আপনার theory কি?' তিনি বলিলেন,—"আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই; ও সম্বন্ধে আমার কোনও theory নাই।" গৌরহরিবাবু বলিলেন— "বিচিত্র প্রসঙ্গ"র theoryটা ভুল হইল কি ঠিক হইল সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা শুনিতে ইচ্ছা হয়।" মৈত্রেয় মহাশয় উত্তর করিলেন—"ও সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বলিবার নাই। আর ভুল যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষতি কি? বরং যিনি সেই ভুল দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যের ও ইতিহাসের মহদুপকার সাধিত করিবেন। রামেন্দ্রবাবুর এই প্রসঙ্গের ফলে যদি এ বিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার চেষ্টা আরও পাঁচ জনে করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইল।" একটু পরে তিনি বলিলেন—"আমার নিজের কোনও theory নাই; কিন্তু আমি এ কথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। তাঁহার একটি theory আছে; সেটি খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু গলদ আছে।

"ঔপরিষ্ট কার্য্যের চিত্রই উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজি নিদানশাস্ত্রে দেখিতে পাইবেন যে, মানবদন্তের দংশন কোনও একটা রোগবিশেষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং উহা কলিঙ্গ দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটা মজার বিষয় এই যে, চিত্রিত পুরুষগুলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বৌদ্ধযুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্ম্মটাকে হেয়, জঘন্য, কদর্য্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; তখন সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধভিক্ষুসম্প্রদায়কে কামপরবশ পশুত্বে পরিণত করিয়া জনসাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ চিত্রগুলা আর কিছু নহে—preaching in sculpture; মিস্ত্রিরা বাটালি লইয়া খোদাই করিয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতে চাহে যে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্য্য। মন্দির গাত্রে হইল কেন? কারণ এখানে প্রত্যহই বহুসংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া থাকে। প্রচারকের পক্ষে এমন সুযোগ অন্যত্র নাই।

"ব্যাখ্যাটি মন্দ নহে, কিন্তু একটু গলদ আছে। মন্দিরের দ্বারদেশে মিথুন চিত্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় ৫৫ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই,—

শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষৈঃ স্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ।

"মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার হওয়ার সম্বন্ধে পাকাপাকি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে। সর্ব্বসমেত কুড়ি প্রকার মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে; তন্মধ্যে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণ মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকার হওয়া চাই।"

৫ই মাঘ ১৩২০।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত "বিচিত্র প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে আলাপ করিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রের চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে। ঐ যে ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক, উহা ঠিক ঐভাবে দেখা যায় কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরক বলিলে যে বিভীষিকার ভাব মনে স্বতঃই উদিত হয়, ঐ চিত্রগুলি দেখিয়া তাহা হয় কি? হইতে পারে যে বিশুদ্ধচিত্ত সাধু সজ্জনের চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়; কিন্তু আপামর সাধারণ বোধ হয় নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না; মানুষের মধ্যে যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে না, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপের cathedral গুলির সম্বন্ধে কিন্তু ঐ স্বর্গ ও নরকের theory খাটে। সে সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে; তাহা দেখিলে খ্রীষ্টানের মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই; সে চিত্রগুলা বাস্তবিকই বীভৎস। এখন মনে রাখিতে হইবে যে নরক সম্বন্ধে য়ুরোপের মধ্যযুগে যে সকল tradition ছিল, তাহার অনুরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই ঐ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কথা। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বহু পূর্ব্বে উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি common tradition ছিল; য়ুরোপের মধ্যযুগে তাহার সাহিত্যিক বিকাশ হইল ডান্টের Inferno ও Purgatory তে। এই tradition গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; বোধ হয় retaliatory ideas of law হইতে এগুলি উৎপন্ন হয়। যে কারণেই হউক নরক সম্বন্ধে কতকগুলা সাধারণ জনশ্রুতি

ছিল; হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত; এই সমাজ-ত্রয়বেষ্টনীর মধ্যে তাহারা সাহিত্যে ও শিল্পে নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। Tradition সম্বন্ধে এই যে বেষ্টনীর (zone) কথা বলিলাম, এ রকম (zone) অনেক বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা,—Beast fables, architectural motifs or masonic tradition, Ethnic Customs। যাঁহারা বলেন যে অশোকের রাজধানী পারস্যের পার্সিপলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা ভুল করেন; তাঁহারা এই Zone of Masonic traditions এর কথা জানেন না; Free masonry'র মত এই masonic রহস্য একটা Zone এর মধ্যে রক্ষিত ছিল। পশু পক্ষী সম্বন্ধে গল্পের কথা ত অনেকেই জানেন। আবার ঐ এক একটা Ethnic Custom ধরুন; সেখানেও ঐ Zone স্পষ্ট দেখা যায়। ধরুন ঐ Eucharist ভক্ষণ; এটি সর্ব্বত্রই আদিম কৌলিক যুগের (Primitive tribal life) একটি সাধারণ ব্যাপার। নরবলিতে ইহার আরম্ভ; আমাদের পুরুষযজ্ঞের tradition এ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; এই সকল tribe গুলার মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে মানুষের রক্তমাংস খাইলে তাহার গুণ পাওয়া যায়; পশুর রক্ত মাংস সম্বন্ধেও তাহাদের ঐ ধারণা ছিল। ক্রমে একটা ধর্ম্ম-ভাব ইহার সহিত জড়িত হইল; এ অবস্থাকে sacramental stage বলা যায়। বলির পশু তখন sacrosanct; দেবতাকে অর্পণ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। ক্রমে এই ভাবের আরও একটু পরিবর্ত্তন হয়; বলির পশুর মধ্যে দেবতা আসিয়া পড়েন; পশু মাংস খাইলেই দেবতার সহিত একত্ব সম্পাদিত হয়; ইহাই আর্য্যদিগের যজ্ঞ। সেমিটিক জাতিদিগের মধ্যে কোনও না কোন আকারে ইহা দেখা যায়। পৃথিবীময় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে; তবে কোথায় কি অবস্থায় আছে তাহা সেই স্থানের সভ্যতার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

"সে যাহা হউক, নরক সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ জনশ্রুতি ছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের দরুণ সেই tradition গুলি বিভিন্ন আকারে প্রকটিত হইল; বৌদ্ধ পৌরাণিক নরক একরূপ, খ্রীষ্টানের নরক অন্যরূপ হইল। উভয়ত্রই শাস্তির কথা খুব বড় করিয়া বলা হইল; কিন্তু শয়তানের তাড়নায় ও যমদূতের তাড়নায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা বুঝিতে হইলে য়ুরোপের mediævalism ও ভারতবর্ষের mediævalism বুঝিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে ভাবগত প্রভেদ রহিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপ মানুষের ইহকালের চেয়ে পরকালটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে; secular life এবং future life তুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই যে দ্বৈতভাব (dualism), এইটাই য়ুরোপের মধ্য যুগের সব চেয়ে বড় কথা। চর্চ্চের প্রধান চেষ্টা ছিল, যেমন করিয়া হউক, temporal life কে দমন করিয়া (Life Eternal) এর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আসল কথাটা এই যে, এই সংসার, এই রক্তমাংসের শরীর রহিল এক দিকে; আর অনন্ত জীবন future life রহিল আর এক দিকে। কিন্তু ভারতবর্ষের mediævalismএ ঐ তুইটার মধ্যে অতটা ব্যবধান নাই; মোটেই কোনও ব্যবধান নাই বলিলেও চলে। এই খানেই স্বর্গ, এই খানেই নরক; ইহকালেই রক্তমাংসকে দমন করিয়া ভূমানন্দে পঁহুছিতে হইবে। য়ুরোপ দ্বৈত (dualistic); ভারতবর্ষ অদ্বৈত (monistic)। উভয়ের নরকের type ও এইরূপ স্বতন্ত্র। শয়তানের শাস্তি ও যমদূতের শাস্তির মধ্যে একটা লক্ষ্য করিতে হইবে। খ্রীষ্টানের নরকে (Hell) যাহারা শাস্তি পায়, তাহারা চিরকালই শাস্তি পাইতে থাকিবে; তাহাদের উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নাই; শয়তানের নরকে তাহারা চিরদিনের জন্য বন্দী। যমদূত কিন্তু ধর্ম্মরাজের অনুচর; তাহার শাস্তির ফলে মানবাত্মা Redemption এর ভিতর দিয়া স্বর্গে পঁহুছিতে

পারে। এখানেও খ্রীষ্টান দ্বৈতবাদী (dualistic), হিন্দু অদ্বৈতবাদী (monistic)।

"খ্রীষ্টানের নরকের ও Purgatory'র চিত্র তাহার গির্জ্জাঘরের গাত্রে খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে সকল চিত্রে বিভীষিকার দিকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কারিকরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

"শিল্পী নানাপ্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কৃত করিত। হয়ত বা স্বর্গ নরকের চিত্র থাকিত ; বুদ্ধের জাতক গল্পের বা খ্রীষ্টের লীলাপ্রসঙ্গ খোদাই করা হইত ; সাংসারিক ধর্ম্মভাববিবর্জ্জিত চিত্রও থাকিত (naturalistic, secular, positive),—যেমন যুদ্ধ, ব্যবসায়বাণিজ্য ইত্যাদি; গ্রীক ও রোমান পাত্রে এইরূপ চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইহার কারণ কি ? উড়িষ্যা অঞ্চলেই বা ইহার বাহুল্য দেখা যায় কেন ?

"বৌদ্ধ মঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে একটা তান্ত্রিক রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারা যায়। ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকে এই প্রকার জঘন্য পাশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত। মধ্যযুগে য়ুরোপের মঠগুলিতেও সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গৃহীর জন্য এ সাধনার ব্যবস্থা হয় নাই ; সন্ন্যাসীর জন্য হইয়াছিল। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল বৌদ্ধ মঠে রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য শিল্পী পুরুষানুক্রমে কাজ করিত। য়ুরোপের মধ্যযুগে মঠগুলিতে সন্ন্যাসীরা নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত। মন্দিরগাত্রের অধিকাংশ চিত্রই তাহারা স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিল ; স্বহস্তে illuminate করিয়া পুঁথি রচনা

করিত ; অনেকে মন্দির নির্ম্মাণে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত। বৌদ্ধ মঠে সন্ন্যাসীরা স্বহস্তে শিল্পকার্য্য করিত না বটে ; কিন্তু তাহারা design করিত; মিস্ত্রী তদনুযায়ী খোদাই করিত। মিস্ত্রীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি তাঁহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দির-গাত্রে প্রকটিত করিল। তদবধি সমস্ত mural decorationএ ঐ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ধারা রহিয়া গেল। হিন্দু সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে বাহির হইতে সহজে কোনও একটা নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জ্জন করিতে পারে না। এস্থলে অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জ্জন করাইবার machinery য়ুরোপে যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ছিল না ; প্রতাপান্বিত পোপ ছিল না, Inquisition ছিল না, প্রবল State ছিল না। সে যাহা হউক, এই বর্জ্জন করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুন অনেক দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি একবার গৃহীত হইলে আর তাহাকে বর্জ্জন করা দুঃসাধ্য হইল।

"কিন্তু দেশের লোকে আপত্তি করিল না কেন ? দ্রাবিড়জাতির মধ্যে যৌনসম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল ( promiscuous ) ছিল। তাহাদের চোখে এরূপ চিত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখনও যে দ্রাবিড়দিগের দেবমন্দিরে দেবদাসী আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

"দ্রাবিড়জাতি যখন আর্য্যসভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর্য্যদিগের একটা প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এই উচ্ছৃঙ্খলভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আর্য্যজাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল

না ; কিন্তু মনুর সময়ে বাল্যবিবাহ সমাজে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্য্যরা হয় ত শীতপ্রধান দেশে ছিলেন ; সেখানে যৌবনোদ্গম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে ; বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহযন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। যখন যৌবনোদ্গম অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে হইতে আরম্ভ হইল, বিবাহের বয়সও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ সমস্তই অনুমান করিয়া লইতে হয়।

"দ্রাবিড়জাতির সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়া আর্য্যজাতি একটা বড় ভুল করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অন্য কোনও উপায় ছিল কি না, বলা যায় না ; কিন্তু যে উপায়টি অবলম্বিত হইল, তদ্দ্বারা সমাজের পরিণাম শুভ হইয়াছে বলা যায় না। সেদিন ইউনিভার্সিটির বক্তৃতায় আমি য়ুরোপীয় সভ্যতার wrong directionএর ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আমার মনে হয় আর্য্যজাতির এই বাল্যবিবাহপ্রথার প্রচলনও আর্য্য-সভ্যতাকে একটা wrong direction দিয়াছে।"

আচার্য্য ডাক্তার শীল একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনার উল্লিখিত ঐতিহাসিক ও biologic কারণ ধরিলে আর্য্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃদিগকে কি দোষ দেওয়া যায়?" তিনি বলিলেন— "আমি দোষ দিতেছি না; কিন্তু যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল সেটা সমাজকে কোথায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আরো একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় আছে। আর্য্য-দিগের ব্রাহ্মণ্যসমাজে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী ; অল্প বয়সে তাঁহাকে বিদ্যাচর্চ্চা হইতে সরাইয়া আনিয়া গৃহিণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্রাহ্মণের জীবন

কি বৈদিক যুগের মত উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা ছিল? স্বীকার করা গেল যেন আর্য্যেরা দ্রাবিড়ীয় আচারানুষ্ঠান হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইল। কিন্তু এমন সময় আসিল, যখন দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আর্য্য-সভ্যতা প্রসারিত হইল, ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র তাহাদিগের মধ্যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ত আর ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ রহিল না; স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তখনও যে বাল্যবিবাহ আবশ্যক ছিল, এ কথা কি মনে করা যায়? কিন্তু যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা আর বর্জ্জন করা গেল না।" আমি বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন; কথাটা যখন উঠিল, তখন খোলসা করিয়া একটা বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। পাশ্চাত্য দেশের সেন্সসের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থানে জারজ সন্তানের সংখ্যা খুব বেশী। সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে শতকরা চল্লিশ হইতে ষাট জন জারজ। ইংলণ্ডে গ্রামগুলি অপেক্ষা সহরগুলিতে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেশী; কিন্তু অন্যান্য দেশের অনুপাতে অনেক কম। বেশী বয়সে বিবাহের সহিত এই সামাজিক সমস্যার কিছু সম্পর্ক আছে কি?" তিনি বলিলেন—"আমার ত বোধ হয় কোনও সম্পর্ক নাই। মানব-জাতির এক একটা বিভাগের (stock) এক এক প্রকার স্বতন্ত্র জাতিগত প্রবণতা (racial characteristic) আছে; সেই দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে যৌন ব্যভিচারকে দোষের মধ্যে প্রায়ই গণ্য করে না; তবে বিবাহের পর ব্যভিচারটা দোষ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু আজ কাল ফ্রান্সে তাহাও হয় না; যেমন অন্যান্য চুক্তির সম্পর্ক সহজেই ভাঙ্গা যায়, বিবাহও তাই; বিবাহিত অবস্থায়ও ব্যভিচার বিশেষ দূষনীয় বলিয়া

গণ্য করা হইতেছে না। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ক্যাথলিক চর্চ্চের প্রাধান্ত ছিল, তখন বিবাহ একটা sacrament এর মত ছিল; মানবের পাশব প্রবৃত্তি দমন করিবার অনেক উপায় ছিল। এখন চর্চ্চ নির্বীর্য্য; স্থতরাং racial characteristic প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের racial characteristic সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক।" আমি বলিলাম "কিন্তু ভারতবর্ষে অল্প বয়সে যৌবনোদ্গমরূপ biologic সত্যটাকে মানিয়া লইলেও কি বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই?„ তিনি বলিলেন "বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের যেন instinct; বহিঃশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস যেমন জীবজগতে instnctive, কাম-রিপুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাও তেমনি ভারতবাসীর পক্ষে instinctive; এ স্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ হইলে চরিত্র-দোষের আশঙ্কা অমূলক।

"ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি যেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, এমন আর কেহ পারে নাই। সে আত্মাকে গোড়া হইতে ধরিয়া আছে বলিয়া বাঁচিয়া গেছে; আত্মদ্রোহী হয় নাই বলিয়া তাহার আত্ম-বিনাশ হয় নাই। তাই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ( King George V Chair of philosophy ) আমি বলিয়াছিলাম—If the knowledge of the Self confers immortality, then this undying Indian civilization which has made that knowledge the breath of its life has found an exceeding great reward."

## ৪

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'র আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। ডাক্তার শীল এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ধরা দেন নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যা হজম করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন; তাঁহার নিকট আমাদের যে পাওনা আছে, তাহা দেন নাই। এই উপলক্ষে আপনি যাহা কিছু তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারেন, তাহাই লাভ। বোধ হয় আমার কথা আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারি নাই। ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে এ কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে; জগৎটাকে হেয় করাই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, এ কথাও আমি বলিতে চাহি না। বলিতে চাহি যে এই যে মন্দির, ইহা সঙ্ঘের প্রতিকৃতি মাত্র। মন্দিরের ভিতর ও বাহির বলিলে বুঝিতে হইবে সঙ্ঘের ভিতর ও বাহির। বুদ্ধসঙ্ঘের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আশা নাই, তাহারা মারের অধীন হইয়া রহিয়াছে; খ্রীষ্টান সঙ্ঘের বাহিরে যাহারা আছে, তাহারা শয়তানের অধীন হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টানের শয়তান নরকের রাজা; সুতরাং গির্জ্জার বহিরংশে নরকের ছবি; গির্জ্জার ভিতরে ধর্ম্মরাজ্য, ভগবানের রাজ্য। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমন্দির সম্বন্ধে ঠিক এই স্বর্গনরক theory খাটে না। খ্রীষ্টানের স্বর্গ ও নরকে যে contrast, ব্রাহ্মণের সেরূপ নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক; তাহা পাঠ করিয়া আমার খুব আনন্দ হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত এ কথাটা আর কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনি নাই। একদিন এই কথা লইয়া আমি একটা

প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ লেখকেরা জোর করিয়া বলিতেন,—"আমরা হিন্দু; আমাদের লক্ষ্য কেবলই পর-কালের দিকে; আর পাশ্চাত্যদিগের একমাত্র লক্ষ্য ইহকালে সুখ-স্বচ্ছন্দতা"; এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে বলিতে প্রস্তুত নহি। 'পাশ্চাত্য' বলিলে যদি আজকালকার বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য বুঝায়, তাহা হইলে কথাটা কতকটা সত্য হইতে পারে। অতি প্রচীনকালের গ্রীক বা রোমানকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও বা কতকটা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যদি খাঁটী খ্রীষ্টান মত ধরেন, তাহা হইলে এ কথাটা ঠিক নহে। মৃত্যুর পরে যে সুখ নাই, এ ধারণা প্রাচীন গ্রীকের অস্থিমজ্জায় ছিল, সাধু অসাধু সকলকেই নিরানন্দ দেশ Hadesএ যাইতে হইবে। Odysseyতে এই পরকালের বিবরণ দেখিতে পাই; পরবর্ত্তী গ্রীক সাহিত্যে এই morbid ভাব উৎকটরূপে দেখা দেয়। মৃত্যুকে জয় করিয়া আনন্দের মধ্যে অমরত্ব লাভের ধারণা গ্রীকের আদৌ ছিল না। তাহার নিকট পরকাল অত্যন্ত ফাঁকা, নিরানন্দ; তাই সে স্থির করিয়াছিল যে ইহজীবনকে যতদূর সাধ্য সুন্দর করিতে হইবে।

"গ্রীকগণ ট্রয় নগরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে পর মহাবীর আকিলিসের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল; বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের পুত্র Lycaon আকিলিসের নিকটে প্রাণভিক্ষা করিল। আকিলিস বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"বাঁচিতে চাস? কেহই বাঁচে না; আর তুই চাস বাঁচিতে? প্যাট্রোক্লস্ মরিয়াছে; এই আকিলিসকেও মরিতে হইবে";—এই বলিয়া আকিলিস তাহাকে হত্যা করিলেন, ও লাথি মারিয়া তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দিলেন। ভয় করিবে না ত কি? পর-লোক আছে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত নিরানন্দ, অত্যন্ত gloomy। যদি কিছু দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবনটাকে

সুন্দর ও সার্থক করিতে পারা যায়। গ্রীকের নাট্যসাহিত্যে মানুষকে নির্ম্মম অদৃষ্ট বিধাতার (Fate) অধীন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার রাষ্ট্রনীতির চরম উদ্দেশ্য ছিল—যেমন করিয়াই হউক ইহকালেই মানুষকে সম্পূর্ণতা লাভের অধিকারী করিতে হইবে। চন্দ্রনাথবাবুর কথা গ্রীকের সম্বন্ধে খাটে। গ্রীকের দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্বটি আলোচনা করিয়া দেখিলে একই উত্তর পাওয়া যাইবে। Stoic বলিতেন, সংসারের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যাও; সুখে অধীর হইও না, দুঃখে চঞ্চল হইও না; মৃত্যু যখন আসিবে, তাহাও সহ্য করিতে হইবে; ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কিন্তু মৃত্যু জয় করিবার কল্পনা Stoicএর আদৌ ছিল না। Epicurean বলিতেন, ইহকাল হইতেই যত পার আনন্দ আদায় কর। রোমানদিগের নিজের কোনও দর্শনশাস্ত্র ছিল না; তাহারা গ্রীক দার্শনিক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেনেকা হইতে মার্কস অরেলিয়স্ পর্য্যন্ত সকলেই ষ্টোইক্; সকলের মধ্যে সেই একই সুর। জীবন দুর্ব্বহ হইলে রোমান বীর আত্ম হত্যা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহার যতদিন সুখ স্বচ্ছন্দের আশা ছিল, ততদিন তাহার জীবন স্পৃহণীয় ছিল। যখন দুঃখের বোঝা খুব বাড়িয়া উঠিত, তখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইত। তাহার যতটা সামর্থ্য ছিল, ততটা সে সহ্য করিয়াছিল; তাহার পর সে মৃত্যু কামনা করিত। সাধারণতঃ কেহই পরকালের বিষয় চিন্তা করিত না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ Fateএর অধীন।

"এই যে ইহজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিবার চেষ্টায় গ্রীকের কলাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং রোমানের Law ও রাষ্ট্রনীতি ব্যাপৃত ছিল, ইহারই ভিতরকার ভাবটিকে খ্রীষ্টানেরা paganism আখ্যা দিয়া থাকে। খ্রীষ্টান পরকালকেই বড় করিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিব্রু জাতি পরকালের কথা প্রথমে কল্পনা করে নাই; মুসার ধর্ম্ম-

নীতি ইহজীবনের জন্যই আদিষ্ট ছিল ; জিহোভার অনুজ্ঞা মানিয়া চলিলে ইহজীবনে মানুষ সফলকাম হইবে। ব্যাবিলন হইতে প্রত্যাগমনের পরে পরকালের কথা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ; এই ভাবটি মিসর কিম্বা পারস্য হইতে আমদানি, তাহা ঠিক বলা যায় না ; কিন্তু ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে এই নবাগত পরকালসম্বন্ধে ভাবনা ইহুদীর ইহ-জীবন সম্বন্ধে ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতে খ্রীষ্টান এই পরকালের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীষ্টানের মতে মর্ত্ত্যলোকে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করিল, তখন সে কালের (Time এর) বশীভূত হইয়া পড়িল ; তখন হইতে তাহার আত্মার (Soulএর) যাত্রারম্ভ মনে করা যাইতে পারে; সেই যাত্রার আদি আছে, অন্ত নাই ; মর্ত্ত্যজীবনের বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু অতীত নাই। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মনুষ্য Day of Judgment এর অপেক্ষা করিয়া রহিল ; সেই দিন তাহাদের ডাক পড়িবে, বিচার হইবে ; সেই বিচারের ফলে কেহ বা স্বর্গে, কেহ বা নরকে যাইবে, তৃতীয় পন্থা নাই। পার্থিব জীবন যেমন কালের মধ্যে, Time এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ; স্বর্গবাস বা নরকভোগ তেমনি অনন্তকালের জন্য আদিষ্ট। ইহকাল স্বল্পপরিসর, Timeএর দ্বারা পরিমিত ; পরকাল (স্বর্গই হউক, আর নরকই হউক) Eternal। খ্রীষ্টানের হিসাবে Time মর্ত্ত্য-জগতের,—Eternity'র কিয়দংশ মাত্র নহে; দুইটা ঠিক উল্টা; উভয়ের মধ্যেই বিরোধের সম্বন্ধ। এই মতটা বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন, বুঝানও কঠিন। মর্ত্ত্যবাসের আদি আছে, অন্ত আছে; কিন্তু স্বর্গবাসের ও নরকভোগের আদি আছে, অন্ত নাই। যখন মর্ত্ত্য ছিল না, তখন Timeও ছিল না। মর্ত্ত্য ধ্বংস হইয়া গেলে Time থাকিবে না; থাকিবে শুধু অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক। সুতরাং স্বর্গ ও নরক এক হিসাবে খ্রীষ্টানের চোখে এক পর্য্যায়ের জিনিষ। এখানে contrast হইল মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গ ও নরকের। আবার দেখুন,

মর্ত্ত্য রহিল মাঝখানে; সেখানে মানুষের পরীক্ষা হইল; মৃত্যুর পরে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করিয়া কাহাকেও স্বর্গে প্রেরণ করা হয়, কাহাকেও বা নরকে পাঠান হয়। স্বর্গে অক্ষয় আনন্দ (Eternal bliss); নরকে অনন্ত ক্লেশ। স্বর্গ ভগবানের রাজ্য (Kingdom of God); নরক শয়তানের রাজ্য। এখানে contrast হইল স্বর্গের সহিত নরকের। য়ুরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগে এই ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব মানুষের পক্ষে ইহকাল কিছুই নহে, কেবলমাত্র Soulএর একটা ক্ষণিক অবস্থাবিশেষ; এখানে আনন্দ মিথ্যা, কলানৈপুণ্য মিথ্যা, সাহিত্য মিথ্যা, রাষ্ট্র মিথ্যা,—ইহজীবনটাই মিথ্যা। এইখানে গ্রীক ও রোমানের সহিত খ্রীষ্টানের আকাশ পাতাল ব্যবধান। খ্রীষ্টানের নিকট ইহকালের কোনও মূল্যই নাই, পরকালই সব। যাহা কিছু মূল্য, তাহা পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার ক্ষেত্র বলিয়া। কাজেই যাঁহারা বলেন যে খ্রীষ্টান পরকালের কথা ভাবে না, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন না। যদি সময় পাই ত সে ইতিহাস আলোচনা করিব। Renaissanceএর সময় হইতে সেই প্রাচীন pagan ভাবটিকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা য়ুরোপে হইতেছে; সে দিক্ দিয়া দেখিলে আধুনিক য়ুরোপ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর উক্তি কতকটা খাটে। ভারতবর্ষে ইহকালের সহিত পরকালের, স্বর্গ নরকের সহিত মর্ত্ত্যলোকের, সেরূপ contrast নাই; ইহলোক পরলোক এক পর্য্যায়ের, এক শ্রেণীর জিনিষ। স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশেষ ভেদ নাই। এই বিষয় ভাল করিয়া বুঝান দরকার। কিন্তু অনেক কথা বলিতে হইবে। ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে কি?

"ভারতবর্ষে ইহকাল পরকাল, স্বর্গ নরক আছে; কিন্তু তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ। ঋগ্বেদের সময়ে এ দেশের লোকের পরকালে কিরূপ বিশ্বাস

ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন যে, সে সময়ে পরকালের idea খুব পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখন মনে রাখিতে হইবে যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র যজ্ঞবিষয়ক; কোনও প্রকার theory বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; পরকাল সম্বন্ধে যেথানে কথা উঠিয়াছে, সে কেবল প্রসঙ্গক্রমে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া জোর করিয়া বলা যায় না যে বিশ্বাস ছিল, কি ছিল না। কিন্তু ঋক্ সংহিতার প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলে এমন অনেকগুলি সূক্ত আছে, যাহাতে পরকালের অনেক কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে; তাহাতে এটুকু বুঝা যায় যে তাঁহাদের পরকাল সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে স্বর্গ দেবলোক, আনন্দের স্থান; নরক যমলোক, সেথানে মানবাত্মা শাস্তি ভোগ করে। ঠিক এ রকম ভাবটা বেদের মধ্যে পাই না; তবে মৃত্যুর পরে মানুষকে কর্ম্ম অনু-সারে দুইটা স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হয়, আলোর দেশে এবং অন্ধকারের দেশে। আলোর দেশ সদানন্দ; অন্ধকারের দেশ নিরানন্দ। পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে এই ভাব পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কর্ম্মের চেয়ে জ্ঞানকে বড় করা হইয়াছে; কাজেই অসৎ কর্ম্মের কর্ম্মীর কথা না তুলিয়া অজ্ঞানী এই অন্ধকার লোকে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই জোর করিয়া বলা হইতেছে। বেদান্তে এই ভাব আরও স্ফুটতর করা হইল, সেথানে দেবযান ও পিতৃযান আরও ফুটাইয়া তোলা হইল। যে প্রকৃত জ্ঞানী, মুক্তপুরুষ, তাহার পক্ষে ইহকাল পরকালের প্রশ্ন উঠে না। যে অজ্ঞানী, প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, সে মৃত্যুর পরে হয় দেবযান অবলম্বন করে, না হয় পিতৃযান অবলম্বন করে। দেবযানের পথ আলোকের পথ, পিতৃযানের পথ অন্ধকার। দেবযানপথের প্রথমেই যজ্ঞিয় অগ্নির অর্চ্চিঃ (আলো), পরে দিবাভাগ, পরে শুক্লপক্ষ, পরে উত্ত-

রায়ণভাগ (যে ভাগে দিন বড়), পরে সূর্য্য; এই পথ ধরিয়া যাইতে হইবে; দেবযানের পথ হইতে আর সে ফিরিবে না। এই যে ফিরিতে হয় না, ইহাই দেবযানের বিশিষ্টতা। পিতৃযানের পথে যজ্ঞিয় অগ্নির ধূম, রাত্রিভাগ, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন অতিক্রম করিয়া চন্দ্রে পৌঁছিতে হয়। চন্দ্রলোকে কিছুদিন বাস করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। দেবযানের ও পিতৃযানের সম্পর্ক আলো ও আঁধারের সম্পর্ক। যাহারা ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান পায় নাই, মুক্ত হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছে, তাহারা সেই উপাসনারূপ কর্ম্মফলে দেবযানে গমন করে। আর যাহারা সাধারণতঃ শ্রুত্যুক্ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পিতৃযানে যায়। যাহারা নিষিদ্ধ অসৎ কর্ম্ম করে, তাহারা যে কোথায় যায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জানা গেল না। এ দু'টা ধরিয়া স্বর্গ নরকের contrast পাওয়া গেল না। অথচ Transmigration of Souls আছে; কর্ম্মী চন্দ্রলোকে গেল, কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিল; আবার কর্ম্ম, আবার হয় ত তাহার ফলে চন্দ্রলোকে গমন, আবার প্রত্যাগমন।

"বেদে গোড়া হইতে নানা দেবতা রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্থান কোথায়? খ্রীষ্টানের স্বর্গে angel প্রভৃতি দেবযোনি আছেন, নরকে demon আছে। কিন্তু বৈদিক দেবতাগণ থাকেন কোথায়? দেবতার অর্থ দ্যুতিমান্; মনে হইতে পারে তিনি যেখানে বাস করেন সেটা দ্যুলোক। বেদে দ্যুলোকের উল্লেখ প্রচুর আছে; কিন্তু সে দ্যুলোক কোথায়? নিরুক্তকারেরা এই বিষয়টা systematise করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারা দেবতাদের জন্য তিনটা বিভিন্ন স্থান কল্পনা করিয়াছেন। আদিত্যপ্রমুখ কতকগুলি দেবতা দ্যুলোকের অধিবাসী, (স্বর্গ কথাটা ব্যবহৃত হয় নাই); ইন্দ্রপ্রমুখ কতিপয় দেবতা অন্তরিক্ষের অধিবাসী,—স্বতন্ত্র অমরাবতী তখনও বোধ করি ইন্দ্রের জন্য হয় নাই; অগ্নিপ্রমুখ কতিপয় দেবতা পৃথিবীস্থানাঃ,—পৃথিবীর

অধিবাসী। এখানে দ্যুলোক নিশ্চয় আকাশ। বিভিন্নস্থানে উচ্চে নীচে বাস করার দরুণ যে কেহ অন্যের চেয়ে খাট হইয়া গেল, এ কথা তাঁহাদের মনেই হয় নাই। যাঁহাদের নিকট যজ্ঞের কাঠ ও অশ্বমেধের ঘোড়া দেবতা, অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর সে সমস্তই দেবতা, তাঁহাদের এ কথা মনেই হইতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে হয়ত উচ্চ, নীচ, ছোট, বড় এই রকম ধারণা ছিল।

"ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" এই তিনটি নাম আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক সাহিত্যে পাই। এই তিনটি নাম, ব্যাহৃতি। সাধারণতঃ এই তিনটি তিন লোকের সূচক এই অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে, ভূঃ = ভূমি বা পৃথিবী; ভুবঃ অন্তরিক্ষ; স্বঃ—দ্যুলোক বা আকাশ। পরবর্ত্তী কালে আরও চারিটি লোক কল্পনা করা হইয়াছিল,—তপোলোক, জনোলোক, মহর্লোক, সত্যলোক। এমনি করিয়া সপ্তলোকের কল্পনা করা হইল; সমস্ত চরাচরকে এই সাতটা Conceptual sphereএ ভাগ করা হইয়াছিল। কাজেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের physical reality মনে করা নিতান্ত আবশ্যক নহে।

"বেদের ব্রাহ্মণে স্বর্গের উল্লেখ আছে। স্বর্গগামী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবে, ইত্যাদি বিধি ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজমান দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে স্বর্গ দেবতার স্থান; কিন্তু এমন কোথাও খোলসা করিয়া বলা হয় নাই যে দেবগণ স্বর্গে বাস করেন, তাঁহাদের স্থান আর কোথাও নাই। সকল দেবতার জন্য একটা পৃথক লোক, একটা Olympus গোছের দেশ, তখনও সৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থ নিরুক্তের বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এক একটা দেবতার প্রিয়ধাম ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। অমুক ঋষি মন্ত্রের

দ্বারা ইন্দ্রের বা অশ্বিদ্বয়ের বা অগ্নির প্রিয়ধামে গিয়াছিলেন এবং সেই সেই দেবতার সালোক্য (এক লোকে বাস) ও সামীপ্য পাইয়াছিলেন,—ইহাও পাওয়া যায়। বড় বড় দেবতার প্রত্যেকের এক একটা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ঠিক করিয়া দিবার এই বোধ হয় প্রথম চেষ্টা; পরে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বেদে চারিজন দেবতার রাজা উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজা বরুণ, রাজা সোম, রাজা ইন্দ্র, রাজা যম। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে ঐন্দ্রমহাভিষেকানুষ্ঠানে ইন্দ্র সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া অভিষিক্ত হইতেন, তাহাও এই ঐন্দ্রমহাভিষেকের অনুকরণে। পরবর্ত্তী কালে এই চারিজন দেবতাকে চারিদিকের অধিপতি বা দিক্‌পালরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের, বরুণ পশ্চিমের, সোম উত্তরের, যম দক্ষিণের। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

"অতিপূর্ব্বে পারসীকেরা ও আমরা এক জাতি ছিলাম। তখন এই চারি দেবতা সকলের দেবতা ছিল। ক্রমে একটা schismএর সূত্রপাত হইল। একদল অসুরদিগকে বড় করিয়া দিল; বরুণ হইলেন অসুরশ্রেষ্ঠ। আর একদল দেবতাদিগকে বড় করিয়া দিল; ইন্দ্র হইলেন দেবরাজ। এই দলাদলির ফলে একদল ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মত প্রবর্ত্তন করেন; এইমত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে আমাদের দুঃখিত হইবার হেতুই বা কি আছে তাহা বুঝি না। ভারতবর্ষের অভিমুখে যাওয়া হইল, এই জন্য প্রাক্ (অর্থাৎ সম্মুখে গমন) শব্দ ভারতবর্ষের আর্য্যের প্রতি প্রযুক্ত হইল। দেবাসুরে দ্বন্দ্ব এই হইতে আরম্ভ। পূর্ব্বদিকের নাম হইল প্রাচী। তাঁহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিল তাহারা পশ্চিমে প্রতীচ্যে রহিল। পশ্চিমের নাম হইল প্রতীচ্য। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন

পূর্ব্বে এই ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন। আমার কিন্তু আরও কিছু বলিবার রাছে। আর্য্যদের "পূর্ব্বে" অর্থাৎ সম্মুখে রহিল ভারতবর্ষ; পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চাতে পারস্য সাম্রাজ্য; তাঁহাদের ডাহিনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে, যমের স্থান আগে হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাঁহাদের বামে, উত্তরদিকে অর্থাৎ উচ্চতর পার্ব্বত্য প্রদেশে, সোনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, কারণ সোম হিমালয়ের উত্তরে মূজবান পর্ব্বতে পাওয়া যাইত। আমাদিগের হইলেন দেবতা ইন্দ্র ভারতের অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের অধিপতি; তাঁহাদের পশ্চাতে বরুণ (অহুরামজদ্) পারসীকদের অর্থাৎ পশ্চিমের অধিপতি হইলেন। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দ বহুস্থলে আছে। অসুর শব্দ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,---মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং। বরুণ দেবতাকে বিশেষতঃ অসুর বলা হয়। সোম উত্তর দিক্‌পতি ছিলেন। যমও আগে হইতেই দক্ষিণ দিক্‌পতি ছিলেন। কেন বলিতেছি। যম ভারতবর্ষের ও পারস্যদেশের আর্য্যদিগের সাধারণ দেবতা; সম্ভবতঃ তিনি আদিমানব। যম ও যমী, ভ্রাতা ও ভগিনী। যম প্রথমে পরলোকবাসী হইলেন; তাঁহার পরে যাঁহারা পরলোকবাসী হইলেন, তাঁহারা পিতৃগণ; যম হইলেন পিতৃগণের অধিপতি। যম যখন দক্ষিণদিকের অধিপতি তখন যমলোক ও পিতৃলোক দক্ষিণে হইল। দেবযান ও পিতৃযানের কথা আগে বলিয়াছি। দেবগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হইত। দেবগণকে আহুতি দেওয়া হইত স্বাহান্ত মন্ত্রে; পিতৃগণকে আহুতি দিতে হইত স্বধান্ত মন্ত্রে। উভয়ের জন্য অগ্নিও স্বতন্ত্র ছিল। দেবগণকে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম আহবনীয়; বেদির পূর্ব্বদিকে তাহার স্থান। পিতৃগণের উদ্দেশে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি; বেদির দক্ষিণে তাহার স্থান। আজ পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে দেবপূজাদি কর্ম্ম পূর্ব্বাস্য হইয়া করিতে হয়; পিতৃগণের উদ্দেশে সকল কর্ম্ম দক্ষিণাস্য হইয়া করিতে হয়।

এখনও পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের দক্ষিণাস্য হইয়া আহার করিতে নাই; আশঙ্কা যে যদি হাত হইতে ভাত পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃগণের পিণ্ড দেওয়া হইবে। দেবপূজা উত্তরাস্য হইয়াও চলে। ইহার কারণও বুঝা যায়। পরবর্ত্তীকালে দেবগণের, পিতৃগণের, দেবযানের ও পিতৃযানের মধ্যে contrast যখন খুব বাড়িয়া গেল; পিতৃগণ আগে হইতেই দক্ষিণের অধিবাসী ছিলেন; দেবগণও সেইরূপ contrastএর ফলে উত্তরের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পিতৃযান হইল দক্ষিণে, দেবযান হইল উত্তরে। এই contrast আবার আর এক দিকে ফলাইয়া তোলা হইয়াছে। দেবযানের ও পিতৃযানের সম্পর্ক আলো আঁধারের তুল্য। আমরা Equator এর উত্তরবাসী, আমাদের পক্ষে উত্তর দিক্ আলোর দিক্, এবং দক্ষিণ দিক্ আঁধারের দিক্। ইহা জ্যোতিষের কথা। আজ কাল নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাশটি; কিন্তু বেদের সময়ে নক্ষত্রের সংখ্যা ছিল আটাশ। এই আটাশটি নক্ষত্রের মধ্য হইতে অভিজিৎকে বাদ দিয়া এখন ২৭টা করা হইয়াছে। আকাশের মধ্যে Equator অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ও Ecliptic অর্থাৎ রবিমার্গ পরস্পরকে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করিতেছে; সেই দুই ছেদবিন্দুর নাম ক্রান্তিপাত; সূর্য্য সেই দুই ক্রান্তিপাত বিন্দুতে উপস্থিত হইলে দিন রাত্রি সমান হয়; আশ্বিনে ও চৈত্রে বিষুবসংক্রমণ ঘটে,—জলবিষুব ও মহাবিষুব। ঐ আটাশটি নক্ষত্র রবিমার্গে সাজান রহিয়াছে। রবিমার্গের অর্দ্ধেক Equatorএর উত্তরে; সেইখানে চৌদ্দটি নক্ষত্র সাজান রহিয়াছে; সেই কয়টি দেবনক্ষত্র। আর যে চৌদ্দটি নক্ষত্র Equator এর দক্ষিণে অবস্থিত, সেই কয়টি পিতৃনক্ষত্র। সূর্য্য ছয়মাসকাল Equatorএর উত্তরে দেবনক্ষত্রের কাছে থাকেন; তখন দিন বড়, রাত ছোট; উত্তরায়ণ। আর যে ছয়মাসকাল Equator এর

দক্ষিণে পিতৃনক্ষত্রের কাছে থাকেন, তখন রাত বড় দিন ছোট,—দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নের সময় দেবগণ নিদ্রিত থাকেন; সে সময়ে সমস্ত দেবকার্য্য নিষিদ্ধ। এই জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণায়নে দেবীর অকালবোধন করিয়া পূজা করিতে হইয়াছিল। দেবযানের ও পিতৃযানের সঙ্গে উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের সম্পর্ক এখন ঠিক পাওয়া গেল। দেবযানে আলো বেশী; পিতৃযানে আঁধার বেশী।

"ঐ যে ক্রান্তিপাত বিন্দুর কথা বলিয়াছি, উহা একস্থানে স্থির নহে; ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে; এই ঘটনার ইংরাজি নাম—precession of the equinoxes, সংস্কৃত নাম—অয়নচলন। প্রায় ১৫০০ বৎসর আগে পহেলা বৈশাখে সূর্য্য অন্যতর ক্রান্তিবিন্দুতে উপস্থিত হইত; সেই দিন মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত। সেই দিন, দিন ও রাত সমান হইত; আজিও পঞ্জিকাতে সেই দিন মহাবিষুব-সংক্রান্তি ধরা হয়, এবং মহাবিষুবসংক্রান্তির ক্রিয়া কর্ম্ম সেই দিন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অয়নচলনের দরুণ মহাবিষুবসংক্রান্তি এখন ৯ই চৈত্র ঘটিয়া থাকে; এই কয়শত বৎসরের মধ্যে ক্রান্তি-পাত বিন্দু এতটা সরিয়া গিয়াছে। আরও পূর্ব্বে আরও দূরবর্ত্তী স্থানে বিষুবসংক্রমণ হইত। আজকাল সূর্য্য মীন রাশিতে থাকিতে বিষুবসংক্রমণ হইতেছে; ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মেষে প্রবেশের সময় হইত; তাহারও বহুপূর্ব্বে এক সময়ে বৃষে, এমন কি মিথুনেও, বিষুব-সংক্রমণ হইত। আকাশে দেখিতে পাইবেন, বৃষরাশির পূর্ব্বাংশে মৃগ-শিরা নক্ষত্র; এই মৃগশিরার অপর নাম প্রজাপতি; চলিত ভাষায় ইনি কালপুরুষ; ইংরাজিতে Orion। এই মৃগশিরার নিকট দিয়া ছায়াপথ বা Milky Way চলিয়া গিয়াছে; এই ছায়াপথ সমস্ত আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আছে; নদীরূপে কল্পিত হইয়া ইহার অপর নাম

হইয়াছে আকাশগঙ্গা বা মন্দাকিনী। মৃগশিরার নিকটে আকাশগঙ্গার উভয়পার্শ্বে দুইটি অত্যুজ্জ্বল তারা ( Stars of the first magnitude ) দেখিতে পাওয়া যায়। একটির ইংরাজি নাম Sirius or Dog-Star, সংস্কৃত নাম লুব্ধক বা মৃগব্যাধ; এই তারাটি Canis Major (বড় কুকুর) Constellationএর অন্তর্গত। আর একটি তারার নাম Procyon; উহা Canis Minor, বা ছোটকুকুর Constellationএর অন্তর্গত; cyon ও শ্বন্ (কুকুর) একই শব্দ। বিস্ময় এই যে বেদেও এই দুইটাকে 'শ্বানৌ'—দুইটা কুকুর বলা হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে ঐখানে ছায়াপথরূপিণী নদীর দুই পার্শ্বে দুইটা কুকুর রহিয়াছে। বহুপূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল যখন সূর্য্য এই স্থানটায় উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ ঘটিত; সে কোন্ সময়, মোটামুটি হিসাব করিয়া বলা যায়। ক্রান্তিপাত যখন ছায়াপথের সেইখানে ছিল, তখন রবিমার্গের একার্দ্ধ তাহার দক্ষিণে পড়িত, অপরার্দ্ধ ছায়াপথের উত্তরার্দ্ধে; কাজেই এই স্থানটায় দেবযানের ও পিতৃযানের junction (যোগ) স্থল; দেবযান হইতে পিতৃযানে যাইতে হইলে সেই junction অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; কাজেই উহা উক্ত নদীর উপর সেতুরূপে কল্পিত হইল; পিতৃলোকে প্রবেশ করিতে হইলে এই সেতু পার হইতে হয়। উহাই পারসীকদের ছিন্নৎ সেতু; হিন্দুদিগের উহাই যমদ্বার; ঐ ছায়াপথরূপিণী নদী যমদ্বারস্থিত বৈতরণী। ঋগ্বেদে যমের দুই কুকুরের কথা শুনা যায়, দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ; ঐ পূর্ব্বোক্ত দুইটি Dogstar সেই দুই কুকুর। গ্রীকদিগের Hades বা যমলোকের প্রবেশদ্বারে যে ত্রিশির Cerberus নামক কুকুরের কথা পাওয়া যায়, সেও ঐ কুকুর। রবিমার্গের দক্ষিণাংশের সহিত পিতৃগণের ও যমলোকের সম্পর্ক, আর উত্তরাংশের সহিত দেবগণের ও দেবলোকের সম্পর্ক ইহা হইতে কতকটা বুঝা গেল। অতি পূর্ব্বে, যখন

আর্য্যেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই, সেই সময়ে যমের সহিত দক্ষিণ দিকের সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যম দক্ষিণ-দিক্‌পাল। যমলোক দক্ষিণদিকে। অতএব পিতৃলোকও দক্ষিণে। আর তাহার সহিত contrast দেখাইবার জন্য দেবলোক উত্তরে; দেবযানও উত্তরে। শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহা অতি সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"বৈদিক সাহিত্যে গ্রহদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা কিছু পাওয়া যায় না। একমাত্র বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নামান্তর ব্রহ্মণস্পতিঃ; তিনি যে planet Jupiter, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন; সাহেবেরা এই জন্য অনুমান করিয়াছেন, যে বৈদিক কালে গ্রহগুলা আবিষ্কৃত হয় নাই। এ একটা মস্ত হেঁয়ালি। যাঁহারা আটাশটা নক্ষত্র স্থির করিয়াছিলেন,সে গুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভ (Stars of the second and third magnitude), তাঁহারা যে বড় বড় গ্রহের অস্তিত্ব জানিতেন না, এ অনুমান বড়ই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যে কোনও ব্যক্তি বৃহস্পতি শুক্র ও মঙ্গলকে দেখিতে পাইবেই। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিলক এ বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন।

"বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ যজ্ঞের কথা আছে; তদ্ব্যতীত যাহা আছে তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক; কাজেই তাহাতে কোনও কিছুর উল্লেখ না থাকিলে বলা যায় না যে বেদের সময়ে আর্য্যেরা তাহা জানিতেন না; এ কথা বলিলে বড়ই অন্যায় হইবে। স্থির নক্ষত্রচক্রের মধ্যে চন্দ্রের গতি-বিধি দেখিয়া যজ্ঞের কাল নির্ণয় করা হইত; কাজেই নক্ষত্রের নামোল্লেখ বেদের মধ্যে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অস্থির গ্রহদিগের গতির স্থিরতা নাই; কাজেই যজ্ঞের কালনির্ণয়ে তাহারা সাহায্য করে না; তাই গ্রহগণের স্পষ্ট উল্লেখে কোনও প্রসঙ্গই বৈদিক সাহিত্যে উত্থাপিত হয় নাই।

বৃহস্পতির অর্থ যাহাই হউক, তিনি বেদে একজন প্রধান দেবতা; তাঁহার নামোল্লেখ পদে পদে দেখিতে পাই। শুক্র শব্দেরও বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে; প্রায় সর্ব্বত্রই শুক্র শব্দের অর্থ—উজ্জ্বল। শুক্রগ্রহ বা Planet Venus ঔজ্জ্বল্যে সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ; এত উজ্জ্বল যে Morning ও Evening Star রূপে অতি নিরক্ষর লোকের নিকটও পরিচিত। বৈদিক কালে যে শুক্র গ্রহ অনাবিষ্কৃত ছিল, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না। আর একটু কথা আছে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমযজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে সোমলতার রস আহুতি দেওয়া হইত। যে পাত্রে সেই রস গ্রহণ করা হইত, এবং তৎপরে আহুতি দেওয়া হইত,সেই পাত্রের নাম গ্রহ,—ইংরাজি তর্জ্জমা করা হয় Soma-Cup; রসের যে অংশটুকু একটা পাত্রে লইয়া কোনও দেবতাকে আহুতি দেওয়া হইত, সেই অংশটুকুর নামও গ্রহ,—আশ্বিনগ্রহ (অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে) মৈত্রবরুণগ্রহ, ঐন্দ্রমারুত গ্রহ ইত্যাদি। সোমযাগে এইরূপ দুইটি গ্রহের বা সোমপাত্রের নাম ছিল, শুক্র ও মন্থি; সোমযাগ-মাত্রেরই প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনসবনে বড় বড় দেবতাকে সোমাহুতি দিবার পূর্ব্বে এই শুক্র ও মন্থি আহুতি দিতে হইত। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক শুক্রগ্রহ হাতে লইতেন; তাহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক মন্থিগ্রহ হাতে লইতেন; দুইজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আহবনীয়াগ্নিতে আহুতি দিতেন। আহুতির মন্ত্র আলোচনা করিলে বোধ হয় যে শণ্ড ও মর্ক নামক অসুরদ্বয়কে ঠাণ্ডা করাই এই আহুতির উদ্দেশ্য। এই শণ্ড ও মর্ক উত্তরকালে শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ডামার্ক নামে কল্পিত হইয়াছেন। পৌরাণিক কালে বৃহস্পতি যেমন দেবগণের গুরু হইয়াছেন, শুক্রও তেমনি অসুরদের গুরু। শুক্র ও মন্থির যেরূপ সহযোগিতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় একজনেরই দুই নাম; খুব সম্ভব শুক্র Evening Star, মন্থি Morning Star। গ্রহ শব্দের আদিম অর্থ সোম

পাত্র। এখন প্রশ্ন উঠে যে Planet অর্থ আসিল কি করিয়া? বেদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি, নক্ষত্রগুলি দেবতাদের ঘর; দেবগণ আপন আপন ঘরে বসিয়া সোমপান করিয়া থাকেন। কোন্ নক্ষত্রে কোন্ দেবতা আছেন, এখনও পঞ্জিকায় তাহার তালিকা পাইবেন। সোমের অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সোমের 'ইন্দু' নাম ঋগ্বেদের মন্ত্রেই পাওয়া যায়; সোম এবং চন্দ্র যে এক, পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত; আজ পর্য্যন্ত আমরা সোমকে চন্দ্র বলিয়া জানি; কিন্তু প্রথমে সোম শব্দে চন্দ্র বুঝাইত কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মাসের মধ্যে এই সোম বা চন্দ্র নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন; এক এক দিন এক এক নক্ষত্রে থাকিয়া ২৮দিনে ২৮টী নক্ষত্রে ঘুরিয়া আসেন। দেবতারাও সে সকল নক্ষত্রে আপন আপন ঘরে বসিয়া সেই চন্দ্ররূপী সোমকে পান করেন; তাই চৌদ্দ দিন ধরিয়া সোম ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হন; পরের চৌদ্দ দিনে এই সোমের ক্রমশঃ আপ্যায়ন অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণতাসাধন ঘটে। সোমের এই আপ্যায়ন বা পূরণ সোমযজ্ঞের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। এখন আমরা যে সকল সচল জ্যোতিষ্ককে planet বলি, তাহারাও নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে; ঐ planetগুলাই পর্য্যায়ক্রমে দেবতাদের কাছে উপস্থিত হয়; সেইগুলাই হইল দেবতাদের সোমপাত্র; দেবতারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য উহাদের সাধারণ নাম হইল গ্রহ। ঐরূপ গ্রহের সংখ্যা আগে পাঁচটির বেশী ছিল না। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। ইহারা যেমন নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করে, সূর্য্য ও চন্দ্র সেইরূপ নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করে। ইহা দেখিয়া পরবর্ত্তীকালে জ্যোতিষিরা এই দুইটিকেও গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করিলেন; তখন সর্ব্বশুদ্ধ গ্রহ হইল সাতটি। তখন গ্রহ শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অন্যরূপ; যে নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে, সেই গ্রহ। আগে অর্থ ছিল, দেবতারা আপন ঘরে বা নক্ষত্রে বসিয়া যে পাত্র দ্বারা সোমকে বা চন্দ্রস্থিত অমৃতকে পান

করেন, তাহাই গ্রহ। এখনও সাধারণে চন্দ্রকে সুধাভাণ্ড বলিয়া জানে। উহা অমৃতের ভাণ্ড; আর মঙ্গলাদি গ্রহ ছোট ছোট পাত্র; উহা দ্বারা সেই ভাণ্ড হইতে অমৃত লইয়া দেবতারা পান করেন। চন্দ্রের "সুধাংশু" "অমৃতাংশু" নামের তাৎপর্য্যও এই। অংশু শব্দে কিরণ বুঝায়। উহার আরও একটু সূক্ষ্ম অর্থ আছে। সোমযজ্ঞে সোমলতা পিষিয়া রস বাহির করা হইত। ঐ সোমলতার অংশ বা টুকরাগুলিকেও অংশু বলা হইত। 'সোমখণ্ড' অর্থে অংশু শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আছে। সোমরসের বিশিষ্ট গুণ উহার উজ্জ্বলতা। সোমলতার রসই চন্দ্রের কিরণ।

"এই সোমপানে অধিকার লইয়া দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিত। সোমপানে অমরত্ব লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে এই সোমরসে অধিকার দিতে চাহিতেন না; দেবাসুরের চিরন্তন বিরোধের ইহা একটা প্রধান কারণ। পিতৃগণও সকলে এ অধিকার পান নাই। এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম সৌম্য বা সোমপ। উত্তরকালে চন্দ্রের বা সোমের সহিত পিতৃগণের সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী হইয়াছিল; পিতৃগণ চন্দ্র হইতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সোমপান করিতে পাইতেন। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা সৎকর্ম্মের ফলে পিতৃযান অবলম্বন করিয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন, তাঁহারা কিছুদিনের জন্য সোমপান করিতে পান। কিন্তু সেও কিছু দিনের জন্য। আবার তাঁহারা ফিরিয়া আইসেন। সৎকর্ম্ম করিয়া অমরত্বলাভের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না।

"সোমের সঙ্গে যখন পিতৃগণের ও পিতৃযানের, অতএব দক্ষিণদিকের এই রকম একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গেল, তখন সোমকে আর উত্তর-দিকের অধিপতি করিয়া রাখা চলে না; একজন নূতন উত্তরদিক্-পাল কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই নবকল্পিত দিক্‌পালের

নাম কুবের। হিমালয়ের উত্তর দিকে যক্ষদিগের দেশ কল্পিত হইয়াছিল; তাহাদের অধিপতি কুবের স্বভাবতঃই উত্তরদিক্‌পালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোমের তুলনায় কুবের সম্ভবতঃ নূতন দেবতা।

"সোম-পানের অধিকার লইয়া একদিকে দেবগণের ও অসুরগণের বিরোধ, আর অন্যদিকে দেবযানের ও পিতৃযানের বৈপরীত্য অনেক আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের মধ্যেই উপাখ্যান আছে, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ত্রিশিরা সোমপান করিতে উদ্যত হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ত্বষ্টা বৃত্রাসুরকে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দী করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বিরোধ কাহিনীতে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পরিপূর্ণ। দেখা যায় যে, পৃথিবীর ও আকাশের উত্তরার্দ্ধ দেবগণের ও দক্ষিণার্দ্ধ অসুরগণের ভাগে পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা পৌরাণিকের নিকট হইতে এই idea গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর উত্তরদিকে অর্থাৎ সুমেরুতে অসুরগণের বাস। বৎসরের অর্দ্ধেক কাল, উত্তরায়ণের সময়, সুমেরুতে দিন; কুমেরুতে তখন রাত্রি। দেবতারা তখন জাগ্রত, অসুরগণ নিদ্রিত। দক্ষিণায়নের ছয় মাস অশুরদিগের দিন, দেবতাদিগের রাত্রি। ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত এই মত চলিয়া আসিয়াছে। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র সব চেয়ে উজ্জ্বল। বৃহস্পতি যেমন পৌরাণিক মতে দেবগণের আচার্য্য, শুক্র তেমনি অসুরগণের আচার্য্য। শুক্রের নামান্তর উশনা। বেদে উশনার 'কাব্য' বা কবিপুত্র বিশেষণ দেখা যায়। কাব্য নামে এক শ্রেণীর পিতৃগণও আছেন; শুক্রের সঙ্গে একদিকে অসুরের ও অন্যদিকে পিতৃগণের সম্পর্ক রহিল। শুক্র অসুরদিগকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা বাঁচাইয়া দিতেন; এই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা সেই অমৃত সোম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিদ্যা শিখিবার জন্য বৃহস্পতি নিজপুত্র কচকে পাঠাইয়াছিলেন। বৃহস্পতি

ও শুক্র এই দুই উজ্জ্বলতম গ্রহকে যথাক্রমে দেবগণের ও অসুরগণের গুরুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উভয়েই আপন আপন শিষ্যদিগকে অমৃত দ্বারা বাঁচাইতেন। বৃহস্পতির নামান্তর ব্রহ্মণস্পতিঃ। ব্রহ্মই বেদ, এবং শব্দ এবং অমৃত। সোমের শুক্র বিশেষণ পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। এই সোম বা অমৃত উদ্ধার করিবার জন্যই সমুদ্র-মন্থন ঘটিয়াছিল। এই সমুদ্র আর কিছু নহে, ইহা সেই নাসদাসীয় সূক্তের অম্ভঃ অপ্রকেতঃ, সাধারণতঃ যাহাকে কারণবারি বলে; বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ইহা মহাকাশব্যাপী সেই fluid যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি এবং যাহাতে জগৎ লীন হইয়া যাইবে। এই সমুদ্র হইতেই অমৃত তুলিবার জন্য দেবাসুর মিলিয়া চেষ্টা করিয়াছিল; মন্থন-রজ্জু অনন্ত নাগ বা শেষ নাগ হয়ত Ecliptic অর্থাৎ আকাশব্যাপী রবি-মার্গ, হয়ত বা আকাশব্যাপী ছায়াপথকেই কল্পনা করা হইয়াছিল। Ecliptic ই হউক,বা ছায়াপথই হউক, তাহার একার্দ্ধ দেবগণ আকর্ষণ করিতেছেন, অপরার্দ্ধ অসুরগণ আকর্ষণ করিতেছেন। মন্দর পর্ব্বত বোধ হয় রবি-মার্গের মধ্যস্থিত Pole of the Ecliptic। অমৃত উত্থিত হইলে স্বয়ং নারায়ণ তাহা দেবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন; অসুরেরা বঞ্চিত হইলেন; রাহু ও কেতু দেবতার দলে মিশিয়া সেই অমৃত পান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাদিগকে ধরাইয়া দেন। তদবধি রাহু ও কেতুর সহিত চন্দ্রসূর্য্যের শত্রুতা জন্মিয়াছে; তাহারা সময়ে সময়ে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। রবিমার্গ ও বিষুববৃত্ত যেমন পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, সেইরূপ রবিমার্গ ও চন্দ্রমার্গ দুইটা বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। ঐ দুইটা ছেদ বিন্দুই রাহু ও কেতু। সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের পথই ঐ দুই বিন্দুর দিকে converge করিতেছে; কাজেই উহারা যেন দুই বিন্দুকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, দেখাইয়া দিতেছে। এই দুই বিন্দু আবার আকাশে স্থির

নহে ; ইহারাও নক্ষত্রচক্রের মধ্যে ভ্রমণশীল। দেখা গিয়াছে যে নক্ষত্রচক্রের মধ্যে যাহা কিছু ভ্রমণ করে, তহাকেই গ্রহ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। সুতরাং আগেকার সাতটি গ্রহের উপর রাহু ও কেতুকে চড়াইয়া নবগ্রহ দাঁড় করান হইল। সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই বিন্দুতে উপস্থিত না হইলে গ্রহণ হয় না ; কাজেই গ্রহণের সময় রাহু ও কেতু আসিয়া সূর্য্য চন্দ্রকে গ্রাস করে। সূর্য্য চন্দ্র দেবতা ; রাহু কেতু ঐ বিরোধের জন্য অসুর। অথবা রাহু কেতু নক্ষত্রচক্রে উণ্টা পথে চলে, সেই জন্যই হয়ত উহারা অসুর।

দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যেমন চিরবিরোধ, দেবগণের ও পিতৃগণের মধ্যে ততটা নাই, কিছু আছে। উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষ দেবকার্য্যের জন্য প্রশস্ত ; শুভকর্ম্ম ও দেবপূজা ঐ সময়ে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন ও কৃষ্ণপক্ষ পিতৃকর্ম্মের পক্ষে প্রশস্ত ; এই সময়ে আমরা এক পক্ষ ধরিয়া পিতৃতর্পণ করি ; শ্রাদ্ধক্রিয়া অমাবস্যায় সম্পন্ন হয় ; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পতিত হইলে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বা অমাবস্যায় করিতে হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে আহুতি বা পিণ্ড দিলে জলস্পর্শ করিয়া শুচি হইতে হয় ; অসুরের উদ্দেশেও জলস্পর্শ করিতে হয় ; এইখানে উভয়ের মধ্যে একটু মিল পাওয়া যায়।

"দেখা যাইতেছে যে সমস্ত দেবতাদিগের জন্য একটি মাত্র স্বর্গ কল্পিত হয় নাই ; কয়েক জন বড় বড় দেবতাকে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদের তিনটি দেবতা পরবর্ত্তী কালে অন্য দেবগণকে ছাড়াইয়া অনেক উচ্চ আসন পাইলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ; ইঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইল ; ইঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র লোক কল্পিত হইল। সত্ত্বগুণাত্মক ব্রহ্মা person হিসাবে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠেন নাই ; সেইরূপ ব্রহ্মলোকও ভাল করিয়া ফুটে নাই। মানস সরোবরে তাঁহার আবাসস্থান ; ঋগ্বেদ সং-

হিতার নাসদাসীয় সূক্তে ইহার অর্থ পাওয়া যায়। এই সূক্তে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় দেখিতে পাই যে কামনা হইতে জগৎ সৃষ্ট; প্রজাপতি কামনা করিলেন, আর জগৎ সৃষ্ট হইল। এই কামনার নাম—কাম; ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন, মনসিজ; "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" তৎপরে সৃষ্ট "অম্ভঃ-অপ্রকেতঃ—primal waters, কারণবারি—ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই সলিলরাশি মানস সরোবর; ব্রহ্মা ইহার তীরে বসিয়া জগৎ পর্য্যালোচনা করিতেছেন। মানস সরোবর জিনিসটা conceptual; তিব্বতের মানস সরোবরটা উহার পার্থিব প্রতিরূপ মাত্র। শিবের আবাসভূমি—কৈলাস। বেদের রুদ্রদেব ক্রমশঃ মহাদেবে রূপান্তরিত হইলেন। গোড়াতেই দেখা যায়, রুদ্রের সঙ্গে পর্ব্বতের সম্বন্ধ; তিনি গিরিশ; বেদে রুদ্রকে গিরিশন্ত বলা হইয়াছে। বেদের মধ্যেই রুদ্রের নানা বিশেষণ—কপর্দ্দী, বভ্রু, পিনাকী ইত্যাদি; এই সকল বিশেষণের আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রুদ্রকে পাহাড়ের দেবতা Mountain-god ) স্থির করিয়াছেন! মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র; তাহারা mountain-storms; রুদ্রের সহিত এই পাহাড়ের সম্পর্ক শিবের বেলার হিমালয় ও কৈলাসের সম্পর্ক দাঁড়াইল। সে দিন "শাশ্বতী" পত্রে পণ্ডিত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয় বেদের মন্ত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন, মহাদেবের নিবাস ছিল উত্তরে মূজবান পর্ব্বতে। এই মূজবান পর্ব্বতে সোম পাওয়া যাইত। এই মূজবানই কি তবে কৈলাস? রুদ্রের সহিত ভূতগণের সম্পর্ক বেদে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিরোহিণীঘটিত উপাখ্যানে ভূতমানের কথা পাওয়া যায়। এই ভূতমান রুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং ইনিই পরবর্ত্তীকালে ভূতপতি। আবার এই ভূতগণকে দেবযোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্য দেবযোনির

সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগের বাস উত্তরদিকে বলিয়া লোকের ধারণা। সন্নিকটে ভূতগণপরিবেষ্টিত মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতেন; গন্ধর্ব্ব কিন্নর গান শুনাইত। মহাদেবের বা রুদ্রের সহিত গিরির সম্পর্ক হইতে উত্তরে শিবলোক দাঁড়াইয়া গেল। তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতের সহিত শিবের সম্পর্ক দেখা গেল; কিন্তু এই শিবলোকের একটা conceptual ব্যাখ্যা নিশ্চয় ছিল। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন ঘটনার মধ্যে বেদের ভীম রুদ্র মহাদেবের সহিত লয় অর্থাৎ সংহার কার্য্যের বিশেষ সম্পর্ক পাতান হয়। এই জন্য তিনি সংহারকর্ত্তা ও শ্মশান-চারী। শিব শ্মশানচারী; তাঁহার দেহ যে চিতাভস্মে মণ্ডিত, সেই ভস্ম জগতের মহাপ্রলয়সম্ভূত, ইহা শিবপুরাণের বচনে বলা হইয়াছে। এই শ্মশানই শিবলোক। এই conception এর একটা astronomic মূল আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকাশস্থিত Sirius বা Dog-star নামক তারকার বৈদিক নাম, মৃগব্যাধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রজাপতির কন্যাগমন উপাখ্যান অনুসারে ঐ মৃগব্যাধই "ভূতমান রুদ্র"। একসময়ে ঐ স্থানের নিকট বিষুবসংক্রমণ হইত, অর্থাৎ Equator ও eclipticএর ছেদবিন্দু ঐখানে ছিল। ঐ ছেদবিন্দুই যমদ্বার। উহা অতিক্রম করিয়া দেবলোক হইতে পিতৃলোক যাইতে হইত। দেবযান ও পিতৃযানের মধ্যে উহা অবস্থিত। উহার দক্ষিণেই পিতৃলোক। মৃগব্যাধ রুদ্রের নিকটে যখন ঐ যমদ্বার অবস্থিত ছিল, তখনই হয় ত রুদ্রের সহিত শ্মশানের সম্পর্ক স্থির হয়। কালিদাসের ভাষায় "ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে" এই স্থানে পিতৃসদ্মগোচরঃ বিশেষণ এই অর্থে সার্থক হয়। এই যমদ্বারের পার্শ্বস্থিত দুইটা কুকুর (Canis major ও Canis minor, বেদের শ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ), এই জন্য শ্মশানকুক্কুর। ভৈরব মূর্ত্তিতে শিবের সঙ্গে কুকুর থাকে; ভৈরব কুক্কুরবাহন। এখনও ভৈরবপন্থী শৈব সন্ন্যাসী আছে; তাহাদের সঙ্গে

কুকুর থাকে। আকাশ-গঙ্গা ঐ মৃগব্যাধরূপী রুদ্রের পাশ দিয়া গিয়াছে; গঙ্গা বিষ্ণুপদ ( pole of the ecliptic ) এর নিকট হইতে নিক্রান্ত হইয়া মহাদেবের মস্তকে পতিত হইয়াছেন, এই কল্পনার মূলও এইখানে হইতে পারে। এই মৃগব্যাধ রুদ্রের ভূতমান্ বিশেষণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানেই পাওয়া যায় বলিয়াছি। 'ভূতমান' পরবর্ত্তী কালে ভূতপতি। শ্মশানচারী শিবের অনুচর ভূতগণ কালে প্রমথগণে পরিণত হইয়াছেন। কালক্রমে দার্শনিক আচার্য্যগণের হাতে অন্যরূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে যাবতীয় স্থূল দ্রব্যের নাম ভূত, বিশেষতঃ ক্ষিত্যাদি পাঁচটি elementকে ভূত বলা হইয়াছে। মহাদেব জগৎপতিরূপে ভূতের পতি। বিশেষতঃ ঐ পাঁচ ভূতকে তাঁহার মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শিবের অষ্টমূর্ত্তির কল্পনা সকলেই জানেন। শিবপূজা করিতে হইলে ঐ অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। কালিদাস ঐ অষ্টমূর্ত্তির বন্দনা করিয়াই শকুন্তলা আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ আটটি মূর্ত্তি কি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটী ভূত, এবং সূর্য্য সোম ( চন্দ্র ) ও সোমযাজী যজমান। পাঁচ ভূতে সমস্ত জগৎকে বুঝাইল। সঙ্কীর্ণ অর্থে সূর্য্য দেবলোক; দেবযান পথে সূর্য্যে যাইতে হয়। চন্দ্র বা সোম পিতৃলোক; পিতৃযানের পথ মনে করুন। অতএব সূর্য্য ও সোম এই দুই মূর্ত্তি, স্থূল জগতের পরপারে যে সূক্ষ্মতর লোক আছে, যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যাইতে হয়, এই দুই লোককে বুঝাইল। তাহার পর অষ্টম মূর্ত্তি, সোমযাজী যজমান স্বয়ং; যিনি জীবরূপে সংসারে কর্ম্ম করেন, এবং তাহার ফলে দেবযানে বা পিতৃযানে, স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে, প্রয়াণ করেন। ফলে জীব ও জীবের কর্ম্মক্ষেত্র সমুদয়ই ঈশ্বরের প্রকাশ। অষ্টমূর্ত্তি বলিলে যাহা কিছু আছে সকলই তাহার অন্তর্গত। এখন শিবলোকের আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া গেল। আদি

বলিতে চাহি যে—ব্রহ্মার মানস-সরোবর, বিষ্ণুর ক্ষীরোদধি ও শিবলোক এই তিনেরই conceptual significance একই। শিব অষ্ট মূর্ত্তিতে যাহা ব্যাপিয়া আছেন, সেই সমস্ত জগৎটা শিবলোক; জাগতিক দ্রব্য-মাত্রই তাঁহার অনুচর ভূতগণ। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল, নিত্যধ্বংসশীল জগৎকে শ্মশান বলা হইয়াছে। সেই জন্য তিনি শ্মশানচারী ও শ্মশানস্থিত ভূতগণের অধিপতি। আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া লইলে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা অনুসারে পিতৃলোকে প্রবেশের দ্বারে আকাশের অংশবিশেষে মৃগটায় পৌঁছিতে হয়। লৌকিক ভাষায় তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতটা—যেখানে গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরাদির পার্শ্বে ভূতযোনিরা বাস করে—সেই কৈলাস পর্ব্বতটাই শিবলোকের পার্থিব প্রতিরূপ। হিমা-লয়ের উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে যেখানে সোম পাওয়া যাইত; সেই দুর্গম অথচ প্রার্থনীয় প্রদেশে অবস্থিত পর্ব্বত মহাদেবের বাসের পার্থিব প্রতি-রূপ হইল। ঐ কৈলাস পর্ব্বতের নিকটেই নাকি মানস-সরোবর। ব্রহ্মার মানস সরোবর ও ঐরূপে তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

"মহাদেবকে বৃষবাহন কেন বলা হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। শাস্ত্রে ধর্ম্মকে চতুষ্পাদ্ বৃষ বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের এই নাম প্রসিদ্ধ। পিতৃপতি যমের এই নাম প্রসিদ্ধ। তিনিই পৌরাণিককালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা দাঁড়াইয়াছেন। যমদ্বারের ও পিতৃলোকের পার্শ্বে থাকায় মহাদেব ও বৃষবাহন, বৃষধ্বজ অর্থাৎ ধর্ম্মবাহন ধর্ম্মচিহ্নিত হইয়াছেন কি? অথবা আকাশমণ্ডলে বৃষরাশির (Taurus নামক constellation) পূর্ব্বাংশে মৃগব্যাধের স্থান কল্পিত হওয়ায় তিনি বৃষবাহন হইয়াছেন? রাশিচক্রের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই; শুনা যায় উহা গ্রীকদিগের নিকট হইতে আমরা লইয়াছি। গ্রীক সমাগমের পরবর্ত্তী ভারতীয় সাহিত্যে না কি মেষবৃষাদি রাশির কল্পনা আছে, তাহার পূর্ব্বে ছিল না। তাহা হইলেও

ক্যালডিয়াতে গ্রীকের ও ভারতবর্ষের রাশিচক্রের মূল অনুসন্ধান চলে না কি ? ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর বাহনকে বেদেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মার বাহন হংস ; ইনি ঋকের সেই সর্ব্বব্যাপী জগদ্ব্যাপী হংস ভিন্ন আর কেহ নহেন। মানস সরোবরেই ইঁহার স্থিতি ; কেন না সৃষ্ট জগৎটাই মানস সরোবর। আর গরুড়পক্ষী,—ইনি বেদের সুপর্ণ গরুত্মান্ ; ইনি একদিকে সূর্য্য, অন্যদিকে ব্রহ্ম ; ইঁহার ভ্রাতা অরুণ, সূর্য্যের সারথি। অতএব ইনিও সেই হংস। কেন না হংসও একদিকে সূর্য্য, অন্যদিকে ব্রহ্ম। পূর্ব্বে ইহাদের কথা উঠিয়াছিল। এখানে পুনরুক্তির দরকার নাই।

"ঋগ্বেদের মধ্যেই পরমপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তিন পদের দ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম। নিরুক্তকারেরা তাঁহাকে সূর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ঐ তিন পদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক। কাহারও মতে ঐ তিন পদ আর কিছু নহে, সূর্য্যের উদয়স্থান, মধ্যাকাশ ও অস্তগমনস্থান ; বিষ্ণুর পরমপদ আকাশের মধ্যস্থলকে ( zenith ) বুঝায়। আমার মনে হয় যে পরম পদ আকাশের অন্তস্থানকেও বুঝাইত, সম্ভবতঃ উহা Pole of the ecliptic ; বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব,--ঐ Pole এর নিকট দিয়া আকাশগঙ্গা (Milky Way ) চলিয়াছেন। ধ্রুব, অর্থাৎ Pole of the Equator, বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পান নাই, কিন্তু পরমপদের নিকটে স্থান পাইয়াছেন। পরম-পদের আধিভৌতিক অর্থ যাহাই হউক, উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বেদের সময়ে চলিত ছিল, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনও একটা স্থান, যাহা কেবল জ্ঞানিগণেরই জ্ঞানগম্য ;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই মন্ত্রে সেই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যেরই আভাস দেওয়া হয়। নাস-দাসীয় সূক্তে ও অন্যান্য নানা স্থানে পরমব্যোমের কথা শুনা যায়। এই পরমব্যোম সম্ভবতঃ বিষ্ণুর সেই পরমপদ হইতে অভিন্ন। ঐ সূক্তে সৃষ্টি—

ব্যাপারের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে এই সৃষ্টির কথা যিনি পরমব্যোমে আছেন, তিনিই জানেন, হয়ত তিনিই জানেন না। পুরাণ-কথায় বিষ্ণুর নানা স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পরে তিনি ক্ষীরোদধির উপর অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। এই ক্ষীর সমুদ্র Infinite space,সেই পূর্ব্বোক্ত অম্ভ গহনং গভীরং বা অপ্রকেতং সলিলং, যাহা সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে সৃষ্ট বা projected। সাম্প্রদায়িক ভাগবত-বৈষ্ণবেরা শ্বেতদ্বীপবাসী নারায়ণের কল্পনা করেন। নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে তাঁহার উপাসনাপ্রণালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে এবং মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ভাগবতধর্ম্ম পঞ্চরাত্রে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্বেতদ্বীপ যদি ক্ষীরোদধির পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে উহারও conceptual তাৎপর্য্য বাহির করা চলিতে পারে। ব্রহ্মার আবাস মানস সরোবর ও নারায়ণের ক্ষীরোদধি একই concept এর নাম দাঁড়ায়। এবং উহার পার্থিব প্রতিরূপ ভূমধ্যসাগর না বালকাশ হ্রদ ( Lake Balkash ), তাহা লইয়া অধিক মাথাব্যথার প্রয়োজন হয় না। জন সাধারণের ধারণায় বৈকুণ্ঠই বিষ্ণুলোক। বৈদিকযুগের পরমপদ পৌরাণিক বৈকুণ্ঠে দাড়াইল। সেখানে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সলক্ষ্মীক মহাবিষ্ণুর স্থান।

"বৈষ্ণবেরা গোলোক কল্পনা করিলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের ভক্তি আকর্ষণ করে না, মাধুর্য্যাদি রসের তাঁহারা পক্ষপাতী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিলেন; ইঁহার স্থান গোলোকে। বৈকুণ্ঠ এবং বিষ্ণু যথাক্রমে গোলোকের এবং শ্রীকৃষ্ণের নিম্নে। বেদান্তের ব্রহ্মের রসময় এবং আনন্দময় মূর্ত্তি লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে বেদান্তের পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিমাত্র। বেদান্তের মুক্তি বৈষ্ণব চাহেন না; শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে থাকিয়া যুগলমূর্ত্তির সেবা উপাসনাই সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরাধার সহিত নিত্যমিলিত। গো, গোপ ও গোপী গোলোকের অধিবাসী। এই শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠবাসী বা সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী ধৃতশঙ্খচক্র হিরণ্ময় পুরুষ নহেন। ইনি দ্বিভুজ মুরলীধর, মদনমোহন; গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃত; গো-গোপ-গোপিকাকান্ত; গোপীগণের নয়নোৎপলে তাঁহার তনু অর্চ্চিত হইতেছে। লীলার জন্য তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া কিছুদিনের জন্য মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন; এবং পরে মথুরায় ও দ্বারকায় লীলা করিয়া মর্ত্ত্যলীলা শেষ করেন। কিন্তু তাঁহার মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। গোলোকের অনুকরণে বৃন্দাবনে তিনি গো-গোপ-গোপিকাকান্তরূপে যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই লীলাই বৈষ্ণবের প্রীতির জিনিষ। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে অনেকেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানেন; কিন্তু খাঁটি বৈষ্ণব সে কথায় আপত্তি করিবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নহেন; দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই; সেখানে বলরাম আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন; তিনি স্বয়ং ভগবান; লীলামানববিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। বরং বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তিভেদমাত্র। মর্ত্ত্যলীলায় বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাযাত্রা আছে, গোপীগণের সহিত বিরহ আছে; কিন্তু গোলোকে বিরহ থাকিতে পারে না, তিনি সেই আপন ধাম ছাড়িয়া এক পাও চলিয়া যান না। লোকে মনে করে যে তিনি গোলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; সেটা আর কিছুই নহে, ইন্দ্রজালের মত একটা ব্যাপার; গোলোকই নিত্য বৃন্দাবন। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কোনও রূপ ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই। সেখানে তিনি স্বয়ং গোপাল, নন্দাদি গোপালের স্নেহভাজন পুত্র, শ্রীদামাদি গোপের নিত্য সখা, গোপীগণের প্রিয়তম বল্লভ, প্রধানা গোপী রাধিকার সহিত নিত্যমিলিত; স্নেহবাৎসল্য সখ্যমাধুর্য্যাদিরসের পূর্ণ

বিকাশ। বৈষ্ণবভজনার উদ্দেশ্য এই যে, বৈষ্ণব গোপীভাবে থাকিয়া সেখানে সেই যুগলমূর্ত্তিকে সেবা করিবার, অন্ততঃ চোখে দেখিবার, অধিকার পাইবেন ; অন্য কোনওরূপ মুক্তি বৈষ্ণব একেবারেই চাহেন না।

"বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়,—Religion of Law এবং Keligion of Redemption ; স্থূলতঃ আমরা একটাকে কর্ম্মপথ, অন্যটাকে ভক্তিপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ঈশ্বর কোনও ঋষির বা prophetএর মুখ দিয়া মানবজাতিকে কতিপয় আদেশ বা অনুজ্ঞা জানাইয়াছেন ; মানুষ আপনা হইতে সেই কর্ত্তব্যগুলি জানিতে পারে না। ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত সেই আদেশের অনুযায়ী বিধিবিহিত আচরণ করিলে মানুষের সদ্গতি হয়। ইহা কর্ম্মের পথ। মোটামুটি ইহাকে সাধনা বলা যাইতে পারে। অনেকের মতে আমাদের বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম ও Old Testamentএর ধর্ম্ম এই 'Religion of Law'র অন্তর্গত। Religion of Redemption ইহা হইতে ভিন্ন। ইহাকে ভজনার পথ বলা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, দীন, ও পাপী। কোনও রূপে কোনও কর্ম্ম বা সাধনা দ্বারা সে উদ্ধারলাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া ; তিনি তাঁহার দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তাহাকে উদ্ধার করিবেন। যতদিন সে ঘটনা না ঘটিবে, ততদিন সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দয়ার উপরে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন করাই জীবের কর্ত্তব্য। এই আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের ব্যাপারটাই ভজনা। বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টান উভয়েই জানেন যে ভগবান স্বয়ং দয়া করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেনই। উভয়েই নিজেকে অতি দীন ও অতি পাপী বলিয়া জানেন। ভগবান স্বয়ং Redeemer ; আর কোনও Redeemer নাই। খ্রীষ্টরূপী ভগবানের দীনভাবে শরণ লইলে খ্রীষ্টানের salvation

হইবে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগত সেবককে একদিন টানিয়া লইবেন। খ্রীষ্টানের মত বৈষ্ণবও বলেন, আমি অতি পাপী, নিজগুণে বা নিজের চেষ্টায় কখনও রক্ষা পাইব না; এমন কি উদ্ধারের দিকে আমার মতি গতি পর্য্যন্তও নাই; কৃপাসিন্ধু তুমি আমার কেশে ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া উদ্ধার কর। অনেকের ধারণা আছে যে বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের পথের সঙ্গে এই কর্ম্মপথের ও ভক্তিপথের বিরোধ আছে। বিরোধ নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু বেদান্তের মধ্যেই তাহার সমন্বয় দেখিতে পাই, এবং সেই সমন্বয়-চেষ্টা যে নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছে এমন ত বোধ হয় না।

"বেদান্তে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। বেদান্ত এক জায়গায় বলেন,— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ; ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বলহীন অথবা আপনাকে বলহীন মনে করিয়া বল অর্জ্জন করিতেও চায় না, যে একেবারে নিশ্চেষ্ট, সে কখনই আত্মাকে লাভ করিবে না; বিনা প্রযত্নে মুক্তি হইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হইতেছে—কেবল প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ হয় না, ন কর্ম্মণা ন বহুনা শ্রুতেন, এমন কি বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্ম করিলেও আত্মলাভ ঘটিবে না; যমেব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তিনি যাহাকে বরণ করেন সেই আত্মলাভ করে। এই 'বরণ' কথাটার অর্থ—স্বেচ্ছাক্রমে বাছিয়া লওয়া, Election; ইহা সম্পূর্ণ free choiceএর ব্যাপার। খ্রীষ্টানের Doctrine of Grace ও বৈষ্ণবের কৃপাবাদ এখানে স্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। আত্মা সম্পূর্ণভাবে free agent; কোনও রূপ বাধ্যবাধকতা তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বরণ দ্বারা জীবকে উদ্ধার করেন; করিবেনই, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক করিবেন। যাঁহারা বেদান্তের মুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্তের মধ্যে এই দ্বিবিধ উক্তির কোনও রূপ বিরোধ দেখিবেন না। এই যে আত্মাকে লাভ করার কথা বলা

হইল, সেই আত্মা শব্দের অর্থ—'আমি'; আত্মাকে লাভ করার অর্থ আমার স্বরূপ দেখা। বেদান্তমতে আমি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। আমি একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বা কল্পনা করিয়া আপনাকে সেই স্বকল্পিত জগতের অধীন এবং বাধ্য মনে করিতেছি; এইরূপে আমি বদ্ধজীব সাজিয়াছি। বস্তুতঃ এই জগৎ-সৃষ্টিটা একটা কল্পনামাত্র, এবং জগতের অধীনতাও একটা কল্পনামাত্র। এই কল্পিত বন্ধনটাকে সত্য মনে করাই বন্ধন; ইহাকে কল্পিত বলিয়া জানাই মুক্তি। এই কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি; এ সৃষ্টিকার্য্যে আমার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই; আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে একটা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া আপনাকে মুগ্ধ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি সর্ব্বদাই মুক্ত, এইটুকু জানাই মুক্তি। ইহা আমার লীলা, ইহা জানাই মুক্তি। স্বেচ্ছাকৃত এই বদ্ধ অবস্থায় আমি চেষ্টার অভিনয় করিয়া থাকি। আপনাকে বদ্ধ জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চিরকাল বদ্ধ ভ্রম থাকিবে। অথচ দেখা যায়, সহস্র চেষ্টাতেও এই ভ্রান্তি যায় না। হঠাৎ একদিন চমক ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার কোনও হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যাহা নিজের চেষ্টালব্ধ নহে, তাহাকেই বলা হয় 'বরণ'; তাহাই আত্মার 'কৃপা'। কি একটা খেয়ালের বশে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বদ্ধ সাজিয়া মজা করিতেছিলাম; হঠাৎ আবার খেয়ালের বশেই ইন্দ্রজালের মোহটা সরাইয়া ফেলিলাম। গাছের শাখাপল্লবের অন্তরালে ছায়ার মধ্যে পাখী বসিয়া থাকে; সে যেন ডালের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে; আমার সহস্র চেষ্টাতেও সে আমার চক্ষুগোচর হয় না; হঠাৎ সে যখন চোখে পড়িয়া গেল, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখন আর কোনও দ্বিধা থাকে না। এ ব্যাপারটাও যেন কতকটা সেইরূপ। সহস্র চেষ্টাতেও মুক্তি ঘটে না; আবার অকস্মাৎ ঘটিয়া যায়। কাজেই চেষ্টাটা মুক্তির immediate কারণ নহে; চোখে পড়াটাই তাহার immediate কারণ। সেইরূপ

আমি বদ্ধ নহি ; আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটা মজা করিতেছি ; আমার স্বরূপদর্শন সেই বদ্ধাবস্থার সহস্র চেষ্টাতেও ঘটে না, আবার অকস্মাৎ ঘটিয়া যায়। এই ঘটিয়া যাওয়ার ব্যাপারটারই নাম—বরণ। এই বরণও আমার স্বেচ্ছাকৃত ; আত্মারই অর্থাৎ আমারই free choice ঘটিত ব্যাপার। ইচ্ছামতে আমি বদ্ধ থাকি, আবার ইচ্ছামতেই হঠাৎ মোহের আবরণটা, অবিদ্যাটা সরাইয়া দিই। কোনও হেতুনির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার ভিতর এই element of incalculability আছে ; কাজেই ইহাকে বরণ—election নাম দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ বদ্ধ থাকি, ততক্ষণ জানিতে পারি না, কবে কিরূপে মুক্তি ঘটিবে,—মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সাধনার পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই মাত্র ; অকস্মাৎ আমারই—চিরমুক্ত পুরুষেরই—খেয়ালে বন্ধন-দশা কাটিয়া দিই। বদ্ধের ভাষায় ইহাকে বলা হয় আত্মারই কৃপা, বরণ, grace, election।

# ৫

রামেন্দ্র বাবু বলিতে লাগিলেন :—

"কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি ; স্বর্গ নরক দুই ছাড়িয়া বহুদূরে পড়িয়াছি ; ফিরিবার চেষ্টা করা যাক্।

"বলা বাহুল্য যে খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব বেদান্তের মুক্তি বাঞ্ছা করেন না ; এ কথা তাঁহারা স্পষ্টই বলেন। 'আমি ভগবান্'—এ কথা খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব এ কথা বলিতে সাহস করেন না ; অন্যে বলিলে চমকিয়া উঠেন। বৈদান্তিক একজীববাদী ; খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব বহুজীববাদী। বৈদান্তিক বলেন—আমিই একমাত্র জীব, আর কোনও জীব নাই ; এবং আমিই একমাত্র ঈশ্বর, আর কোনও ঈশ্বর নাই ; অন্য জীবের বা অন্য ঈশ্বরের কল্পনাই ভ্রান্তি ; ঐ কল্পনা না করাই মুক্তি। কিন্তু খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব মনে করেন যে আমা ছাড়া আমার মত আরও অনেক জীব আছে, এবং সকল জীব হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন; সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সেব্যসেবকরূপ সম্পর্কে থাকিব, বা অন্য কোনও রূপ সম্পর্কে থাকিব ; সে সম্পর্ক লুপ্ত হইবার নহে ; তাঁহার কৃপায় সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠরূপে স্থাপিত হইলেই আমাদের উদ্ধার হইবে। ইহাকে উদ্ধারলাভ বা salvation বলা যাইতে পারে ; ইহা বেদান্তের মুক্তি নহে ; বেদান্তের মুক্তি ইঁহাদের অগ্রাহ্য। খ্রীষ্টান এবং বৈষ্ণব বলেন—বেদান্তের অদ্বয়বাদের সঙ্গে আমাদের সনাতন বিরোধ। কিন্তু বেদান্ত বলিবেন,—আমার কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই ; কোনও কল্পিত জীব যদি কোনও ঈশ্বর কল্পনা করিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া, বা তৎপ্রতি

প্রীতি অর্পণ করিয়া আনন্দ পায়, আমার তাহাতে চঞ্চল হইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

"খ্রীষ্টান এবং বৈষ্ণবের মধ্যে এই সাদৃশ্য ত আছেই, উভয়ের উপাসনা পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের এবং খ্রীষ্টের বাল্য লীলাতেও নানা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কে কাহার নিকট ঋণী এই প্রশ্ন উঠে। খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা বলাই স্বাভাবিক যে বৈষ্ণবেরাই ঋণগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে যাহা কিছু খ্রীষ্টের সাদৃশ্য তাঁহারা দেখিতে পান, সবই তাঁহারা post-christian বলিয়া ধরিয়া লয়েন। গীতা এবং বাইবেলের বহু উক্তি পাশাপাশি রাখিয়া বলা হইয়াছে যে গীতা এই সকল জিনিষ বাইবেল হইতে লইয়াছেন; অতএব গীতার রচনাকালও বাইবেলের পরে। মহাভারতের যে অংশে নারদের শ্বেতদ্বীপ গমনের বর্ণনা আছে, উহা post-christian বলা হয়। বৌদ্ধ কিম্বা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া একটা common source আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না বলা হয় না। খ্রীষ্টানের নিকট হইতে বৈষ্ণব কিছুই গ্রহণ করে নাই, এ রকম negative proposition প্রমাণ করাই কঠিন; আমি সে কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। বাক্‌ত্রীয় গ্রীকদিগের মধ্যে নাকি গণ্ডোফারিস প্রভৃতি নরপতি খ্রীষ্টান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাক্‌ত্রীয়ায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; সেখান হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভারতবর্ষে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহারও বহুপূর্ব্বে যে এ দেশে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালের ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ কি রকম ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু উহা নিঃসন্দেহ religion of redemption ছিল। অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণে দ্রাবিড়দেশে St. Thomas খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, এরকম একটা কিংবদন্তী আছে;

এবং সেই সময় হইতে সে অঞ্চলে একটা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ছিল, ইহাও অনেকে অনুমান করেন। বহুশতবর্ষ পরে রামানুজাদি আচার্য্য দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা নূতন গঠন দিয়াছিলেন; তাঁহারাও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াছেন, এ রকম একটা পাশ্চাত্য মত আছে। ডাক্তার শীল ও তদ্রূপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানের নিকট বৈষ্ণবের এই ঋণ গ্রহণের প্রমাণ কতদূর বলবৎ তাহা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। বোধ করি এ সম্বন্ধে কোনও চরম সিদ্ধান্ত প্রচারের এখনও সময় আসে নাই।

"কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টবিষয়ক সাদৃশ্যের মধ্যে একটা কথা আছে, সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না;— সেটা শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব লইয়া। গো, গোপ, গোপী বাদ দিলে বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভাব বড় কিছু থাকে না। এখন প্রশ্ন উঠে, কৃষ্ণের গোপালত্বের মূল কোথায়? কালিদাস মেঘদূতে নারায়ণের গোপালবেশের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই খ্রীষ্টের পূর্ব্বে কি পরে ছিলেন, তাহা লইয়া যখন বিবাদ চলিয়াছে; তখন এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা চলে না। মহাভারতে শিশুপালবধপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের যে নিন্দাবাদ আছে, সে উক্তিকেও যদি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাঁহাকেও নিরস্ত করা কঠিন। বৃন্দাবনেই হউক, আর গোলোকেই হউক, গাভী ছাড়া কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। এখন আশ্চর্য্য এই যে, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টকেও shepherd বিশেষণ দেন। এখন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘকে খ্রীষ্টের flock বলা হয়। কৃষ্ণের ভয়ে কংস দেবকীর সন্তানদিগকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা হেরডও সেইরূপ ভবিষ্যতে King of the Jews তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন এই আশঙ্কায় শিশুহত্যা করিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রে কারাগৃহে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম; বসুদেব কংসের ভয়ে সেই

শিশুকে স্থানান্তরিত করিয়া গোকুলে গোপগৃহে লুকাইয়া রাখেন; সেখানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ একদিন তিনি মথুরায় আত্মপ্রকাশ করিয়া যাদবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টের সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, হেরডের ভয়ে সসত্বা মেরীকে লইয়া জোসেফ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। বিদেশে গুহা মধ্যে খ্রীষ্টের জন্ম হয়। আর কেহ সে ঘটনা জানিত না। কতকগুলিমেষপালক সে প্রদেশে উপস্থিত ছিল; তাহারাই সে সংবাদ প্রথমে জানিতে পারে। বহুদিন পরে একদিন হঠাৎ খ্রীষ্ট ইহুদীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিতে চাহিলেন; অনেকে তাঁহাকে King of the Jews বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যেখানে গো এবং গোপ, খ্রীষ্টের পক্ষে সেখানে মেষ এবং মেষপালক। এই সাদৃশ্যেরই বা তাৎপর্য্য কি?

"উভয় আখ্যায়িকার মধ্যে এই সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। মজা এই, খ্রীষ্টানেরা যেরূপ Old Testament মধ্যে খ্রীষ্টের অবতার সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদুক্তি দেখিতে পান, বৈষ্ণবেরাও সেইরূপ বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে নানা উক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহুদী বাইবেলের prophet বা নবিগণ,—যাঁহারা ইহুদী জাতির ইতিহাসে ঋষিস্থানীয়,—তাঁহারা না কি যীশুখ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলা করিবেন, তাহার অনেক কথাই পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে গণ্য হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে দেখিবেন, হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঋগ্বেদ সংহিতার বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার ব্যাখ্যা দিয়া দেখাইতেছেন যে ঐ বেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক কথা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। এমন কি পুতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, তৃণাবর্ত্ত বধ, কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ঘটনার কথাও ঋগ্বেদের সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। তাহা বেদের মন্ত্র তুলিয়া দেখান হইয়াছে। সে যাহাই হউক,

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গো ও গোপের যে সম্পর্ক, খ্রীষ্টের সহিত মেষ ও মেষপালকের কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যায়। খ্রীষ্টের তিরোধানের পরেই সে সম্পর্ক আবিষ্কৃত দেখা যায়। Apostle Peter তাঁহার প্রথম Epistle মধ্যে খ্রীষ্টকে Lamb ও Shepherd দুই বিশেষণ দিয়াছেন। এই সাদৃশ্যেরই বা তাৎপর্য্য কি ?

"ভারতবর্ষে গাভীর যে স্থান, ইহুদীর মধ্যে মেষের হয়ত সেই স্থান ছিল ; ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের সঙ্গে গরুর ও ভেড়ার সম্পর্কের তাৎপর্য্য কি ? সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রভেদ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় গরু যতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, খ্রীষ্টের লীলায় মেষকে ততটা স্থান অধিকার করিতে দেখা যায় না। বৃন্দাবনে ধেনু চরানই তাঁহার দৈনন্দিন কাজ। কখনও তিনি কালিয়দমন করিয়া সেই ধেনু রক্ষা করিতেছেন ; কখনও রাক্ষসাদির আক্রমণ হইতে ধেনু রক্ষা করিতেছেন ; কখনও গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেবতার কোপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে গোপালক বা গোপাল। গোপ এবং গোপী ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার কারবার নাই। বৈষ্ণবেরা এই গোপালকেই তাঁহাদের উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহারা যে নিত্যবৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছেন,সে স্থানটার নামও গোলোক, এবং সেখানে তিনি গোপাল। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টের বাল্যজীবনে যে মেষ এবং মেষপালকের সম্পর্ক দেখা যায়, খ্রীষ্টানেরা তাহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলেন নাই। তৎসম্বন্ধে পরস্পরাবিরুদ্ধ কতকগুলি apocryphal কিংবদন্তী আছে মাত্র। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তিগঠনে তাহা তেমন আবশ্যক নহে। খ্রীষ্টের অন্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টান তাঁহার ধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন ; সেখানে খ্রীষ্ট Lamb of God বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে তিনি বিধাতার কাছে আপনাকে মেষরূপে বলি দিয়াছেন। ইহুদীদের ধর্ম্মানুসারে জাভের মন্দিরে

মেষবলি হইত। এও সেই বলিদানের ব্যাপার। এখানে তিনি আপনাকে মানবজাতির নিষ্ক্রয়স্বরূপে বলি দিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি মেষরূপী। এখানে তিনি মেষপালক নহেন, স্বয়ং মেষ। Apostle Peter এর ভাষায় খ্রীষ্ট নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ মেষরূপী; তাঁহার পবিত্র শোণিতে মানবের নিষ্ক্রয় হইয়াছে; পাপ হইতে ত্রাণ হইয়াছে। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—fore-ordained before the foundation of the world। খ্রীষ্টের এই মেষত্বের সহিত বেদের যজ্ঞের theory'র সম্পর্ক থাকিতেপারে; সেই যজ্ঞের theory আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৃন্দাবন লীলার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। পীটার খ্রীষ্টের অন্ত্যলীলা প্রসঙ্গেই তাঁহাকে Shepherd বলিয়াছেন; মানবরূপী sheep বা মেষগণ দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথ ভ্রষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্ট shepherd রূপে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। এই shepherd অর্থে পরক্ষণেই বলা হইয়াছে, তিনি Shepherd and Bishop of your souls; এই বিশপের অর্থ overseer বা অধ্যক্ষ; অতএব পালক। খ্রীষ্টকে যে এইরূপে মেষপালক বলা হইল, ইহুদী জাতির প্রচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোনও তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। গ্রীক দর্শন হইতেও ইহার মূল তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। এই ideaটি উহাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। এখন প্রশ্ন উঠে শ্রীকৃষ্ণে গোপালত্ব অর্পণেরই বা তাৎপর্য্য কি?

"এ কালের প্রত্নতত্ত্ববিশারদ কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে পুরাণে আভীর জাতীয় রাজার উল্লেখ আছে; যবন, শক, হূণ, পহ্লব, গুর্জ্জরাদি জাতির মত ইহারাও ভারতবর্ষে আগন্তুক জাতি,—বাহির হইতে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হয়ত ইহাদিগের tribal god কুলদেবতা ছিলেন। ইহারাই এ দেশে ইহাদের দেবতাকে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছে। এ theory'র একটা চটক আছে

বটে ; কিন্তু কোনও নবাগত গোপজাতির নিকট হইতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ তাহার সর্ব্বপ্রধান দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মনে করাই কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের গোপলত্বের প্রাচীনতা যতই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্ত্তমান সংস্করণকে আধুনিক বলিলেও, মূল মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করেন না ; কৃষ্ণবর্জ্জিত মহাভারত কল্পনারই অগোচর। পাণিনি-সূত্রমধ্যে যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যখন দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, সে কৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষির নিকট পুরুযযজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেখানে এই যজ্ঞের যে বিবরণ পাওয়া যায়, ভগবদ্গীতার অনেকটা অংশ তাহারই commentary বা ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ঐ যজ্ঞব্যাপারে মানুষের সমুদয় জীবনটাকে দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। জীবনের কোন্ অংশ প্রাতঃ-সবন, কোন্ অংশ মাধ্যন্দিন সবন, কোন্ অংশ তৃতীয় সবন, তাহা খুলিয়া বলা হইয়াছে। সমস্ত জীবনটাকে, জীবনের যাবতীয় কর্ম্মকে, ত্যাগে পরিণত করিয়া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—যজ্জুহোসি যদশ্নাসি যৎকরোসি দদাসি যৎ···তৎকুরুষ্বমদর্পণং—জীবনে যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, আমাকেই অর্পণ করিবে। গীতায় এই তত্ত্ব খুব ফলাইয়া তোলা হইয়াছে ; কিন্তু উহা সেই পুরুষযজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; ইহাই কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তান্ত্রিকেরা এ কথাটা গ্রহণ করিয়াছেন,—যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্। বোধসার নামক খাঁটি বৈদান্তিক গ্রন্থের শেষভাগে সুখই পরাপূজা, দুঃখই পরাপূজা, রোগ পরাপূজা ইত্যাদি যে কয়টি অপূর্ব্ব বাক্য আছে, তাহার মূল এইখানেই পাওয়া যায়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের

তুলনামূলক তাঁহার বহুগবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের শেষভাগে বোধসারের এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—বোধ করি কোনও ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। বস্তুতঃ ইহার তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি ইহাকে খাঁটি বৈষ্ণব আদর্শ বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার উক্তি সত্ত্বেও একালের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাকে চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কেন না ইহাতে কর্ম্মকে পূজা বলিয়া গ্রহণ করিবার কথা আছে। বৈষ্ণবের চোখে এই পূজাকর্ম্মটা সেবাকর্ম্মের ও প্রীতির তুলনায় অনেকটা হীন। পূজা কর্ম্মে পূজ্যপূজকের মধ্যে যে ব্যবধান আসে, মধুররসাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব সে ব্যবধান স্বীকারে কুণ্ঠিত। বস্তুতঃ বোধসার বৈষ্ণবের গ্রন্থ নহে; উহা খাঁটি বেদান্তের গ্রন্থ। সাধারণ গৃহস্থ হিন্দু কিন্তু ইহাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। গৃহস্থের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই এই আদর্শ মনে রাখিয়া সম্পাদন করিতে হয়, এবং প্রত্যেক ceremonial অনুষ্ঠানই 'এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু' বলিয়া সমাপ্ত করিতে হয়। প্রাতে উঠিয়াই বলিতে হয়, আমি 'ভবদাজ্ঞয়া' এবং 'তব প্রিয়ার্থং' সংসার যাত্রা অনুবর্ত্তন করিতে চাহি।

"ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে বিষ্ণুর গোপা বিশেষণ রহিয়াছে। এই গোপা শব্দের অর্থ গোপনকর্ত্তা, বা রক্ষাকর্ত্তা, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। সেই অর্থ ঠিক হইলেও ইহার মধ্যে কোনও রকম pun আছে কিনা—অর্থাৎ গোপা অর্থে গোপাল বা গোরক্ষক বুঝায় কিনা, ইহা এতকাল পরে বলাই কঠিন। গোপার অর্থ যাহাই হউক, বেদে গো শব্দের অর্থে কোনও গোল নাই। বেদের অর্থ বুঝিতে নিরুক্তকারগণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সে কালে অনেক নিরুক্তকার ছিলেন; কিন্তু আমরা কেবল যাস্কের নিরুক্ত পাইয়াছি, আর সব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাস্কের নিরুক্তের প্রারম্ভে নৈঘণ্টুককাণ্ডে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের synonyms দেওয়া আছে।

ঐ তালিকার প্রারম্ভেই গো শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে! নিরুক্তের একেবারে আরম্ভেই গো শব্দটি স্থান পাইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায়, বৈদিক সাহিত্যে গো শব্দটি কত উচ্চস্থান অধিকার করিত। দেখিতে পাই যে গো শব্দের অর্থে ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্, ভারতী, সরস্বতী, ইড়া, ইত্যাদি একুশটি নাম দিয়া বলা হইতেছে, ইতি একবিংশতি বাঙ্‌নামানি অর্থাৎ এই একুশটি নামের অর্থ বাক্। অতএব গো, এমন কি ধেনু-শব্দের অর্থ যে বাক্ বা শব্দ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। এই বাক্ বৈদিক ঋষির কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তের ঋষি বৃহস্পতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন, —চিত্তের গুহার ভিতরে লুক্কায়িত শরীরহীন ভাবগুলি কিরূপে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া বাক্ অর্থাৎ শব্দরূপে প্রকাশ পাইতেছে! এ সূক্তটীর তাৎপর্য্য বুঝিলে বেদবিদ্যার অনেক কথা বুঝা যায়।

"এই বাগ্‌দেবতার কথা আমি পূর্ব্বেও আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি। দেবীসূক্তে এই বাক্ অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিতা হইয়াছেন; এই বাক্‌ই যে ব্রহ্ম, সেখানে সে কথা স্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শব্দ—ব্রহ্মবাদের গোড়া এখানেই ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম এই বাক্‌রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং এই বাক্‌কে অবলম্বন করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহারই নামান্তর গো বা ধেনু। ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ; এই জন্যই বাগ্‌দেবতার সহিত অমরতার সম্পর্ক। দৃষ্টান্তবাহুল্যের দরকার নাই। বাক্ এবং গো উভয়েই এক। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উভয়ের স্থান কি?

"শ্রৌতকর্ম্মের মধ্যে দ্বাদশাহযজ্ঞ নামে একটা বড় সোমযজ্ঞ ছিল। প্রজাপতি নাকি এই যজ্ঞদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ বার দিনে সম্পন্ন হইত। ঐ বার দিনের মধ্যে নয় দিনে তিনটি অনুষ্ঠান ছিল;

প্রত্যেকটির নাম ত্র্যহ ; পর পর তিন দিনে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া ইহার এই নাম। সংবৎসরসাধ্য সত্রের মধ্যেও এইরূপ ত্র্যহের অনুষ্ঠান অনেক ছিল। এই ত্র্যহ অনুষ্ঠানের মধ্যে দুই দিনের দেবতা যথাক্রমে বাক্ এবং গো ; বাক্ এবং গো, একই দেবতার দুই নাম, আরও বহুস্থলে দেখা যায়। আর একটি আখ্যায়িকা উল্লেখযোগ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে,—সোম এককালে গন্ধর্ব্বদিগের নিকটে ছিল ; দেবতারা সেখান হইতে সোম আনিবার জন্য কুমারী বাগ্‌দেবতাকে প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা অত্যন্ত স্ত্রীকামী। তাহারা বাগ্‌দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার হাতে সোম দিল। বাগ্‌দেবতা তাহাদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিয়া দেবতাদিগকে দিলেন, এবং নিজেও পলাইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অনুকরণে প্রত্যেক সোম-যজ্ঞের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইত। এই অনুষ্ঠানের নাম সোমক্রয়। একটা লোক সোমলতা লইয়া যজ্ঞভূমির বাহিরে বসিয়া থাকিত ; যজমান ঋত্বিকদের সহিত একটি গাভী লইয়া তাহার কাছে গিয়া বলিতেন—'এই গাইটি লইয়া তোমরা সোম বিক্রয় কর।' সেই সোম-বিক্রেতা দাম লইয়া খানিকটা দোকানদারি করিত ; অবশেষে গাইটি লইয়া সোম দিত। তখন যজমান ও তাহার অনুচরেরা ঠ্যাঙ্গা বাহির করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া ও প্রহার করিয়া গাভীটিকেও ফিরাইয়া আনিত। ঐ সোম বিক্রেতা গন্ধর্ব্ব ; গাভীটি বাগ্‌দেবতা ; এবং যজমান দেবগণের স্থানীয়। অতএব গাভীটি বাগ্‌দেবতারই পার্থিব মূর্ত্তি। গন্ধর্ব্ব ঠকিয়া গেল ; বাগ্‌দেবতা সোম লইয়া দেবতার কাছে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ক্রীত সোমলতার রসে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত। আহুতির পর সেই সোমের শেষ পান করিয়া যজমান ও ঋত্বিকগণ অমর হইতেন। এই বাক্ই শব্দ, শব্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বেদ, ব্রহ্মজ্ঞানের বা বেদের যিনি রক্ষক তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; আবার শব্দ বা বেদ হইতে

জগৎ সৃষ্ট। আমরা যখন নারায়ণকে প্রণাম করি, তখন বলিয়া থাকি—নমো ব্রহ্মণ্যদেবতায়, ইনি ব্রহ্মণ্যের দেবতা। পরে বলিয়া থাকি গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ;—এখানে গোশব্দে গরু এবং ব্রাহ্মণ শব্দে জাতিবাচক ব্রাহ্মণ এই সঙ্কীর্ণ অর্থে আবদ্ধ থাকার দরকার নাই। এখানে গো=বাক্=বেদ; এবং ব্রাহ্মণ বেদের বক্তা, ব্যাখ্যাতা এবং রক্ষক। এখানে গো সমুদয় জগতের প্রতিনিধিস্বরূপ, এবং ব্রাহ্মণ সমুদয় জীবের প্রতিনিধিস্বরূপ, এইরূপ ব্যাপক অর্থগ্রহণে ক্ষতি দেখি না। গোশব্দের নামান্তর পৃথিবী, ইহাও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাস্কের নিরুক্তে পৃথিবীর নাম গো, ইহাও পাইবেন। শব্দ হইতেই জগতের বা পৃথিবীর সৃষ্টি, ইহা স্মরণ রাখিবেন। জগৎ materialised শব্দ মাত্র। গো-ব্রাহ্মণহিতায় বলিয়া পরক্ষণেই খোলসা করিয়া বলা হইতেছে—জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়; এদেশে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা কিরূপে সকল পাতকের উপর স্থান পায়, ইহাও কতক বুঝা যাইবে। আরও দেখিবেন, গোহত্যা আগে; ব্রহ্মহত্যা পরে।

"গাভী আমাদের দেবতা, ভগবতী। ঋগ্বেদের মন্ত্রেও তাঁহার অঘ্ন্যা অর্থাৎ অহন্তব্যা এই বিশেষণ দেখিতে পাই। Totemism হইতে এদেশে গাভীর মাহাত্ম্য বুঝা যায় কি না, সন্দেহ। যে সকল অসভ্য জাতি কোনও একটা জন্তুকে totem বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা সেই জন্তুকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে; আপনাদিগকে তাহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়; সেই জন্তুকে দেবতা বলিয়া জানে; সেই জন্তুর অনুকরণে বেশ ভূষা আচার পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করে; ভক্ষ্য মধ্যে সেই জন্তুর মাংসকেই বর্জ্জন করে। কেহ বা দেবতার সহিত একত্বপ্রাপ্তির আশায় সেই জন্তুর মাংসই খায়। কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত এই সব আচারের তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া যায়; ক্রমে আচারও পরিবর্ত্তিত ও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে গাভীর ইতিহাস অন্যরূপ। অঘ্ন্যা বিশেষণ থাকিলেও যজ্ঞকার্য্যে বা

অতিথিসৎকারে গবালম্ভ নিষিদ্ধ ছিল না। সেদিন পর্য্যন্ত ভবভূতি তাঁহার নাটকের মধ্যে,—যে নাটক জনসাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইত সেই দৃশ্য-কাব্যে—বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া বাছুর খাইয়াছিলেন, এই বাক্য বলাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। এখনকার কোনও নাটককার বা অভিনেতা কোনও ঋষির মুখে এমন কথা বসাইলে বিপন্ন হইবেন। বাড়ীতে বর আসিলে তাঁহাকে মধুপর্কের দ্বারা সম্মান করিতে হইত। এই মধুপর্কে গোমাংসের ব্যবস্থা ছিল। নাপিত গাভী আনিয়া এই কার্য্যটা সম্পন্ন করিত। কালক্রমে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। নাপিত বরকে গাই দেখাইয়া ছাড়িয়া দিত, এই প্রথা দাঁড়াইয়া গেল। এখন বিবাহে বর আসিলে নাপিত কেবল গৌর্গৌঃ শব্দ উচ্চারণ করে। তাহার পর বর গাভীটিকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দেন। গাভীর মাহাত্ম্য এদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। অসভ্যজাতির মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান totemistic, তাহা সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত এত বিকৃতি ও পরিণতি লাভ করে, যে তাহার মূল আবিষ্কার কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। গাভী কোনও কালে totem ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কেহ পারিবেন না। তবে আর্য্যজাতির যে শাখার মধ্যে গাভী সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, সেই শাখা আপনাকে গাভীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ সাহিত্য মধ্যে আছে কিনা জানি না। আর্য্যজাতির অন্যান্য শাখা গাভীকে এইরূপ সম্মান দেন নাই। আমরা গাভীকে মাতা ভগবতী বলিয়া থাকি; কিন্তু সেখানে মাতা অর্থে জগন্মাতা,—কেবল আর্য্যজাতির বা বেদপন্থী আর্য্যজাতির মাতা নহেন। আমাদের গো-দেবতা যদিও totemism এর survival হয়, তাহার মূল আবিষ্কার এখন দুঃসাধ্য। বৌদ্ধ ও জৈন কর্ত্তৃক অহিংসাধর্ম্ম প্রচারের পর হইতে যজ্ঞে গোহত্যা নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা অনেকটা সত্য; কিন্তু যজ্ঞে হিংসা এখনও অন্য পশুর পক্ষে রহিয়াছে। পূর্ব্বের মত না থাকিলেও একেবারে নিষিদ্ধ

হয় নাই ; বরং বৌদ্ধধর্ম্ম অনার্য্য অনুষ্ঠানগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া অনার্য্যজাতিদিগকে তুলিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্বেও পশুহিংসার প্রশ্রয় দিয়া ফেলিয়াছেন। মনে রাখিবেন, একালে বৈদিক ক্রিয়ায় পশুহত্যা নাই বলিলেই হয় ; যাহা আছে তাহা তান্ত্রিক শক্তি পূজায় ; এবং নানা public shrine বা পীঠস্থানে। বৈদিক যজ্ঞে পশুর বলিদান হইত,—পশুকে নিজের নিষ্ক্রয়স্বরূপ অর্পণ করিয়া দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের উদ্দেশে। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় শক্তি পূজায় পশুর বলিদান হয়—দেবতা প্রসাদনের উদ্দেশে। বৈদিক যজ্ঞের আহুতিতে পশুর রুধির সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ; উহা কোনও দেবতাকে দিতে নাই ; উহা রাক্ষসের ভাগ। তান্ত্রিক বলিদানে সমাংস রুধির নিবেদন করিতে হয়। কেন না দেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। হিন্দু তান্ত্রিকতা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার নিকট কতটা ঋণী, তাহা এখনও সম্যক মীমাংসিত হয় নাই। হিন্দুর public shrine গুলির বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক কত নিকট ছিল, তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এইরূপ public worship কোনও কালেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিত না ; আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলেই উহা বুঝা যায় ; বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় অগত্যা যেন উহাদিগকে recognise করিতে হইয়াছে। যে সকল অনুষ্ঠানের জন্য আজ কাল হিন্দুসমাজ গালি খান, তাহার কতগুলির জন্য অনুদার হিন্দু দায়ী, আর কতগুলির জন্য উদারপ্রকৃতি বৌদ্ধ দায়ী, তাহার ঐতিহাসিক বিচারের সময় আসিয়াছে।

"ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে গাভীর মাহাত্ম্য অধিক হইবে এবং গাভী অহন্তব্যা বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কৃষিকার্য্যের আনুকূল্যের জন্য গাভী এবং বৃষ উভয়ই এদেশে এত সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহাতে সংশয়ের হেতু নাই। শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কার্য্য উপলক্ষে বৃষোৎসর্গের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য যে গোজাতির বংশ রক্ষা—

breed রক্ষা, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। বৃষোৎসর্গের পদ্ধতির আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঐ কর্ম্মে চারিটি বৎসতরীর সহিত একটি বৃষকে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। যে মন্ত্রে উৎসর্গ করা হয়, তাহাতে বলা হয়,—ওহে বৃষ, তুমি চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী। এই চারিটি বৎসতরীর সহিত তোমাকে লোকহিতার্থ আমি ত্যাগ করিলাম ; তুমি স্বচ্ছন্দভোজন করিয়া ইহাদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াও ; তোমাদের উপর আমার আর কোনও স্বত্বাধিকার থাকিল না ; দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও ভূতগণের পোষণের জন্য তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। কর্ম্মান্তে উপস্থিত জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়,—আমি যে এই বৃষকে ও গাভীগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম, কেহ ইহাদের উপর কোনও স্বত্বার্জ্জনের চেষ্টা করিও না, বৃষকে চাষে খাটাইও না ; গাভীদিগের দুগ্ধ পান করিও না।—এই বৃষোৎসর্গ বৈদিক ক্রিয়া ; বৈদিক কর্ম্মকে ইষ্ট ও পূর্ত্ত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ইহা পূর্ত্ত কর্ম্মের অন্তর্গত—public works এর সামিল ; লোকহিত ইহার উদ্দেশ্য ; সঙ্গে সঙ্গে নিজের বা পিতৃপুরুষের পারলৌকিক হিতের প্রলোভন থাকে। এই কৃষিপ্রধান দেশে বহুশত বা বহুসহস্র বৎসর হইতে, scientific cattle breeding জন্য কোনও রূপ ব্যবসায় বা profession না থাকিলেও বিনা আয়োজনে এইরূপ গোবংশ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অতি সামান্য গৃহস্থও এখনও বৃষোৎসর্গকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, এবং ধর্ম্মের ষাঁড়ের গায়ে হাত দিতে কোনও হিন্দু সাহস করে না।

বৃষকে এখানে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাকে গোপতি, ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি জমকাল বিশেষণে সম্বোধন করা হয়। মন্ত্রগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে রুদ্র দেবতার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক। বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠানে যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতরুদ্রিয় নামক মন্ত্রাবলি পাঠ করিতে

হয়; ঐ মন্ত্রসমূহে রুদ্রের স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আছে। বৃষোৎসর্গে যে হোম হয়, তাহার প্রধান দেবতা রুদ্র; রুদ্রের উদ্দেশে চরু পাক করিয়া আহুতি দেওয়া হয়। কতক চরু পূষানামক দেবতাকেও দিতে হয়। বেদে রুদ্রও পূষা এই দুই দেবতার সহিতই পশুগণের বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। যাহা হউক, বৃষের সহিত রুদ্রের বা মহাদেবের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। শিবলিঙ্গের পার্শ্বস্থ বৃষকে প্রণাম করিবার সময় বৃষকে ধর্ম্মরূপী বলিয়া এবং অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রণাম করার রীতি আছে। এই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের বিশ্বরূপ বা জগৎরূপ। বিশ্বজগৎ ধর্ম্মকর্ত্তৃক ধৃত আছে বা ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত আছে, ইহা অতি প্রাচীন কল্পনা। মহাদেবের বৃষবাহনত্ব, বৃষধ্বজত্ব, বা বৃষ চিহ্ন সম্বন্ধে যে astronomic মূলের অনুমান করিয়াছি, তাহার সহিত এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধ কল্পনা অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে যে সকল myth এর কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে, পৌরাণিকেরা তাহার সমন্বয় বা synthesis করিয়া একটা নূতন রূপ দিয়াছেন। পুরাণের নানা আখ্যায়িকাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশ মণ্ডলে Taurus বা বৃষরাশির পার্শ্বেই মৃগব্যাধ বা রুদ্র তারকার অস্তিত্ব দেখিয়া এইরূপ কল্পনার hint আসিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক মূল যাহাই হউক, ঐরূপ কল্পনা আমাকে অনেকটা অভিভূত করে। কতদিন রাত্রিকালে নীল আকাশের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ঐ কল্পনায় আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, উত্তরে বিষ্ণুপদ বা Pole এর নিকট হইতে নিক্রান্ত হইয়া Milky Way বা আকাশগঙ্গা Cepheus এবং Cygnus নামক constellation বা তারকা মণ্ডল অতিক্রম করিয়া দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন; অন্যদিকে Cepheus হইতে Cassiopeia এবং Perseus পার হইয়া Aurega মণ্ডলে পতিত হইতেছেন; সেখানে Capella নামক উজ্জ্বল তারা জলন্ত অগ্নিখণ্ডের

মত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে জ্বলিতেছে। আমার মনে হয় এই, Capella তারাই হয়ত একসময়ে অগ্নিতারা নামে পরিচিত ছিল; এখন অন্য তারার নাম অগ্নি; সম্ভবতঃ আধুনিক জ্যোতিষিরা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে স্থান সংশোধন করিয়া নিকটের আর একটি ছোট তারাকে অগ্নি নাম দিয়াছেন। এই গঙ্গাপ্রবাহেই অগ্নির তেজ নিক্ষিপ্ত হইয়া স্কন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অদূরে কৃত্তিকাগণ ( Pleiades ) সেই স্কন্দকে পালন করিয়াছিলেন; মৃগব্যাধ রুদ্র ( Sirius ) তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয় যে, এই স্কন্দদেবতা মঙ্গলগ্রহ ভিন্ন আর কেহই নহেন। আজি পর্য্যন্ত স্কন্দদেবতা মঙ্গলগ্রহের অধিপতি বলিয়া গৃহীত। স্কন্দের ও মঙ্গলের ধ্যানে উভয়ের বিশেষণ প্রায় সমান; পুরাণে মঙ্গল গ্রহের জন্মকথা প্রায় স্কন্দের জন্ম কথার অনুরূপ। এই অনুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে আমার মতে স্কন্দোৎপত্তির আখ্যায়িকা মঙ্গলগ্রহের আবিষ্কারবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে; মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত স্কন্দ কথা পড়িয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে। সে কথা যাক্। সেখান হইতে আকাশগঙ্গাকে অধোমুখে প্রবহমাণ দেখিতে পাই; প্রজাপতি Orion সেই গঙ্গাবারি কমণ্ডলুমধ্যে গ্রহণ করিতেছেন; ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে বাহির হইলে শুভ্রকান্তি রুদ্র Sirius তাহা জটামধ্যে ধারণ করিতেছেন। হরজটাভ্রষ্ট গঙ্গা সেখান হইতে দক্ষিণে যমলোকে বা পাতালপুরে গিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। এই কল্পনার প্রলোভন সংবরণ দুঃসাধ্য। উজ্জ্বল বৃষরাশিতে আরোহণ করিয়া রুদ্র Siriusকে যখন আকাশমণ্ডল দীপ্ত করিয়া চলিতে দেখি, অগ্রে পশ্চাতে দেবগণ তারকামূর্ত্তিতে সারি দিয়া চলিতেছেন দেখিতে পাই; তখন কুমারসম্ভবে বর্ণিত "খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ" ইত্যাদি মহাদেবের বরযাত্রাবিবরণ মনে আসিয়া আমি স্তব্ধ হই। আমাদের নিত্য পাঠ্য

মহিম্নঃস্তোত্রের "বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্গমরুচিঃ প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে" মহাদেবের এই দিব্যরূপ বর্ণনাও তখন আমাকে অভিভূত করে।

"গাভীর কথা হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি। কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতির পূজা হইবে ইহা স্বাভাবিক বটে; গো-মাহাত্ম্যের ইহা প্রধান একটা কারণ হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই theory হইতে সমস্ত বুঝা যায় না। মহিষও ত কৃষিকার্য্যে সহায়; মহিষের সাহায্য ত ফেলিবার নহে; তবে মহিষের সে সম্মান নাই কেন? মহিষের প্রতি এত অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কেন? মহিষমর্দ্দিনী মহিষের রক্তে প্রসন্না হন কেন? বলা হইবে মহিষহত্যা অনার্য্য অনুষ্ঠান; উহা কোনও রূপে বেদপন্থী সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। হইতে পারে; কিন্তু কৃষির খাতিরে নিষিদ্ধ হয় নাই কেন?

"মহিষের কথাটা যখন উঠিলই, তখন আরও দুকথা বলি। মহিষ-বলি কতকালের অনুষ্ঠান বলা কঠিন। পাষাণ নির্ম্মিত প্রচীন মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপেও নাকি পাওয়া গিয়াছে। বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতে (কোন্ স্থানে ঠিক মনে আসিতেছে না,—বোধ করি বিন্ধ্যাটবীতে প্রবিষ্ট হর্ষরাজার সম্মুখে উপস্থিত) শবরের বর্ণনায়—"মহিষানাং মহানবমীমহোৎসবমিব" এইরূপ একটা বিশেষণ আছে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা কাব্যে কুসুমপুর (পাটলীপুত্র) নগরের কাত্যায়নী দেবীর বিশেষণ "শুম্ভনিশুম্ভমহাবনদাবজ্বালা" ও "মহিষমহা-সুরগিরিবজ্রসারধারা" দেখিয়াছি মনে হইতেছে। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্য অবশ্যই ইহার মূল। চণ্ডীতে যে দেবী মহিষ বধ করিয়া-ছিলেন, তিনি যাবতীয় দেবতার তেজঃসমষ্টিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি ভগবতী দুর্গা, ইহাই ধরা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দোৎ-

পত্তির কথা খুলিয়া দেখুন। স্কন্দ কোন্ অসুরকে বধ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবে—তারকাসুর। কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে তারকাসুরের নাম নাই, মহিষাসুর আছে। এবং তাহাকে বধ করিলেন স্কন্দ; ভগবতী বধ করেন নাই। এ কি ব্যাপার? স্কন্দকর্ত্তৃক মহিষবধের আখ্যান এককালে চলিত ছিল সন্দেহ নাই। এই মহিষও কি রাশিচক্রের Taurus বা বৃষরাশি? স্কন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল আকাশগঙ্গার তীরে কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকটে; সে ত বৃষরাশিরই অন্তর্গত। আমার পূর্ব্ব অনুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে বলিব, মঙ্গল গ্রহের আবিষ্কার কালে দেখা গিয়াছিল, তিনি আবির্ভূত হইয়াই বৃষকে আক্রমণ করিলেন। দুইটা জ্যোতিষ্কের একত্র অবস্থানকে জ্যোতিষের পরিভাষায় যুদ্ধ বলে; দুইটা Planet এর conjunction এর নাম গ্রহযুদ্ধ। এও কি সেই যুদ্ধ ব্যাপার? মহিষাসুর ও তারকাসুর হয়ত অভিন্ন; তারক ও তারকা একই শব্দ—কিঞ্চিৎ লিঙ্গভেদ আছে মাত্র। তাহা হইলে মহিষ তারকামাত্র, বা একটা constellationএর নাম। মহিষকে Taurus ধরিলে যমের মহিষবাহনত্বও কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বৃষরাশিতে যখন বিষুবসংক্রমণ হইত, তখন এই বৃষের পরেই যমলোক বা পিতৃলোক অর্থাৎ রবিমার্গের দক্ষিণার্দ্ধ আরম্ভ হইত।

"এই অনুমানে প্রধান আপত্তি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, অতি প্রাচীন সাহিত্যে মেষ বৃষাদি রাশিগণের নাম নাই; নক্ষত্র চক্র আছে, রাশিচক্র নাই। যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থে রাশিচক্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে যবনের অর্থাৎ গ্রীকের প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান। রামায়ণাদিতে যেখানে রাশির নাম আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। উত্তর দিতে গেলে একটা common source খুঁজিতে হয়, কিন্তু তাহাও foreign source হইয়া দাঁড়ায়। বিস্ময় এই, মহাভারতের উপাখ্যান

পড়িলে যেন বোধ হয় এই স্কন্দ দেবতাটি কোনও বহির্দেশ হইতে আসিয়া জোর করিয়া আমাদের pantheon এ আসন লইয়াছেন; ইঁহার আবির্ভাবে ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বজ্রপ্রহারে স্কন্দকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বজ্র ব্যর্থ হইলে শেষে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি করিয়া লইলেন। দেবতাদের প্রার্থনামতে হরগৌরীর বিবাহ ফলে এই সেনাপতির জন্ম হইল,—এই সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী মহাভারতে নাই। স্কন্দ বড় ক্রূর দেবতা; তাঁহার অনুচর অনুচরীরা কেবলই উৎপাত করিত, ব্যাধি জন্মাইত, ছেলে খাইত। স্কন্দ যে গ্রহের অধিষ্ঠাতা, সেই মঙ্গলগ্রহ আজিও ক্রূর গ্রহ। আবিষ্কারকালে তিনি হয় ত সূর্য্যের উন্টাদিকে opposition এ ছিলেন, এবং সেই জন্য অতি উজ্জ্বল ছিলেন; সেই সময়ে তিনি বক্রগতিতে উন্টা পথে চলিতেন বলিয়া কি তাঁহার ক্রূরত্ব? পারসীকদের মিথ্র দেবতার কথা অনেকবার বলিয়াছি; ইউরোপে বহুস্থানে তাঁহার যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কোনও দেব বা দেবী বৃষহত্যা করিতেছেন। অনেকে অনুমান করেন, মিথ্র কর্তৃক এই বৃষহত্যা সূর্য্যের বৃষরাশিতে সংক্রমণজ্ঞাপক। মিথ্রের সহিত স্কন্দের, এবং শেষ পর্য্যন্ত স্কন্দের নূতন মাতা মহিষমর্দ্দিনীর, কোনও সম্পর্ক আছে কি? দেবগণের সমবেত শক্তি স্কন্দকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া দেবসেনারূপে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং সেই শক্তিরূপিনী দেবী স্কন্দের পালিকা মাতা রূপে অবশেষে স্কন্দের প্রধান কীর্ত্তিও আত্মসাৎ করিলেন না কি?

"গাভীতে ফিরিয়া আসা যাক্। হিন্দুয়ানির লক্ষণ কি, কাহাকে হিন্দু বলিব না বলিব, এই প্রশ্ন লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল। কোনও doctrine ধরিয়া হিন্দুর একতা নাই; এ বিষয়ে হিন্দু একেবারে স্বাধীন। practice বা আচার অনুষ্ঠান লইয়া যাহা কিছু ঐক্য আছে,

তাহাও দেশভেদে ও কালভেদে এত বিভিন্ন, যে এমন একটা আচার অনুষ্ঠান বাহির করা কঠিন, যাহা সকল হিন্দু মানিয়া চলিতেছে। যদি এরূপ কোনও লক্ষণ বাহির করিতে হয়, তাহা গো-সম্পর্কে। গরুর প্রতি সম্মানে সকল হিন্দু এক ; গোহত্যা ও গোমাংসভোজনে হিন্দু যতটা আঘাত পায়, দেবমন্দির ধ্বংসে ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসেও ততটা পায় না। এ বিষয়ে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এমন কি শিখ জৈন বৌদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক। বাঙ্গালী পাঞ্জাবী তেলাঙ্গীতে কোনও ভেদ নাই। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজ এইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বরং উত্তরোত্তর এই ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। বেদের গাভী রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের স্বসা ; পুরাণে তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের গৌরী। বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ভগবতী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গো—বাগ্‌দেবতা, অতএব ব্রহ্মস্বরূপিণী ; কেন না বাক্ = ব্রহ্ম। বাক্ = ব্রহ্ম এই তত্ত্বের উপর বেদপন্থী সমাজের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে এত জীব জন্তু থাকিতে গরুকেই বাগ্‌দেবতার symbol রূপে গ্রহণ করা হইল কেন ? উত্তরে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—ইহা আরও পুরাতনকালের totemismএর survival, অথবা Max-mullerএর mythology সম্বন্ধে theory আশ্রয় করিয়া বলিতে পারেন, ইহা confusion of meaning of words হইতে উৎপন্ন ;—অর্থাৎ ঘটনাক্রমে গোশব্দে বাক্য বুঝাইত, গরুও বুঝাইত, এই accident হইতে গাভী বাগ্‌দেবতার symbol হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মীমাংসা করিতে পারিব না।

"বেদ মধ্যেই পাইবেন, গাভীকে ইড়া, সরস্বতী, ভারতী বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে ; ভারতী এবং সরস্বতী আজ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবতার নামান্তররূপে স্বীকৃত হয়েন। ইড়া দেবতাকে এ কালের হিন্দুরা ভুলিয়া

গিয়াছেন। ইড়া নামে যে একজন দেবতা ছিলেন, এ কালের পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও তাহা বলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। ইড়া,—ভারতী ও সরস্বতীর নামান্তর; অতএব ইনিও বাগ্‌দেবতা। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে কতকগুলি সূক্তের নাম আপ্রীসূক্ত; সমস্ত সংহিতার মধ্যে এই সূক্তগুলি ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মণ্ডলেই এক বা একাধিক আপ্রীসূক্ত রহিয়াছে; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব প্রভৃতি বড় বড় ঋষিরা সকলেই এক একটি আপ্রীসূক্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যজমান যজ্ঞকালে আপন আপন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির আপ্রীসূক্ত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। অন্যান্য মন্ত্রের বিনিয়োগে এ রকম বাঁধাবাঁধি ছিল না। আপ্রীমন্ত্রগুলির বিশিষ্টতা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। আপ্রীয়ন্তে অনয়া ঋচা দেবাঃ,—দেবগণকে এতদ্বারা প্রীত করা হয়, এই অর্থে ঋক্ মন্ত্রের নাম আপ্রীমন্ত্র; প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারটি করিয়া মন্ত্র আছে। প্রধান যাগের পূর্ব্বে এগার জন দেবতাকে এই আপ্রীমন্ত্রদ্বারা আহুতি দিয়া প্রীত করা হইত। এই এগারজনের অধিকাংশকেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইঁহাদের নাম নরাশংস, তনূনপাৎ, দ্বুরঃ, উষাসানক্তা ইত্যাদি। এই এগারজনের মধ্যে একজনের তিন নাম,—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী; ইঁহারা একে তিন, তিনে এক। একই আপ্রীমন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইলেও ইঁহাদিগকে তিস্রঃ দেব্যঃ বলা হয়। ঋগ্বেদে ইঁহারা অত্যন্ত পরিচিত দেবতা। ইঁহারা বাগ্দেবতা হইতে অভিন্ন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সরস্বতী নদী কালে দেবত্ব পাইয়া এই সরস্বতী দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। সরস্বতীতীরেই বৈদিক সমাজতন্ত্র ও কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই নদীই বাগ্দেবতার বা বেদের মূর্ত্তিরূপে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারেন। কুরুপাঞ্চালগণ সেকালে এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে বেদপন্থী সমাজের প্রধান পুরুষ ছিলেন। কুরুবংশীয় ভরত রাজা দিগ্বিজয় করিয়া কৌরব-

দের আধিপত্য বহুদূর বিস্তার করেন, ইহার প্রমাণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেই রহিয়াছে। এই ভরতের সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ এবং মহাভারত নাম হইয়াছে। এই ভরতবংশের কুলদেবতাই হয় ত ভারতী নামে গৃহীতা হইয়া থাকিবেন। বাকি থাকেন ইড়া। ভরতবংশের আদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা ইড়াকে পাই। এই ইড়ার পুত্র পুরূরবাকে (বেদে যিনি ঐড়পুরূরবা) ভরতবংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। হইতে পারে ইড়া mythical figure; তিনিও ভরতবংশের কুলদেবতা রূপে ভারতীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা হইয়া থাকিতে পারেন। ঐতিহাসিক মূল যাহাই হউক, পরবর্ত্তীকালে এই তিন দেবতা বাগ্দেবতারই মূর্ত্তিভেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, গো তাঁহাদের সকলেরই symbol। যে গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত, সোম-ক্রয়ের পর সেই গাভীর পায়ের খুরচিহ্নে একখণ্ড সোনা রাখিয়া একটা আহুতি দেওয়া হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, যে ঋকমন্ত্রে আহুতি দেওয়া হইত, তাহাতে গাভীর ঐ পা ইড়ায়াঃ পদম্ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। অতএব ইড়া = বাক্ = গো।

"আপ্রীসূক্তের উল্লিখিত সরস্বতী ইড়া ভারতীর মধ্যে, সরস্বতীর ও ভারতীর নাম এখনও বজায় আছে; কিন্তু ইড়াকে কেহ চেনে না। অথচ বেদের মধ্যে ইঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞে যে গাভী দিয়া সোমক্রয় করিতে হইত, সেই গাভীর নাম ইড়া। বাগ্দেবতা সোম আনয়ন করিয়া দেবগণকে অমরত্ব দিয়াছিলেন; অতএব ইড়াও অমরত্বদায়িনী। সেকালে যজ্ঞমাত্রেই ইড়াভক্ষণ নামে একটা অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত। হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোনও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেবতাকে আহুতি দেওয়ার

পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, যজমান সেটুকু ভক্ষণ করিলে দেবতার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেকালে প্রত্যেক পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় দর্শ ও পূর্ণমাস নামে দুইটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইত। যজমানকে ইহা যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে হইত, নহিলে প্রত্যবায় হইত। এই দুই যজ্ঞে যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম পুরোডাশ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক জুহূনাহক কাঠের হাতাতে ঐ পুরোডাশ এক খানা লইতেন; তাহাকে ঘৃতসিক্ত করিয়া এবং কাটিয়া তাহার একখণ্ড আহবনীয় নামক অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন; অবশিষ্ট যেটুকু থাকিত, তাহা কয়েক খণ্ডে টুকরা টুকরা করা হইত। সেই অংশগুলি হবিঃশেষ। উহার মধ্যে যে টুকু প্রধান খণ্ড, সেই খণ্ডের নাম ইড়া। এই খণ্ড ভক্ষণের সময় একটু অনুষ্ঠানবাহুল্য ছিল। বেদীর উপরে কতকগুলি যজ্ঞপাত্র সাজান থাকিত; তাহার মধ্যে একটার নাম ছিল ইড়াপাত্র। পুরোডাশের ইড়ানামক খণ্ডটুকু সেই পাত্রে অধ্বর্য্যু গ্রহণ করিতেন। হোতা নামক ঋত্বিক কতকগুলা ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইড়ানামক দেবতাকে আহ্বান করিতেন। এই আহ্বানকর্ম্মের নাম ইড়োপাহ্বান। এই ক্রিয়ার পর অধ্বর্য্যু, হোতা, অগ্নীৎ এবং ব্রহ্মা এই চারি জন ঋত্বিকের সঙ্গে একত্র মিলিয়া যজমান ঐ ইড়া ভক্ষণ করিতেন। এই ইড়া ভক্ষণে যজমানের সহিত দেবতার একত্ব সাধিত হইত। দর্শ ও পূর্ণমাস ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় যজ্ঞে ইড়া ভক্ষণ না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। অতএব ইড়াই দেবত্বদায়িনী বা অমরত্বদায়িনী। যে কোনও দেবতার উদ্দেশেই আহুতি হউক না, অন্তে ইড়া ভক্ষণ করিতেই হইত। কেননা, দেবতা মাত্রই ইড়ার মূর্ত্তি-ভেদ; দেবতামাত্রই শব্দরূপী; দেবতামাত্রই বাগ্‌দেবতার প্রকাশ। ইড়া ভক্ষণে সকল দেবতার সহিতই একাত্মতা ঘটিত।

"খ্রীষ্টানের Eucharist এর কথা আগে বলিয়াছি। এই Eucharist এবং ইড়া একই জিনিষ। খ্রীষ্ট আপনাকে যজ্ঞিয় পশুরূপে আহুতি দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সকল খ্রীষ্টান যাজক সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে বাধ্য। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ইহাই সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান ও holiest mystery। মন্ত্রপূত রুটী খ্রীষ্টের মাংসে পরিণত হয়; যজমানেরা সেই রুটীখণ্ড, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ করিলে খ্রীষ্টের সহিত—অতএব ঈশ্বরের সহিত—একত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং অমরতা অর্থাৎ immortality লাভ করেন। ঐ রুটীর নাম Eucharist। ইহা বেদের ইড়া হইতে অভিন্ন। Eucharist রুটী bread or water; ইড়া বা পুরোডাশ খণ্ডও যবের বা চাউলের রুটি। উভয়ই যজমানের নিজের দেহের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়; উভয়েরই এক তাৎপর্য্য। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, এই Eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। আজকাল মানবতত্ত্ববিদেরা দেখিয়াছেন যে এ রকম অনুষ্ঠান অন্যান্য জাতির মধ্যেও আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমকালে পারসীকদের মিথ্র‌্পূজায় এইরূপ হবিঃশেষ ভক্ষণ প্রধান অঙ্গ ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় সমস্ত Empireএ, এমন কি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, মিথ্র‌্পূজা প্রসারলাভ করিয়াছিল। সেকালের খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা মিথ্র‌্পূজার মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখিয়া বলিতেন যে নিশ্চয়ই ইহা শয়তানের কারসাজি; শয়তান কেবল লোককে ঠকাইবার জন্য খ্রীষ্টীয় সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান এইরূপে অনুকরণ করিয়া মিথ্র‌্পূজার মধ্যে ঢুকাইয়াছে। মিথ্র‌্পূজা খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদীদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের যখন কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন ঋণগ্রহণের কথা তুলিলে খ্রীষ্টানেরা মিথ্র‌্পূজার নিকট ঋণী বলিতে হয়। আবেস্তাপন্থী পারসীক ও বেদপন্থী

আর্য্য অতি প্রাচীনকালে এক জাতি কিম্বা এক জাতির দুই শাখা ছিল। অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ইহাঁদের উভয়েরই সাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। পারসীকদের মিথ্র ও বেদের মিত্র যে এক দেবতা সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত, হয় ত বহু সহস্র, বৎসর পূর্ব্বে ইড়া-ভক্ষণ অনুষ্ঠান আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

"সম্প্রতি আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রৌত যজ্ঞ প্রায়ই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু বহু স্মার্ত্ত যজ্ঞ এখনও ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ইড়া-ভক্ষণ নামটা এখন হয় ত অনেক জানেন না; কিন্তু হবিঃশেষ ভক্ষণ স্মার্ত্তযজ্ঞেও করিতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই ইড়াভক্ষণ বা Eucharist ভক্ষণ আবিষ্কারের জন্য কাহারও প্যালেষ্টাইনে যাওয়া আবশ্যক ছিল বোধ হয় না।

"এই যে বাগ্দেবতা, যাঁহার নামান্তর শব্দ অথবা ইড়া অথবা গো, ইনি এক হিসাবে বেদপন্থীর সর্ব্ব প্রধান দেবতা। ইন্দ্রাদি দেবতার ত কথাই নাই; বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকেও যেন অনেক সময়ে ইহাঁর নিকট খাট বলিয়া মনে হয়। এই দেবতাটির তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গোড়ার ও শেষের কথা, ঋগ্বেদের সময় হইতে পুরাণ ও তন্ত্রের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাসটা একেবারে বুঝা যাইবে না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই এই দেবতাকে অবলম্বন করিয়া, এবং এই দেবতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কখনও দিন পাই ত সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে বলিব। গো নামক পশু সেই বাগ্দেবতার প্রতিরূপ বা symbol। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের মধ্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; বেদের মধ্যেই ইহাঁর অঘ্ন্যা বিশেষণ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই ইহাঁর

ভগবতী বিশেষণও পাইয়াছি। যাস্কের নিরুক্তে বাগ্দেবতার যে একুশটি নাম আছে, তাহার মধ্যে ইঁহার অন্যতম নাম 'গৌরী' দেওয়া হইয়াছে; এই গৌরী যে উত্তরকালে উপনিষদের উমা হৈমবতী'র সহিত মিলিত হইয়া আমাদের ভগবতী গৌরীতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না। উপনিষদের সেই উমা হৈমবতী ইন্দ্রাদি দেবতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা। সেখানে হৈমবতী অর্থ কেহ কেহ করেন, হেমালঙ্কার-ভূষিতা; এখন সকলেই বলিবেন, হিমবানের কন্যা। কেবল গৌরী কেন, গৌরীর মাতা মেনা বা মেনকার নামও নিরুক্ত মধ্যে একই স্থানে পাইবেন।

"এখন শ্রীকৃষ্ণকে কেন গোগোপগোপিকাকান্ত বলা হয়, কেন তাঁহার স্থানকে গোলোক বলা হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই গোলোক বাঙ্ময়লোক; বেদমতে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাক্ অর্থাৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিশ্বজগৎ মধ্যে যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর বা perception এর বিষয়, এমন কি যাহা কিছু কল্পনা-গোচর বা conception এর বিষয়, সে সমস্তই শব্দ হইতে জন্মিয়াছে। এই শব্দই বেদ, এবং এই শব্দই বেদের মন্ত্র। বেদপন্থীরা বলেন—দেবতা মাত্রই শব্দাত্মক বা মন্ত্রাত্মক; অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, যে কিছু দ্রব্য একটা 'রূপ' লইয়া ইন্দ্রিয়গোচর হয় বা হইতে পারে, যে কোনও দ্রব্যের 'নাম' দেওয়া যাইতে পারে, সে সমস্তই বেদপন্থীর দেবতা; এবং সেই দেবতা শব্দাত্মক। বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক সাহিত্য বিশ্বজগৎকে নামরূপাত্মক বলিয়া মানিয়া লইয়া আসিয়াছে; এমন কি নাস্তিক বৌদ্ধ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার কথা। পাশ্চাত্য দেশেও দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্লেটোর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই

প্রতীয়মান জগৎটা real, না conceptual, না nominal, ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া আসিতেছেন। একদিকে nominalist ও conceptualist, অন্যদিকে realist;—ইঁহাদিগের ঝগড়া আজ পর্য্যন্ত মিটে নাই। সে দার্শনিক তর্কে এখন প্রবেশ করিতে চাহি না। বেদপন্থীর ভিত্তি nominalismএর উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। সমস্ত existenceটা, উহার ইন্দ্রিয়গোচর এবং অতীন্দ্রিয় উভয় অংশই, শব্দে নির্ম্মিত নামমাত্র, ঋগ্বেদসংহিতার ভিতরে এই তত্ত্বটা আমি অত্যন্ত উজ্জল ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলিয়াছি, এবং আমার 'কর্ম্মকথা'র অন্তর্গত 'যজ্ঞ' নামক প্রবন্ধে ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে অম্ভৃণঋষিকন্যা বাগ্দেবতাকর্ত্তৃক দৃষ্ট ও প্রচারিত দেবীসূক্তের তাৎপর্য্যই এই। ঐ সূক্তে ঋষিকন্যা বাক্ বলিতেছেন—আমিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দই ব্রহ্ম, শব্দ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি। ব্রহ্ম যখন আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন, সেই প্রকাশকে শব্দ আখ্যা দেওয়া হইল কেন, এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সময় পাইলে বলিব। বিস্ময়ের কথা এই যে, গ্রীক দর্শনেও ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশকে Logos অর্থাৎ speech বা শব্দনাম দেওয়া হইয়াছে। ইহুদীদের বাইবেলে Genesis এর আরম্ভেও ঈশ্বরের শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি এ কথা স্বীকার করা হইয়াছে—God said, let there be light and there was light; এখানে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের বাক্য হইতেই light, এবং light হইতে জগতের উৎপত্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহুদীরা এ তত্ত্বটা তত অধিক ফলাইতে পারে নাই। খ্রীষ্টানের বাইবেলে চতুর্থ অর্থাৎ St. John's Gospelএ এই তত্ত্বটাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি করা হইয়াছে; স্পষ্টই বলা হইয়াছে, আদিতে শব্দ ছিলেন, শব্দ ঈশ্বরে ছিলেন,

এবং শব্দই ঈশ্বর ছিলেন। খ্রীষ্টীয় বাইবেলের এই তত্ত্ব Neo-platonist দিগের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। Neo-platonist দিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রীক দর্শনেও এই তত্ত্বটা পাওয়া যায়। বিস্ময় এই যে, গ্রীক-দর্শনের এই Logos একদিকে যেমন Word, Speech বা শব্দ, অন্যদিকে সেইরূপ ইহা Sophia বা Reason or Wisdom অথবা ব্রহ্মবিদ্যা বা প্রজ্ঞা। কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, ইহার নির্দ্দেশ আপাততঃ দুঃসাধ্য। কিন্তু গ্রীকদর্শনের জন্মের বহুপূর্ব্বে ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে এই তত্ত্বকে অতি স্পষ্টভাবে ফুটান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা মনে করেন পিথাগোরস ভারতবর্ষ হইতে কএকটি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা ভাবিবার কথা।

"এখন গোলোকের অর্থ কি, তাহা বোধ হয় স্পষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জাত এই জগৎই গোলোক ; প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয় সমস্ত জগৎই ইহার অন্তর্গত। প্রত্যেক দ্রব্য, অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতা এবং প্রত্যেক জীব,—গোরূপী। এই তত্ত্বের উপর যখন ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা ধর্ম্ম গঠিত করা হইয়াছে, তখন অচেতন জড়কে বাদ দিয়া প্রত্যেক চেতন জীবকে গোরূপী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জীবকে গো বলা হইতেছে, এবং গোপও বলা হইতেছে ; এবং যিনি ভগবান, তাঁহাকে গো ও গোপের পতি বলা হইতেছে। তিনি নিজেই গোপ, এ কথাও বলা হইয়াছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এখানে কোনও একটা confusion বা গণ্ডগোল আছে ; কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সে রকম কিছুই নাই। কারণ ইহা খাঁটি বেদান্ত। বেদান্তমতে—আমি বলিব, বেদের মতে,—

ব্রহ্ম = অহং = জীব।

পুনশ্চ—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম ; অতএব ব্রহ্ম = জগৎ।

পুনশ্চ বেদমতে বাক্ = গো ; পুনশ্চ দেবীসূক্ত অনুসারে, অহং = বাক্।
যিনি জীব, তিনিই ব্রহ্ম, আবার তিনিই বাক্, অতএব তিনিই গো, এবং তিনিই গোপ ; সবই এক জিনিষেরই ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র! বেদান্তের এই চরম কথাটি religion হইতে পারে না। religion জিনিষটা ব্যাবহারিক। বেদান্ত অনুসারে—আমি একমাত্র জীব, এবং আমিই ব্রহ্ম ; যেখানে এই রূপ সম্পূর্ণ অভেদ, সেখানে উভয়ের মধ্যে কোনওরূপ আদান প্রদান, পূজ্যপূজক বা সেব্যসেবক সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বোধসার নামক গ্রন্থের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; তাহাতে এ সম্বন্ধে কএকটি বড় সুন্দর কথা আছে। গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন,—আমি (জীব) দেবতার (ব্রহ্মের) পূজা করিতে বসিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছি ; কেন না, দেবতার পরিচয় না জানিলে পূজা অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হয়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেবতার পরিচয় পাই—অর্থাৎ আমাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি এবং আমা ভিন্ন আর কিছু নাই বুঝিতে পারি, তখন পূজার উপকরণই আর কিছু থাকে না। যাঁহাকে পূজা করিব, তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাই না ; এবং যে পূজা করিবে সেই যজমানই কোথায় পলাইয়া যায়!—অতএব এই তত্ত্বের উপর কোনও রূপ religion, কোনও রূপ ব্যাবহারিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা চলে না। কাজেই কোনও religionএ উপস্থিত হইতে হইলে আমার মত অন্যান্য বহু জীবের কল্পনা করিতে হয় ; এবং সেই সকল জীবের উপরে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত সেব্যসেবক পূজ্যপূজক সম্পর্ক পাতাইতে হয়। এই সম্পর্ক রাখিতে হইলে ভগবানকে শব্দের সহিত অভিন্ন না বলিয়া শব্দের স্রষ্টা, শব্দের রক্ষাকর্ত্তা, শব্দের পতিরূপে বর্ণন করিতে হয়। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং গোপাল,—গোরূপী শব্দের পালন কর্ত্তা, সঙ্কীর্ণ অর্থে, গোরূপী বেদের রক্ষাকর্ত্তা ; ব্যাপক অর্থে, গোরূপী জগতের পালনকর্ত্তা ও বিধাতা। মনে রাখিবেন, শব্দ ও জগৎ একই বস্তু ; ব্রহ্ম শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ

করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। শব্দ হইতেই জগৎ নির্ম্মিত, ইহাও পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। সৃষ্টি 'করিয়াছেন' না বলিয়া সৃষ্টি 'করেন' বলিলাম, কেননা এখানে অতীত ক্রিয়ার কোনও বিশেষ সার্থকতা নাই। সৃষ্টি ক্রিয়া out of time—কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে উহা ঘটে নাই, আমাদের ভাষায় কুলায় না বলিয়া অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শব্দই বলুন আর জগৎই বলুন, ব্যবহারতঃ উহা অনাদি ও অনশ্বর; উহার প্রলয় হইতে পারে—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বা ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি হইতে পারে; সেও ব্যাবহারিক পরিণতি। কিন্তু ব্যবহারতঃও উহার ধ্বংস নাই। প্রলয়কালে ভগবান্ উহাকে রক্ষা করেন—ও পুনরুদ্ধার করেন। ইহা তাঁহার ব্যাবহারিক লীলা বা খেয়াল। পুরাণে বলা হইয়াছে, ভগবান্ মীনরূপে প্রলয়পয়োধিজলে বেদকে ধারণ করিয়াছিলেন—জগৎকেও রক্ষা করিয়াছিলেন; কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে তুলিয়াছিলেন এবং এখনও পৃষ্ঠে রাখিয়াছেন; বরাহরূপে প্রলয়জলমগ্ন জগৎকে দংষ্ট্রার উপরে রাখিয়াছিলেন।

"মীন অবতারের মূল শতপথ ব্রাহ্মণে পাই। Deluge প্রসঙ্গে মনুর সম্পর্কে ইহার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বরাহকে পাওয়া যায়। প্রজাপতি বরাহরূপে জলমধ্য হইতে পৃথিবী তুলিয়াছিলেন।

"উত্তর কালে synthesis কর্ত্তা ও exegesis কর্ত্তা ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়া উহা সৃষ্টিতত্ত্বের realistic বিবরণে পরিণত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা তেমন ফোটে নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। "উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা" এই পরিচিত মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পাওয়া যায়। উহা পৃথিবীর বিশেষণ; মনে রাখিবেন পৃথিবী বা জগৎ, শব্দের সহিত অভিন্ন। নিরুক্তমধ্যেই পাইবেন, গো শব্দে বাক্যও বুঝায়, পৃথিবীও বুঝায়।

কালিদাসের "গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্" সকলে জানেন। বাকি থাকেন কূর্ম্ম ; ইঁহার মূল কোথায় ঠিক মনে আসিতেছে না। আকাশ মণ্ডলের— heavenly vaultএর—কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকার curved surface দেখিয়া এই কল্পনা আসিয়াছে কি ? কূর্ম্ম অর্থে কচ্ছপ ; কচ্ছপ ও কশ্যপ একই শব্দ, তাহা শাব্দিক পণ্ডিতেরা জানেন। দেবগণকে যে পুরোডাশের আহুতি দেওয়া হইত, তাহা কূর্ম্মের বা কচ্ছপের আকারে প্রস্তুত করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে ঐ কূর্ম্মকে মধু ও ঘৃত মাখাইবার সময় যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" প্রভৃতি বিখ্যাত মন্ত্র কয়টি বিহিত হইয়াছে। আর একটি মন্ত্রের দেবতা কূর্ম্ম। কূর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, অহে কূর্ম্ম, তুমি "অপাং পতিঃ" তুমি তিন সমুদ্রে সংসর্পণ করিয়াছ। শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-কালে বলা হইয়াছে, "কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ"—কশ্যপই কূর্ম্ম। "এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত,"—এই রূপ ধরিয়াই প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিন সমুদ্রকে তিন লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ সংহিতার শেষভাগে বলা হইয়াছে, যিনি প্রজাসৃষ্টি করিয়া-ছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু ও কশ্যপ। কশ্যপ অদিতির স্বামী, আদিত্যগণের ও দেবগণের পিতা ; আকাশ মণ্ডলকে দেবগণের ও আদিত্যগণের পিতারূপে কল্পনা অস্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কশ্যপ বা কূর্ম্ম দেবগণের পিতা। বিষ্ণু অন্যতম আদিত্যরূপে কশ্যপের পুত্র। তিনি নিজেই আবার কূর্ম্ম হইলেন কিরূপে ? আদিত্য বিষ্ণু আদিত্যগণের কনিষ্ঠ হইয়াও শেষে সকলের বড় "দেবানাং পরমঃ" হইয়াছেন ; গোড়ায় কশ্যপের পুত্র হইয়াও শেষে কশ্যপত্ব পাওয়াতে হানি কি ? সৃষ্টি কথায় আসিয়া এরূপ confusion পদে পদে। ব্রহ্মা বিষ্ণু অভিন্ন ; অথচ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে উৎপন্ন। ভগবতী মহা-দেবের পত্নী, অথচ তিনি ঈশানমাতা। ব্যাবহারিক ভাষায় কুলায় না বলিয়া

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণে গণ্ডগোল পদে পদে আসে ; হাল্ ছাড়িয়া বলিতে হয়, এখানে incompatibles are compatible.

“কূর্ম্মরূপী ভগবান্ পৃথিবীকে আজিও ধরিয়া আছেন—heavenly vaultএর দিকে তাকাইলে অতি মূঢ়মতিরও এ কল্পনা জাগিবে। সমুদ্র মন্থনের অনন্তনাগ যদি Ecliptic হয়, আর মন্দর পর্ব্বত উহার মধ্যস্থিত pole হয়, তাহা হইলে সমুদ্র মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বতে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুর অধিষ্ঠান কল্পনায় আর তেমন হেঁয়ালি থাকে না। একটা কাছিমের পিঠে পৃথিবী আছে, সেকালের পণ্ডিতেরা ইহাই জানিতেন, এইরূপ বলা অত্যাবশ্যক বোধ করি না। পীঠ পূজা পূজামাত্রেরই preliminary অনুষ্ঠান। প্রাত্যহিক পূজাতেও ইহা দরকার। পূজায় বসিয়া মনে করিতে হয়, আমি যে আসনে বসিয়া পূজা করিতেছি, আমার দেবতাও এইখানে প্রতিষ্ঠিত ; কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? আধার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই আধার শক্তিকে কমলাসন বা পদ্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ আধার শক্তি না বলিয়া বলেন,—প্রকৃতি। তদুপরি আছেন অনন্ত—Infinitude, শেষ নাগ রূপে কল্পিত। হইতে পারে ecliptic হইতে এই নাগ কল্পনা হইয়াছে। তদুপরি কূর্ম্ম celestial sphere,—অনন্তের পর কূর্ম্ম বা কূর্ম্মের পর অনন্ত, তাহাতে আসে যায় না। তা'র উপর পৃথিবী—ব্যাপক অর্থে জগৎ ; তদুপরি ক্ষীর সমুদ্র ; নামান্তর সুধাম্বুধি ; তা'র উপর শ্বেতদ্বীপ। এই ক্ষীর সমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ক্ষীর সমুদ্রে শয়ান ; তিনি শ্বেতদ্বীপবাসী ; ক্ষীরসমুদ্রতটে শ্বেতদ্বীপ। আবার তিনি শেষশয্যায় বা অনন্তনাগের উপর শয়ান ; আবার তিনি কূর্ম্মরূপে পৃথিবী ধরিয়াছেন ;—পৃথিবী অনন্তের উপর ; আবার কূর্ম্মের উপর ধৃত পৃথিবীতে সর্ব্বভূত অবস্থিত—“পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা” মনে করুন। এই পীঠ পূজা তন্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান ; দেবী পূজাতেও

ইহা করিতে হয়। কাজেই ক্ষীরসমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপ কেবল বৈষ্ণবের নহে। সেই শ্বেতদ্বীপে, মণিমণ্ডপে, চিন্তামণিগৃহে, কল্পবৃক্ষতলে, মণিবেদিকার উপর রত্নসিংহাসন কল্পনা করিয়া সেই আসনে দেবতাকে বসাইতে হয়, এবং আপনাকেও সেই দেবতা হইতে অভিন্ন মনে করিতে হয়। ইহাই তান্ত্রিক পূজা। এই যে আধিভৌতিক—realistic বিবরণ, ইহার একটা আধ্যাত্মিক conceptualistic দিক্ আছে নিশ্চয়; কেন না তান্ত্রিক পূজায় অন্যান্য ন্যাসের সহিত পীঠন্যাসও করা হয়; ঐ প্রকৃতি বা আধার শক্তি হইতে রত্নসিংহাসন পর্য্যন্ত সমুদয় আসন পূজকের হৃদয়-মধ্যে ন্যাস বা স্থাপন করিতে হয়। তাহার অর্থ,—ঐ সকল পদার্থ বাহিরে নাই—জীবের মধ্যেই আছে। ঐ পদ্ম মণি, রত্ন প্রভৃতি realistic symbol গুলা Popular Hinduismকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মহাদেবের ও বুদ্ধদেবের পদ্মাসন ও বজ্রাসন এবং জগন্নাথের রত্নবেদি হইতে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়ার "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ Christian Rosi-crucian দিগের symbol Rose = পদ্ম এবং Cross = স্বস্তিক = বজ্র = মণি পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত। Cross এবং স্বস্তিক উভয়ে একই জিনিষ, উভয়ের একই চিহ্ন (+) তাহা সকলেই জানেন। বজ্র (হীরক বা diamond) এর চিহ্নও কিঞ্চিৎ বিকৃত (×) রূপ। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত ভিতরের, বাহিরের নহে। পীঠন্যাসের পর পূজক স্পষ্টই বলিতে পারেন, "হৃদি মাঝে রচেছি আসন—জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা করিবে আগমন।" এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় যদি কেহ হাসিতে চাহেন হাস্থন; আমি magnetism আনি নাই; কিন্তু যেখানে ঐতিহাসিক মূল পাইতেছি, সেখানে common sense বা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহি।

"থাক্, হিন্দুর দেবতা মাছ কাছিম ও শূয়ারকে ভগবান বলিতে হিন্দুর কোনও আপত্তি নাই। গরুতেই বা থাকিবে কেন? মীন কূর্ম্ম ও বরাহ-

রূপে তিনি গোরূপী শব্দকে অর্থাৎ বেদকে এবং গোরূপিণী পৃথিবীকে রক্ষা, উদ্ধার, ধারণ ও পালন করিয়া আসিতেছেন; এই তত্ত্বের মূল আমাদের জাতীয় জীবনের আরম্ভ হইতে পাই। অতএব তিনি গো-লোক-বাসী গো-পাল, গোপ-সখা, গোপী-কান্ত। ইহার বৈদিক মূল আবিষ্কার অসঙ্গত নহে। বৈষ্ণবের গোলোক শব্দনির্ম্মিত জগৎ; এবং গো ও গোপী শব্দরূপী জীব। ইহা আধুনিক বৈষ্ণবকর্ত্তৃক পল্লবিত হইলেও মূলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের মূল বেদে। খ্রীষ্টের shepherd কল্পনার মূল কত আগে পাওয়া যায়? কৃষ্ণপূজার যে বিশিষ্টভাব তাহা খ্রীষ্টানি হইতে গৃহীত কিরূপে বলিব? আর কৃষ্ণের গোপালত্ব বাদ দিলে পরের নিকট ধার লইবার জন্য অবশিষ্ট কতটুকু থাকে?

"এই ব্যাখ্যা গায়ের জোর বলিলে চলিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের সহস্রস্থলে গোপীদিগকে শ্রুতিকন্যা বলা হইয়াছে; এই ভাবে না দেখিলে ইহার সার্থকতা পাওয়া যায় না। গোপীদিগের দেবকন্যা নামও এই অর্থে সার্থক। কেন না দেবতা মন্ত্রাত্মক বা শব্দাত্মক। বন্ধুবর হীরেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, যে মন্ত্রের যথাযথ স্বরযোগে উচ্চারণে ether বা অন্য কোনও medium এ Vibration ঘটিয়া যে দেবতার মূর্ত্তি গঠিত হয়, সেই মন্ত্রোক্ত দেবতার সেই মূর্ত্তি, এই অর্থে দেবতার মূর্ত্তি আছে এবং দেবতা মন্ত্রাত্মক। যাঁহারা Acoustics পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে কাচে বা ধাতুফলকে বালি ছিটাইয়া বেহালার ছড় দিয়া টানিলে একটা স্বর বাহির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফলকের উপর Chladni's figures নামক নানাবিধ বিচিত্র মূর্ত্তি দেখা যায়—এও যেন কতকটা সেই-রূপ। ইথারের vibrationএ ঐরূপ মূর্ত্তি জন্মিতে পারে বা না পারে, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণসাপেক্ষ। কেবল analogy বা উপমান বৈজ্ঞানি-কের নিকট অতি দুর্ব্বল প্রমাণ। অতএব আমি ততদূর যাইতে পারি

না। আমার মতে যে মন্ত্র যে concept লইয়া, যে মন্ত্রে যে concept এর মনোমধ্যে আবির্ভাব হয়, সেই concept সেই মন্ত্রের দেবতা। সাপ ব্যাঙ এবং অশ্বমেধের ঘোড়া হইতে দিনরাত্রি শ্রী, হ্রী এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু হইতে ওঁকার, বষট্কার এবং যজমান জীব হইতে উপাস্য হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকলেই দেবতা হইতে পারেন; সকলেই মন্ত্রাত্মক অর্থাৎ nominal;—নামমাত্র ছাড়িয়া real existence কাহারও নাই; অতএব সকলেই গোরূপী। ইহাদের মধ্যে জড়দ্রব্য গুলিকে বাদ দিয়া জীবকে বিশেষ ভাবে গো, গোপ ও গোপীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান্ বা Personal God রূপে নানা জীবের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা রূপে গোপাল নামে জীবগণের সহিত আনন্দময় সম্পর্কে কল্পিত হইয়াছেন।

"ভগবান্ জীব হইতে অভিন্ন; সুতরাং তিনিও যেমন গোপাল, জীবও সেইরূপ গোপ বা গোপাল। তিনি জীবগণের বা গোপগণের সহচর এবং সখাও বটেন, রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। বৃন্দাবনে তিনি গো ও গোপগণকে কালিয়নাগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন; বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুরগণের ভীতি হইতে নিষ্কৃতি দেন; এমন কি ইন্দ্রের মত বড় দেবতার হস্ত হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করেন। যদ্দ্বারা তিনি গো গোপকে আচ্ছাদন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শৈলটার নাম গো-বর্দ্ধন। জগৎপতি তাঁহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে বা Nature এর মধ্যে জীবনসংগ্রামের সৃষ্টি করিয়া মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে একটা বিরোধের অভিনয় করিয়া আনন্দলীলা করিতেছেন; সেই অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে জীবকে রক্ষা করা ও তাহার মঙ্গলবিধান তাঁহার কার্য্য। পৃথিবীর যাবতীয় Religion এই একই কথা নানা আকারে বলিতেছে। ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে যদি আপনি নিতান্তই শয়তানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন, ঐ

কালিয়নাগই কতকটা সেই অমঙ্গলরূপী শয়তান। বেদের মধ্যে ইহাকে বৃত্র নামক অহিস্বরূপে প্রথমে দেখিতে পাই। আমার "কর্ম্মকথার" মধ্যে "প্রকৃতি পূজা" প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। পারসীক-দের মধ্যে এবং গ্রীকদের মধ্যে ইহাকে সর্পরূপে আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধগণও কাশ্যপের গৃহে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক এই কালিয় সর্পের নিগ্রহ ঘোষণার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেদের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ অমরত্বপ্রার্থী হইয়া ইন্দ্রশত্রু বৃত্ররূপ অহির উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি পারসীকদের আহ্রিমানের মূর্ত্তিও সর্পাকার।

"বৃন্দাবনলীলায় ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে খাঁটি বৈষ্ণব চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে একেবারেই দেখিতে চাহেন না। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে এইখানে তাঁহার একটা মস্ত প্রভেদ। জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রীতির সম্বন্ধই বৈষ্ণবের অনুমোদিত। বেদান্ত জীবকেই ব্রহ্ম বলিতে চাহেন। বৈষ্ণব সে কথা ত বলিতে পারেনই না; সে কথা বলিতে গেলে religionই হয় না। অথচ ঈশ্বর বলিলে জীবের সঙ্গে যে ব্যবধানটুকু আসে, সেটুকু স্বীকার করিতেও তিনি একেবারেই নারাজ। এই জন্য বৃন্দাবনলীলায় ভগবানের ঈশ্বরত্ব বৈষ্ণবের হাতে ফুটিতে পায় নাই। বৈষ্ণব ভগবানকে সখা, পতি পুত্রভাবে মনে করিতে চাহেন; কিন্তু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে চাহেন না; এমন কি, পিতা বলিয়াও তাঁহাকে পূজা করা হয় নাই। এইখানে দেখুন, মহাদেবকে আমরা বাবা বলিয়া থাকি; কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে মা বাপ বলিয়া বোধ হয় কোনও হিন্দুই ডাকেন না; গোটা বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ রকম মা বাপ আখ্যা খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহার বাল্য ও কৈশোর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শেষ করিতে হইয়াছে; সেখানে তাঁহার পিতৃত্বের কোনও সম্ভাবনাই ঘটে নাই। মহাদেব

আমাদের বাবা ভোলানাথ, তাঁহার গৃহিণী জগজ্জননী মা ভগবতী ; ইঁহারা উভয়েই অন্ততঃ কালিদাসের সময় হইতে "জগতঃ পিতরৌ" ; ভক্ত ইঁহাদিগকে ডাকিলেই ইঁহারা প্রসন্ন হন, দুইটা বেলপাতারও অপেক্ষা করেন না। Religion of Redemption ত তাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্তভাবে মানস সরোবরের ধারে বসিয়া আছেন। তিনি পিতামহ—বুড়া ঠাকুরদাদা, সংসারের খোঁজ বড় রাখেন না ; তবে কেহ উৎকট তপস্যা করিয়া ধরিয়া বসিলে তাহাকে বর দিয়া ফেলিয়া পরে বিব্রত হইয়া পড়েন, এবং সামলাইবার জন্য নারায়ণের কাছে দৌড়িয়া যান। নারায়ণকেই জগৎ পালন করিতে হয়, দরকার মত নামিতে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতিও পিতা সম্বোধন ভাল শুনায় না। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য মধ্যে হয়ত তিনি প্রভু ; সকলের প্রভুও বুঝি নহেন,—নারদের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল ? তাঁহার ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীকে মা লক্ষ্মী বলা যাইতে পারে। বৈকুণ্ঠে তিনি যাহাই হউন, বৃন্দাবনে তিনি পিতা কি প্রভু হইতেই পারেন না ; সেখানে তিনি সকলের প্রিয় আদুরে গোপাল মাত্র। সেখানে তিনি কাহারও বড় নহেন, সকলেরই ছোট। বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেও যশোদা সর্ব্বদা ছোট ছেলেটির জন্য শঙ্কিত ; দাদা বলাই তাঁহাকে শাসন করেন; সখা রাখালেরা তাঁহার ঘাড়ে চড়ে ; প্রবীন ঘোষেরা ও ঘোষাণীরা তাঁহার উৎপাতে ত্রস্ত হইয়া কেবলই নালিশ করে ; গোপীরা কেবলই তাঁহার সহিত রঙ্গ করে ; আর কথায় কথায় তাঁহাকে রাধিকার পায়ে ধরিতে হয়। Religion of Redemption এর চরম development এইখানে। জীব ভগবানকে কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা খুঁজিবে কি ? তিনি নিজেই ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল ; তাঁহারই এই জন্য সোয়াস্তি নাই। অযাচিত ভাবে তিনি Bethelhemএ অবতীর্ণ হইয়া দীনের বেশে দীন-দরিদ্রকে ডাক দিয়া বলিতেছেন—এস এস, তোমরা ঘরবাড়ী সর্ব্বস্ব

ছাড়িয়া আমার কাছে এস; আমার নিকট অমৃত আছে। বৃন্দাবনে তিনি বাঁশী বাজাইয়া গোপাঙ্গনাদিগকে ডাকিতেছেন—ঘর সংসার পতি পুত্র এখন কিছুক্ষণের জন্য থাক্, তোমাদের বসনের সহিত লাজসম্ভ্রম আমিই কাড়িয়া লইতেছি; আজি উৎফুল্লমল্লিকা, শারদ পূর্ণিমা; এখন কি ঘরে থাকিতে আছে? নদীয়ার বাজারে তিনি 'আয় আয়' বলিয়া সকলকে ডাক দিতেছেন, এবং রাই কই, রাই কই, বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতেছেন। এ হেন ভগবানকে পিতা বা প্রভু বলা চলে না। খ্রীষ্টানকেও ইহা মানিতে হইয়াছে; তাই Father নিজে নামিতে পারেন নাই; নিজেই নিজের Son হইয়া, অপিচ Son of Man সাজিয়া, মর্ত্তালোকে নামিয়াছেন। দ্বারকা-লীলার মধ্যে তাঁহাকে আমরা পিতৃরূপে দেখিতে পাই; কিন্তু সেখানেও তিনি নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। রাজা না হইলেও যাদবদিগের এক রকম প্রভু বটেন, এবং প্রদ্যুম্নাদি বহুপুত্রের পিতাও বটেন। পূর্ব্বে যে ভাগবত বৈষ্ণবদিগের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহাদের theory খাড়া করিয়াছেন। এই ভাগবত মতটা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে বেদান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই চলে না। ভাগবতমতের মুখ্য কথাটি হইতেছে, চতুর্ব্যূহবাদ। এই মতে ভগবানের চারিটি manifestation আছে; ভগবান্ চারিটি স্বতন্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন;—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। পুরাণ ইতিহাসমতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব; সঙ্কর্ষণ তাঁহার দাদা বলরাম, অনন্ত বা শেষ নাগের অবতার;—প্রদ্যুম্ন,—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, কন্দর্পের অবতার;—অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের পুত্র। ভাগবতপন্থীরা এই নাম কয়টি পুরাণ হইতে লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম; সঙ্কর্ষণ,—জীব; প্রদ্যুম্ন,—মন; অনিরুদ্ধ,—অহঙ্কার। আরও বলিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে জীবের, জীব হইতে মনের, মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি।

"এ ব্যাপারটা সাংখ্যের বেদান্তের ও বৌদ্ধের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে অধিক ভিন্ন নহে। বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব বিকৃত হইয়া এই সমস্ত দাঁড়াইয়াছে, এ রকম মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ সংকর্ষণকে অর্থাৎ বলরামকে বাসুদেবের দাদা বলিয়া অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক পর্য্যায় ফেলিয়াছে। ভাগবতেরা এতটা উঠিতে সাহস করেন না। তাঁহারা সঙ্কর্ষণকে অর্থাৎ জীবকে বাসুদেবের সৃষ্ট পদার্থ, তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের প্রদ্যুম্ন অথবা কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, ইনিই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার মানস পুত্র কাম,—মনসিজ, নাসদাসীয় সূক্তের মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ, সৃষ্টিকর্ত্তার সেই কাম বা will, যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরাও ইঁহাকে মন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে মনকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বলে; উহা বাস্তবিকই will; এই will দ্বারাই বাহ্যজগৎ ব্রহ্ম বা বিষয়ী হইতে পৃথক হইয়া তাহার object বা বিষয়রূপে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পরসম্পর্কে অহঙ্কার বা self-consciousness জন্মিয়া থাকে।

"বেদান্ত মতে ব্রহ্মই জীব; তাঁহারই রসস্বরূপ আনন্দময়তা হইতে বিজ্ঞান, মন, প্রাণ ও অন্ন নির্ম্মিত চারিটি কোষের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই বিজ্ঞানাদি কোষের মধ্যে সাংখ্যের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ও ভূতগণ রহিয়াছে। বৌদ্ধ ব্রহ্ম এবং জীব উভয়ই মানেন না; প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে জগতের উৎপত্তিও অবিদ্যা হইতে; উৎপত্তির ধারা কিন্তু বেদান্তের বা সাংখ্যেরই মত। ভাগবতদিগের চতুর্ব্যূহবাদ মতে বাসুদেব বা ব্রহ্ম সর্ব্বোপরি; কিন্তু ইনি নির্গুণ নহেন, একজন সগুণ Person; ইঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ বা জীব উৎপন্ন; জীব মনের (প্রদ্যুম্নের) ও অহঙ্কারের (অনিরুদ্ধের) সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টানদের Trinity তত্ত্বেও অনেকটা এইরূপ দেখা যায়। সেখানে Father একজন Person;

তিনি খ্রীষ্টকে ( জীবকে ) beget করিয়াছেন; তৃতীয় পুরুষ Holy Ghost ও সেই Father হইতে উৎপন্ন। এই Holy Ghost বলিতে খ্রীষ্টানরা কি বুঝেন, আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। মনুষ্যে ও জগতে ঈশ্বরের immanence বুঝাইবার জন্য ইঁহাকে আনিতে হইয়াছে; ইনি কৃপা ও করুণা ও প্রেরণারূপে মানবে ও জগতে অবতীর্ণ হয়েন এবং মানবকে ও জগৎকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ঈশোপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ইঁহার ঈশিত্ব দ্বারা "ইদং সর্ব্বং" অনুপ্রবিষ্ট, আবৃত, ধৃত রহিয়াছে। Dove বা পারাবত পাখীর সহিত ইঁহার তুলনা হইয়াছে। যীশুর দীক্ষা-কালে ইনি Dove রূপে নামিয়াছিলেন। বেদে ব্রহ্মের গরুত্মান বা সুপর্ণরূপ কতকটা ইহারই মত। তিনি পুনঃ পুনঃ পতনশীল পক্ষী, পক্ষদ্বারা তিনি জগৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সোম বা অমরতা আনয়ন তাঁহার প্রধান কার্য্য; পুরাণে ইনি নারায়ণের বাহন বা চিহ্ন। ইঁহারই নামান্তর হংস, যে হংস ব্রহ্মার বাহন। খ্রীষ্টানদের theology এক আধটু যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি মোটামুটি বলা হয়, work of the holy spirit is twofold—concerned both with the generation and the organisation of life। Lifeএর Generation বা সৃষ্টি সংকল্পাত্মক মনের কার্য্য, এবং তাহার organisation স্থূলতঃ অহঙ্কারের বা self conscious-ness এর কার্য্য, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইতে খ্রীষ্টানের Holy spirit এত ভিতরে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ভগবানের এই দুই দেবতারই স্থান হয়। খ্রীষ্টান মতে এই তিন মূর্ত্তি ভিন্ন হইলেও, তিন জন স্বতন্ত্র Person হইলেও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন; ইঁহারা প্রত্যেকে ষোল আনা God; অথচ there are not three Gods, but there is only one God। ভাগবতেরাও ঐ চারি মূর্ত্তি বা চারিটি ব্যূহাবতারকে কতকটা সেইভাবে স্বতন্ত্র অথচ এক বলিয়া দেখেন। চারি জনই ভগবান্,

অথচ একই ভগবান্ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ—ভাগবতপন্থীর হাতে বাসুদেব হইতে ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বের খাতিরে এইটুকু করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহা পুরাণ ইতিহাসের বিরোধী। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়েই বসুদেবপুত্র, অতএব উভয়েই বাসুদেব; পুরাণে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন নহেন, বরং তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা। ব্রহ্মের ও জীবের সম্পর্ক লইয়া এই চিরন্তন বিরোধ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের জন্ম দিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সমাজেও Arianism ও Athanasianism লইয়া বিরোধের এই গোড়ার কথা; ইঁহাদের সম্পর্ক homo-ousia একাত্মতা, না homoiousia—সদৃশাত্মতা, ইহা লইয়া খ্রীষ্টানেরা যে রক্তারক্তি করিয়াছে, তাহার বিচিত্র ইতিহাসে আমাদের অনেক শিখিবার আছে; যিনি এ সংবাদ রাখেন না, তাঁহাকে অন্ততঃ গিবনের সিন্ধুগর্জ্জনোপম ভাষায় এই বিরোধের বিবরণ পাঠ করিতে বলি। আমাদের দেশে বিরোধ গালাগালি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; রক্তারক্তিতে দাঁড়ায় নাই। আধুনিক বৈষ্ণব পুরাণ মানিয়া লইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ বসুদেব-পুত্র, দাঁদা বলাই, ছোট ভাইয়ের সহিত একমন একপ্রাণ; বয়সে বড় হইয়াও ছোটর উপর সর্ব্বকর্ম্মে নির্ভরশীল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই ছোট; সেখানে কেহ তাঁহাকে বাসুদেব বা বসুদেব-পুত্র বলিয়াই জানে না, অথচ তিনি সকলেরই প্রাণস্বরূপ। মধুর রসের পরিপুষ্টির ইহাতে যেমন সুবিধা হইয়াছে, অন্য কল্পনাতে তাহা হইত না।

"শ্রীকৃষ্ণকে বলরামের ছোটভাইরূপে কল্পিত করা হইয়াছে, পাছে বড় ভাই হইলে প্রভুভাব আসিয়া পড়ে। তেমনি নন্দ যশোদার কাছে পুত্রত্ব হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে ছোট করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ছেলের মত তাঁহাকে

লালন পালন করিবেন; বলাই দাদার মত তাঁহাকে স্নেহের চোখে দেখিবেন, শ্রীদামাদিরূপে তাঁহার সঙ্গে খেলা করিবেন, তাঁহার ঘাড়ে চড়িবেন ও তাঁহাকে ঘাড়ে চড়াইবেন, সুবলরূপে যুগল মিলন করাইয়া দিবেন; ললিতাদি গোপীরূপে মিলনের সাহায্য করিবেন; ও সেই মিলন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভোগ করিবেন।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বৈষ্ণব মতের মূল বেদান্তেই। জীব ও ব্রহ্ম এক; কিন্তু রস বা emotion না থাকিলে religion হয় না, ঐক্যে রস নাই। সেই জন্য religion এর খাতিরে এই কথাটা স্পষ্ট না বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই গোপরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি জীবের নানারূপ প্রীতির সম্পর্ক পাতাইবার জন্য নন্দ যশোদা বলরাম শ্রীদামাদি গোপ, ললিতাদি সখী, এবং রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সহচরা কল্পনা করা হইয়াছে। এই মধুর সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি শ্রীরাধিকায়। সেখানে বেদান্তবেদ্য আনন্দঘনমূর্ত্তি রসস্বরূপ ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তিকে—অর্থাৎ যে আনন্দ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি জগৎ কল্পনা করিয়াছেন, এবং জীবকে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া পুনরায় সেই জীবকে সর্ব্বতোভাবে আপনা করিয়া লইবার জন্য লালায়িত আছেন এবং আনন্দ পাইতেছেন, সেই হ্লাদিনী শক্তিকে শ্রীরাধিকাতে মূর্ত্তিমতী করা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, মিলনে তৃপ্তি, আবার বিরহ, বিরহের পর পুনর্মিলন, এই সমস্ত ঘটাইয়া religionএর পক্ষ হইতে জীব ও ব্রহ্মের একাত্মতা যতদূর সম্ভব ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। অন্য কোনও religion এতটা ফুটাইয়া তুলিতে সাহস করে নাই। য়ুরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় mystic সাধকদিগের মধ্যে এইরূপ চেষ্টার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারাও খ্রীষ্টকে আপন পতিরূপে কল্পনা করিতেন; এবং নায়ক-নায়িকা-সম্মিলনে যে সকল হর্ষপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব অনুভবগম্য করি-

তেন; ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঈশ্বরে এই পতিত্বের আরোপ আমাদের অতি প্রাচীন সাহিত্যে—এমন কি বৈদিক সাহিত্যেও —পাওয়া যায়। বাগ্‌দেবতার সহিত গো ও গোপের সম্বন্ধ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। বেদের সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বাগ্দেবীকে ও তাঁহার তিন মূর্ত্তি ইড়া ভারতী ও সরস্বতীকে দেবীরূপেই অর্থাৎ নারীরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। এই বাগ্‌দেবতাই শব্দ, এবং শব্দই বেদ। বেদের যে মন্ত্রটিকে সমস্ত বেদপন্থী সমাজ বিশ্বামিত্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বেদের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে এই তত্ত্বটির সম্পর্ক রহিয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র; ইহার ছন্দ গায়ত্রী। এই জন্য আজ কাল গায়ত্রী বলিলে বিশেষতঃ এই মন্ত্রটিকেই বুঝায়,—যদিও গায়ত্রী ছন্দে আরও অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। বেদের সারভূত গায়ত্রী এই জন্য বাগ্‌দেবতার রূপ পাইয়াছে। এই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, অর্থাৎ যিনি জীবে ধীশক্তিপ্রেরণা করেন। এই সবিতা ব্রহ্মেরই নামান্তর; এই জন্য এই মন্ত্রের নামান্তর সাবিত্রীমন্ত্র। অতএব গায়ত্রী ও সাবিত্রী উভয়েই বাগ্দেবতার নামান্তর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান স্মরণ করুন। সেখানে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, বাগ্‌দেবতা সোম আনিয়াছিলেন। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে গায়ত্রী দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। অতএব যিনিই বাগ্দেবতা, তিনিই গায়ত্রী। তিনিই আবার সাবিত্রী। একটি আখ্যায়িকা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, ইহার মূলও ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রজাপতি এককালে আপনার কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার মূল সম্ভবতঃ জ্যোতিষিক; অন্ততঃ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। প্রজাপতি মৃগশিরা নক্ষত্র বা Orion, তাঁহার কন্যা রোহিণী নক্ষত্র বা Aldebaran; Equinox যে সময়ে মৃগশিরা হইতে অপসৃত হইয়া রোহিণীতে গিয়াছিল, সেই সময়ে

সম্ভবতঃ এই গল্পটি রচিত হইয়াছিল। সংবৎসররূপী প্রজাপতি মৃগ-শিরা হইতে রোহিণীর মুখে ধাবন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ঐ আখ্যায়িকা রচিত হয়। উত্তর কালে এই প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দাঁড়াইয়াছেন, এবং তাঁহার কন্যা রোহিণী গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়াছেন। পৌরাণিক কল্পনায় গায়ত্রী ব্রহ্মার কন্যাও বটে, পত্নীও বটে; এই হেতু সাবিত্রীও ব্রহ্মার পত্নী হইয়াছেন। ক্রমে দাঁড়াইল সাবিত্রী = সরস্বতী = ব্রহ্মার পত্নী = নারায়ণের পত্নী। নারায়ণের একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া; এই মুখরা পত্নীটি যে বাগ্দেবতা তাহা বলা বাহুল্য। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর প্রাধান্য উত্তরকালে স্থাপিত হইয়াছিল; লক্ষ্মী আসিয়া সাবিত্রীকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে বাক্ যত স্পষ্ট, ইনি তত স্পষ্ট নহেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত বিখ্যাত শ্রীসূক্তের মধ্যে একটি ঋক্ মন্ত্র আছে,—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং।

এই মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীকে আহ্বান করা হয়। ঐ সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রে এই শ্রীকে লক্ষ্মী হিরণ্ময়ী হিরণ্যবর্ণা পদ্মিনী পদ্মালয়া ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; স্পষ্টতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া বলা হয় নাই; কিন্তু ফলশ্রুতি মধ্যে তাঁহাকে বিষ্ণুপত্নী হরিবল্লভা মাধবপ্রিয়া বলা হইয়াছে। পুরাণে আমরা দেখিতে পাই, বৈকুণ্ঠে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ক্ষীরসমুদ্রে ইনি নারায়ণের পদসেবা করিতেছেন। আরও পূর্ব্বে "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মী চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রী ও লক্ষ্মী স্বতন্ত্র ভাবে ঈশানের পত্নীদ্বয়রূপে কল্পিত। পুরাণে বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্তৃত্বের চেয়ে পালনকর্তৃত্বরূপই প্রকট। সৃষ্টিকর্তৃত্ব ব্রহ্মাতে প্রকট হইয়াছে; কাজেই সাবিত্রীরূপিণী বাগ্‌দেবতাকে

ব্রহ্মার জন্য রাখিয়া, সৃষ্টিরক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর ভাগে দেওয়া হইল; বাগ্দেবতার অন্য মূর্ত্তি হৈমবতী উমা গৌরী মহাদেবের ভাগে দেওয়া হইল। লক্ষ্মী বাগ্দেবতার সহিত পূর্ণ একত্ব পান নাই; বরং উভয়ের মধ্যে ঈর্ষাই আছে। ত্রৈলোক্য একবার লক্ষ্মীহীন হইয়াছিল; সমুদ্রমন্থনে তিনি উঠিলে বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি বৈকুণ্ঠের অধিকারিণী।

"একটা পতিপত্নীসম্পর্কের মূল বেদের মধ্যেই পাওয়া গেল। বৈষ্ণবেরা মধুররস পুষ্টির জন্য এই সম্পর্ককে বৈধ সম্বন্ধের সীমা ছাড়াইয়া দিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি religion দুই রকম,—religion of law এবং religion of redemption; religon of lawএর ভিত্তি অনুজ্ঞাপালন; এই সকল অনুজ্ঞা বিধি বা আদেশরূপে ঋষিমুখে প্রচারিত হয়। কিন্তু যেখানে বিধি, সেখানেই বন্ধনের ভাব প্রবল হয়; ভগবানে প্রভুভাব ও ঈশ্বর ভাব প্রবল হইয়া পড়ে। Religion of Redemption এ সে ভাবটা থাকে না। সেখানে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বর আপনাদের গোড়ার ঐক্য সন্ধান করিতে চায়; কোনও রকম বাধ্য বাধকতার সম্পর্ক আনিতে চায় না; ভগবাম এখানে আপনার প্রভুত্ব ভুলিয়া জীবকে ধরা দিতে চাহেন, এমন কি ভক্তাধীন ভগবান হইয়া পড়েন। এইরূপে তিনি Saviour ও Redeemerএ পরিণত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যে বরণের কথা বলিয়াছি, সেই কথা স্মরণ করুন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে জীবকে বরণ করিয়া লয়েন; জীবও সমস্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করে। বৈষ্ণবধর্ম্মে এই redemptionএর ভাবটা পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই জন্য গোপাল ও গোপীর সম্পর্ককে বৈধ সীমা লঙ্ঘন করান হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্টও তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন "আমাকে যদি চাও, তাহা হইলে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আসিতেহইবে।"

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের এবং তাঁহার ধাম গোলোকের যে তাৎপর্য্য দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার প্রধান ভিত্তি নিরুক্ত। নিরুক্ত বা Etymology আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিমান লোকে কোনও একটা বিষয়ের নানারূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণে সর্ব্ব-সাধারণে বাধ্য হইবে না। কোনও একটা ideaর ঐতিহাসিক মূল দেখাইতে না পারিলে, এবং কালক্রমে উহা কিরূপে develope করিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার ধারা দেখাইতে না পারিলে, ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। নিরুক্ত আমার প্রধান আশ্রয়। আমি ঐতিহাসিক মূল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গো শব্দে বাক্ বুঝাইত; গোপতি অর্থে বাক্‌পতি বুঝাইত; বাক্ অর্থাৎ শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে; এমন কি এই বিশ্বজগৎ সেই শব্দেরই প্রকাশ মাত্র, সেই শব্দ হইতে অভিন্ন। গো শব্দে যেমন বাক্ বা শব্দ বুঝায়, সেইরূপ গো শব্দে পৃথিবী বা জগৎ বুঝায়, ইহা আমরা বেদের মধ্যেই পাই। অহং অর্থাৎ আমি যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, এই বৈদান্তিক মত ও আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে পাই। সৃষ্ট জগতকে এবং সৃষ্ট পদার্থমাত্রকে গোরূপে নির্দ্দেশ করার মূল বেদেই রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে জগৎপতি সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে গোপতি এবং গোপাল নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সৃষ্ট জীবকে কখনও গো কখনও বা গোপ রূপে, আবার কখনও গোপীরূপে দেখান হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য ঐ মূল না ধরিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ।

বাগ্‌দেবতার নারীরূপ কল্পনাই ব্যাকরণ মতে স্বাভাবিক। বেদের মধ্যেই তাঁহার বিবিধ নাম ও বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এবং কি রূপে তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে নারায়ণ বিষ্ণুর, প্রজাপতি ব্রহ্মার, এমন কি মহাদেব মহেশ্বরের পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছেন,—তাহার মূল ও বেদে পাওয়া গেল। জীব এক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; তখন জীবেরও গোরূপে, গোপরূপে এবং গোপীরূপে কল্পনা আপনা হইতে আইসে। ব্রহ্মের সহিত জীবের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর, অনির্ব্বচনীয় ভেদাভেদ সম্পর্ক, ইহাও আপনা হইতে আইসে। শ্রীকৃষ্ণের ধাম যে গোলোক, এবং গোপ এবং গোপী ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নাই, ইহাও স্পষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন, এইরূপ ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি যাহা কিছু বলিতেছি তাহা কেবল suggestion মাত্র। এই suggestion যদি কাহারও মনে লাগে, এবং তিনি তদনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একটা মতের theory খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। প্রাচীন সাহিত্য ঘাঁটিয়া development এর ইতিহাস সঙ্কলন আমার ক্ষমতায় আর কুলাইবে না। বোধ করি এইরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনও বর্ত্তমান কালে অসাধ্য। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে সকল idea আমরা অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই; আধুনিক পৌরাণিক সাহিত্যে তাহাকে একেবারে ফলে ফুলে পল্লবে অলঙ্কৃত দেখি। ক্ষুদ্র বীজ বা চারা গাছ আমাদের পরিচিত; চারা গাছটা কিরূপে বড় গাছে পরিণত হইল, এই মাঝের ইতিহাসটা পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্য এবং পৌরাণিক সাহিত্য এই দুইয়ের মাঝখানে একটা gap বা ব্যবধান রহিয়াছে। ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে ইহা একটা প্রধান অন্তরায়। যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাকে পদে পদে

এই অন্তরায় দেখিয়া ঠেকিতে হয়। এক গাছা শিকলের গোড়ার দিকটা এবং শেষের দিকটা পাওয়া যায়, মাঝের খানিকটা পাওয়া যায় না। এই missing link গুলা যত দিন অনাবিষ্কৃত থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হইবে না। হয় ত ইহা কোনও কালেই পাওয়া যাইবে না। "ত্রীনিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রের গোপা বিষ্ণুই যে একালের বৈষ্ণবের গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও মাঝের যে ইতিহাসটা আবশ্যক তাহা হয় ত কোনও কালে পাওয়া যাইবে না। যে সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমি তাহারই দুই একটা টুক্‌রা সম্মুখে ধরিয়াছি। তাহারও সবগুলি কুড়াইয়া আনিয়া জোড়া দিবার আমার সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। এই বিচিত্র প্রসঙ্গ তাহার স্থানও নহে।

"আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, ইহার কতকটা ঐতিহাসিক হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রাচীন সাহিত্য অর্থে আমি মুখ্যতঃ বৈদিক সাহিত্য বুঝিতেছি। এই বৈদিক সাহিত্যের পারিভাষিক নাম শ্রুতি। আমাদের বেদপন্থী সমাজে ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া গৃহীত হয়। কি অর্থে নিত্য এবং অপৌরুষেয় তাহা লইয়া নানা বিতণ্ডা আছে; তাহাতে প্রবেশ করিলে কিনারা পাইব না। অন্যদেশে যাহাকে revealed scriptures বলে, এই শ্রুতি কতকটা তাহারই মত; কতকটা মাত্র, কেন না বেদপন্থীরা শ্রুতিকে ঈশ্বরের কৃত বলিয়াও মানিতে চাহেন না। যে ব্রহ্মার মুখ হইতে এই বেদবাণী বহির্গত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মাও আমাদের নিকট অস্থায়ী পুরুষ মাত্র। আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বলি, তাঁহারা সেই বাণী শুনিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন মাত্র, এবং প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র;

তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কোনও বেদপন্থী স্বীকার করিবেন না। শব্দ শোনাই যায়। ঋষিগণ কিরূপে উহা দেখিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সময় পাইলে বলিব। এ দেশের ঋষি কতকটা অন্যদেশের inspired prophets এর মত; কিন্তু এও কতকটা মাত্র, সম্পূর্ণ নহে। যাহাই হউক এই শ্রুতি বা বৈদিক সাহিত্য অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, আমাদের সমাজের ভিত্তি পত্তন এইখানে। উত্তর কালে সাহিত্যের যে কিছু শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মূল অনুসন্ধানে এই থানে পৌঁছিতে হয়। ইহা ইতিহাসের কথা। এককালে বেদপন্থী সমাজ এবং দ্বিজাতি সমাজ অভিন্ন ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিল; চতুর্থ, শূদ্রবর্ণ, এই সমাজের অনুগত বা আশ্রিত হইলেও ইহার অন্তর্গত ছিল না। শূদ্রের সহিত দ্বিজাতির কিরূপ সম্পর্ক বা আচরণ ছিল, সেকথা এখন নাই বলিলাম। এককালে এই বৈদিক সাহিত্য উক্ত দ্বিজাতি সমাজের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য ছিল; এবং এই সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিলে highest available education হইত। হালের ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই সমাজকে যদি আর্য্যসমাজ বলা-যায়, তাহা হইলে সেকালের আর্য্যসমাজের highest education ছিল এই বৈদিক সাহিত্যে। আমি এইখানে একটা কথা একটু জোরের সহিত বলিতে চাহি; এই বৈদিক সাহিত্যের সমগ্র অংশে সেই আর্য্যসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ এবং সমান অধিকার ছিল। শুধু অধিকার ছিল বলিলে চলিবে না; এই highest available education প্রত্যেকের পক্ষে compulsory ছিল। সেকালের এই high education এর মূল্য একালের high education এর মূল্যের তুলনায় কোথায় দাঁড়ায়, সে বিচার এখানে তুলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। একালে আমরা

compulsory mass education এর কথা লইয়া আলোচনা করি। বড় বড় দেশে যাহা প্রচলিত হইয়াছে, এদেশেও আমরা সম্প্রতি সেই compulsory mass education এর স্বপ্ন দেখিতেছি; কিন্তু এই compulsory mass education সর্ব্বত্র primary education মাত্র। compulsory high education বোধ করি একালেও সর্ব্বত্র স্বপ্নাতীত। ভারতবর্ষে একটা বৃহৎ সমাজে এককালে পূর্ব্বে (অন্যূন ২॥০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে) তৎকালোচিত high education সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে compulsory ছিল, ইহা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অসাধারণ ঘটনা। আবার বলিতে চাহি, একালের সহিত সেকালের education এর মূল্যের তুলনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। অন্তত এইটুকু বলিতে পারি যে ইতিপূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিয়াছি তাহাতে যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলা সরল কৃষকের গান মাত্র নহে, এবং বেদের অন্ত্যভাগ যে উপনিষদ গুলি সেই শ্রুতি সাহিত্যের অন্তর্গত, সেই গুলির মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে একালের highest literature এর তুলনাতেও তাহাকে হটিতে হইবেনা, ইহা হালের পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, মন্ত্র হইতে উপনিষদ্ পর্য্যন্ত এই সমস্ত সাহিত্যের অধ্যয়নে দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ছিল, এবং প্রত্যেককেই উহার একদেশ না একদেশ অধ্যয়ন করিতে হইত। এখানে মনে রাখিবেন যে অর্থ না বুঝিয়া বেদ অধ্যয়ন অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং বেদের অর্থ বুঝিবার জন্য শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, (orthography, etymology,prosody,grammar)প্রভৃতি যে সকল বেদাঙ্গ রচিত হইয়াছিল তাহার Scientific value একালের তুলদাঁড়িতে নিতান্ত হীন নহে। বেদাঙ্গ নহিলে বেদ বুঝা যাইত না; এবং বেদাঙ্গের সহকারে বেদের অধ্যয়ন করিতে হইত। এই অধ্যয়নটা প্রত্যেকের পক্ষে compulsory ছিল।

উপনয়নের পর কিছুকাল আচার্য্যের নিকটে থাকিয়া অঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত, পরে আচার্য্যের অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহের অধিকার জন্মিত। বিবাহের পর অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহস্থালী করিবার অধিকার জন্মিত। তখন সে গৃহপতি বলিয়া গণ্য হইত, সমাজের সহিত তাহার সম্পর্ক দাঁড়াইত, এবং সমাজের protection এবং privileges পাইবার দাবী জন্মিত। এই উপনয়ন ব্যাপারটিকে আমরা বেদ বিদ্যালয়ে admission বলিতে পারি; এবং সমাবর্ত্তনকে diploma বা license লইয়া বাহির হওয়া বলিতে পারি। এই উপনয়ন এবং তৎপরবর্ত্তি সংস্কার না হইলে দ্বিজাতি সমাজেই স্থান হইত না। সমাজের বাহিরে পতিত হইয়া থাকিতে হইত। ফলে educated man না হইলে সে দ্বিজ হইতই না। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যপর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় এই বৈশ্যেরাই majority ছিল, অর্থাৎ mass of the free population ছিল। লাঙ্গল ধরা হইতে গরু চরান পর্য্যন্ত ইহাদেরই ব্যবসা ছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, এমন এক সময় ছিল যখন আর্যসমাজের জনসাধারণের পক্ষে কিছু না কিছু তৎকালোচিৎ high education একেবারে compulsory ছিল। কোনওরূপ রাজশাসনের সাহায্য ব্যতীত কেবল সামাজিক ব্যবস্থার সাহায্যে automatically সমস্ত সমাজে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিজের গলার পৈতাটাকে কেবল আর্য্যবংশে জন্মের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উহাকে তৎকালের university দত্ত diploma বলিয়া গ্রহণ করিত। একালে অবশ্য উপনয়ন ও সমাবর্ত্তনের তাৎপর্য্য পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। ব্যবস্থার খোসাটুকু আছে, শস্যটুকু নাই।

যেখানে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু না কিছু বিদ্যা দান করিতে হইবে, সেখানে সেই কার্য্যের জন্য যে একটা agency, একটা organis-

ation ব্যবস্থা করা কত উৎকট ব্যাপার, তাহা মনে করিতেই আমরা ভয় পাই। স্কুল কলেজের মত পাকাপোক্ত যন্ত্রবদ্ধ organisation সেকালে একেবারে ছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন। এই সকল ব্যাপার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; এবং পুরুষপরম্পরাক্রমে সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহার পরিচালনা সহজ সাধ্য নহে। Stateএর চেষ্টায় চালাইতে গেলে State যতদিন প্রবল থাকে, তত দিনই চলে; আবার একটুকু জবরদস্তিও আসিয়া পড়ে। আমাদের দেশে সমাজের মধ্যে একটা hereditary class এর উপর এই বেদবিদ্যাকে রক্ষা করিবার এবং প্রচার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের dutiesএর মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য পর্য্যন্ত সকলেই অধ্যয়নে বাধ্য ছিল। এই অধ্যয়ন ঋষিঋণ। কেবল আচার্য্যের গৃহে পঠদ্দশায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলে চলিত না, গৃহস্থের ও দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে উহা কর্ত্তব্য কার্য্যের ন্যায় পালন করিতে হইত। দেশ শুদ্ধ সকল লোককে অধ্যাপনায় বাধ্য করা চলে না; এই কাজটা কেবল ব্রাহ্মণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। শাস্ত্রের theory এই যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুইই করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজেও পড়িতে হইবে এবং দুই একটি ছাত্রকেও বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। বেতন লওয়াটা দোষের ছিল, কেন না education যেখানে compulsory সেখানে উহাকে free না করিলে চলিবে না; অথচ অধ্যাপকের জীবিকার দরকার; তজ্জন্য তিনি ছাত্রের কাছে personal service পাইতেন, এবং ব্রহ্মচারী ছাত্র গৃহস্থ বাড়ী হইতে ভিক্ষা আনিয়া গুরুকে অর্পণ করিত। এই ভিক্ষাকে সমাজের উপর taxation স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে; তবে এ tax voluntary ছিল; না দিলে হয়ত প্রত্যবায় হইত, কিন্তু কোনও State officer আসিয়া ঘটিবাটী বেচিয়া

লইত না। পাঠ সমাপনান্তে আচার্য্য ছাত্রের নিকটে কিছু দক্ষিণা আদায় করিতে পারিতেন। যাগযজ্ঞে যাজন দ্বারা ব্রাহ্মণদের অন্নরূপে জীবিকা সংস্থান হইত। কোনও বড়লোক যজ্ঞ করিলে তাঁহারা ভালরূপ দক্ষিণাই পাইতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কিংবা বৈশ্যের উপযুক্ত তৎকালে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও নিন্দিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, বড় বড় রাজা বড় বড় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিতেছেন; আবার দেখি তৎকালে ব্রাহ্মণেরা as a class নির্ধন, এ কথাও বলা হইয়াছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণদিগকে সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতও গৌরবের স্থান এবং কতকগুলা special privilege দিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ব্যবসায় hereditary হওয়ায় এই সকল privilegeএর অপব্যবহার হইত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ হইলেই যে ধার্ম্মিক এবং সদাচারী হইতে হইবে, মনুষ্যের চরিত্র এমন নহে। কিন্তু ইহা না করিলেও একটা বৃহৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষাদানের জন্য বহু শত বৎসর স্থায়ী এইরূপ automatically working organisation আর কিরূপে সম্ভব হইত তাহা মনে আনা কঠিন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর কয়েক সহস্র বৎসর গিয়াছে; এখনও আমাদের টোল চতুষ্পাঠীতে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সেই প্রাচীন ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সেই পুরাতন খোসার ভিতর নূতন শস্য দেওয়া সম্ভব হইতে পারে কি না, তাহা একালের educationistরা বিবেচনা করিতে পারেন।

"এই ব্রাহ্মণের উপর আর একটা মস্ত ভার আসিয়া পড়িয়াছিল। এই ভার সেই প্রাচীন বিদ্যাকে অর্থাৎ বেদ বিদ্যাকে রক্ষার ভার। সেকালে ছাপাখানা ছিল না; এমন কি লিপির আবিষ্কারও হয়ত তখন হয় নাই। এই বিদ্যা আচার্য্যদের মুখে মুখে থাকিত, এবং মুখে মুখে

পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইত। বেদের মন্ত্রে এবং ব্রাহ্মণে একযোগে বিপুলায়তন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; সেই সাহিত্যকে মুখে মুখে অবিকৃতভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সুসাধ্য নহে; অথচ ইহা revealed Scriptures; ইহার এক বর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হইতে দেওয়া চলিবে না। কার্য্যতঃ কিয়দংশের নাশ বা বিকার অবশ্যম্ভাবী। বেদের বহু অংশ যে এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়; অনেক বেদ লুপ্ত হইয়াছে ইহা মীমাংসকেরা স্বীকার করেন। ধ্বংস হইতে বেদকে রক্ষার জন্যই নাকি বেদব্যাসের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা পুরাণের কথা। এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের স্থান আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এত উচ্চে এবং একালেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত ইহার এত জড়াজড়ি, যে তাঁহাকে একেবারে mythical figure মনে করা প্রায় অসম্ভব। ইঁহার পিতা পরাশর ঋগ্‌বেদের একজন প্রধান ঋষি ছিলেন। ইঁহার কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া তেমন খ্যাতি না থাকিলেও জনসমাজের নিকট ইঁহার খ্যাতি পিতার খ্যাতিকেও ছাড়াইয়া আছে। ঋষি বংশধরগণের মুখে মুখে আবদ্ধ থাকিয়া যে বেদ লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, পৌরাণিক আখ্যায়িকা মতে ইনি সেই বেদ সঙ্কলন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভাগ করেন, এবং আপনার এক একজন শিষ্যকে এক এক বিভাগ রক্ষার ভার দেন। ঐ শিষ্যগণের আবার শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঐ সকল বিভাগ আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সাহিত্য কেবল মুখে প্রচারিত হয়, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পাঠভেদ ও বিকার অনিবার্য্য। কালক্রমে এই শাখাগুলিকে অবিকৃত রাখিবার জন্য নানা সম্প্রদায় চরণ বা Schoolএর উৎপত্তি হইয়াছিল। শৌনক এবং কাত্যায়ন প্রভৃতির হাতে বেদ সাহিত্যের index এবং concordance প্রস্তুত হয়। বেদের পাঠ-

শুদ্ধি রাখিবার জন্য নানারূপ পাঠের এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল; সমস্ত সংহিতার মধ্যে কত শব্দ আছে, এবং কত অক্ষর আছে, তাহা পর্য্যন্ত গণা হইয়াছিল। কোন মন্ত্রের কোন্ ঋষি, কোন্ ছন্দ, কোন্ দেবতা, কোন্ মন্ত্রের পর কোন্ মন্ত্র, কোন্ চরণের পর কোন্ চরণ, কোন্ পদের পর কোন্ পদ, এ সমস্তই গণিয়া বাঁধিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। একালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ফলে মোটের উপর এই বৈদিক সাহিত্য যত দীর্ঘকাল ধরিয়া যেরূপ অবিকৃত রহিয়াছে, আর কোনও দেশের কোনও সাহিত্য সেরূপ অবিকৃত নাই। একটা hereditary classএর উপর কার্য্যভার না দিলে, এবং তাহাদিগকে সামাজিক সম্মান না দিলে, এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইত কিনা, তাহার প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের সহিত আর একটা কিংবদন্তী জড়িত আছে। তিনি মহাভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি পুরাণ রচনা করিয়া আপন শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের মধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে এবং নানা রাজারাজড়াদের সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখিবেন, এইরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে। শুনঃশেফের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই সকল আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত; মাঝে মাঝে দুই দশটা পদ্য দেখা যায়, উহার নাম গাথা বা শ্লোক। পড়িয়াই বোধ হয় তৎ-কালের লৌকিক সাহিত্যে ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ গাথা বা শ্লোক বহুপরিমাণে প্রচলিত ছিল। একালেও যেমন রামায়ণের গান, চণ্ডীর গান আছে, সেকালেও সেইরূপ দেবতাদের বা রাজা রাজড়ার কথা সমাজে প্রচলিত ছিল, হয়ত উৎসবাদি উপলক্ষে জনসঙ্ঘ মধ্যে উহা গীত হইত। রাম-চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে লবকুশ রামায়ণ গাহিয়াছিলেন। জনমেজয়ের

যজ্ঞে বৈশম্পায়ন মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন; কুলপতি শৌনকের যজ্ঞে ঐ মহাভারত সৌতি কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছিল; এই সকল কিংবদন্তী ঐ অনুমানের সমর্থক। সম্ভবতঃ ঐরূপ গাথারই কিছু কিছু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সব আখ্যায়িকা আছে, তাহা পুরাণ এবং ইতিহাস নাম পাইলেও revealed literatureএর অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্‌ব্যতীত ঐ ধরণের একটা বহু বিস্তৃত popular literature ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ বিশাল popular literatureএরও প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—শ্রুতি এবং স্মৃতি। এই শ্রুতি হালের ভাষায় বৈদিক সাহিত্য। ইহা অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত নহে। ঋষিগণ ইহার প্রচারকর্ত্তা মাত্র।

তদ্ব্যতীত আর সমুদয় সাহিত্যই স্মৃতির অন্তর্গত। পুরাণ এবং ইতিহাস (একালে পুরাণ এবং ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝা যায়) কোনও না কোনও ব্যক্তির রচিত। এই সকল পুরাণ এবং ইতিহাসের মূল ও কতক কতক বেদের মধ্যে আছে। উহাকেই বিস্তারিত এবং পল্লবিত করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের বোধ্য ভাষায়, জনসাধারণের জন্য এই popular literature এর সৃষ্টি আবশ্যক হইয়াছিল। ইহার নাম স্মৃতি; ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক মূল স্মরণ রাখিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে theory এই যে, বেদের সহিত যে স্মৃতির বিরোধ দেখা যায়, সে স্মৃতি অগ্রাহ্য। যে স্মৃতির মূল কোনও বেদবাক্যে পাওয়া যায় না, সে স্মৃতি স্মৃতি নামের যোগ্য নহে। আধুনিক কালে এমন অনেক স্মৃতি আছে, যাহার বৈদিক মূল পাওয়া যায় না; এই সকল স্মৃতির প্রামাণিকতা লইয়া মীমাংসক

পণ্ডিত বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। স্মৃতি বাক্যের সহিত বেদ বাক্যের কোনও সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নানারূপ rules of interpretation প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে আমাদের Jurisprudence এর উৎপত্তি হয়। নিতান্তই যেখানে বৈদিকমূল পাওয়া যায় নাই, যেখানে বেদের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে, মীমাংসকেরা ইহা মানিয়া লইয়াছেন; নহিলে স্মৃতির প্রামাণিকতা থাকে না। কিন্তু কোনও স্মৃতি স্বতঃ প্রমান নহে। বেদের উপর basis আছে বলিয়াই উহার প্রামাণিকতা। বেদের ভাষা একে অত্যন্ত technical, তাহার পর ঐ ভাষা যখন অত্যন্ত পুরাতন এবং অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বেদের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য এই popular literature তৈয়ার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বেদের সমুদয় জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড এবং বেদের অন্তর্গত সমুদয় উপাখ্যান, কথা ও কাহিনী এতদ্বারা popularise করা হইয়াছিল। একালে যে সকল দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত প্রাছে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তাহার মূল। মন্বাদি প্রণীত বলিয়া যে সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচলিত আছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড তাহার মূল। তদ্ব্যতীত যে বিশাল সাহিত্য পুরাণ ও ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাও বৈদিক মূল হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বিপুলায়তন গ্রহণ করিয়াছে। এই খানে একটা কথা বলার দরকার যে, এই সমগ্র স্মৃতি-সাহিত্যে সকলেরই সমান অধিকার। এমন কি স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতিরও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। এ কথা শাস্ত্রের মধ্যেই আছে, যে পুরাণ এবং ইতিহাস মুখ্যতঃ স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির জন্যই রচিত হইয়াছিল; স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতিকে সমুদয় বেদের, অর্থাৎ বেদের সমগ্র জ্ঞানকাণ্ডের এবং কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্যই ইহার রচনা আবশ্যক হইয়াছিল। আজকাল কথায় কথায় বলা হইয়া থাকে যে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি নিজ হস্তে

রাখিয়াছিলেন; অন্য কাহাকেও সেখানে প্রবেশের অধিকার দেন নাই; ইহা কতদূর ইতিহাসসঙ্গত, তাহা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। সমস্ত দ্বিজাতি সমাজের—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং কৃষিজীবি বৈশ্য ইহাদের সকলেরই—সমুদয় বেদে পূর্ণ অধিকার ছিল। স্বধু অধিকার ছিল বলিলে চলিবে না, বেদ অধ্যয়ন তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, নতুবা সমাজে পতিত থাকিতে হইত, এমন কি গৃহস্থ ধর্ম্মেও তাহারা অধিকার পাইত না। এই জন্য প্রত্যেক দ্বিজবালককে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। যে সময় একালের মত স্কুল কলেজ উদ্ভাবনা সম্ভব হয় নাই, সে সময় বালিকার পক্ষে পরের বাড়ীতে অধিক বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নাই। খুব সম্ভব এই কারণেই স্ত্রীজাতি কালক্রমে বেদের ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়াছে। বেদের ভাষা অবিকৃত না থাকিলে বেদ অধ্যয়নে কোনও ফল নাই, এ ধারণা ছিল। ইতিহাসের প্রাক্‌কালে অনার্য্য শূদ্রদিগের সহিত আর্য্য দ্বিজাতির অনেক বিষয়ে বিরোধ ছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ দেখি না। কালক্রমে আর্য্যজাতির বসতিবিস্তারের সহিত শূদ্র জাতির সংখ্যা প্রভূতরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল; পূর্ব্বকালের বিরোধের হেতু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছিল। দ্বিজাতি-সমাজের আশ্রিত এবং অনুগত রূপে শূদ্রগণ সমাজে গৃহীত হইতেছিল। এই কৃষিপ্রধান দেশে এই শূদ্ররাই ক্রমশঃ বৈশ্যগণের স্থান গ্রহণ করিয়া mass of the population হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বৃহৎ population এর বালকগণকে উপনীত করিয়া আচার্য্য গৃহে বাসের ব্যবস্থা করা কোনও কালেই সম্ভব হয় নাই। আচার্য্য-গৃহে শিক্ষা না পাইলে বেদের ভাষা ব্যবহারে অধিকার দিতে বেদপন্থী সমাজ স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল; কেননা এই বৈদিক সাহিত্য আর্য্য সমাজের নিজস্ব জিনিষ। আর্য্য জাতির সমুদয় সমাজতন্ত্র

ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার প্রত্যেক বর্ণ inspiration লব্ধ; ইহা কোনও রূপেই বিকৃত করিতে দেওয়া চলিবে না। একটি বর্ণের ব্যত্যয় হইলেই ইহার মহিমা নষ্ট হইবে। কাজেই দ্বিজাতি সমাজ যক্ষের ধনের মত ইহাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ আগলাইবার জন্য যে কঠিন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি, এবং তাহার ফলও যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি। এই যে সঙ্কোচ এবং সঙ্কীর্ণতা, তাহা কেবল বেদের ভাষার পক্ষেই। এই ভাষাটা অনুপনীত স্ত্রীজাতি এবং অনুপনীত শূদ্র জাতির নিকট হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য কাহারও নিকট গোপন করা হয় নাই। বস্তুতঃ সর্ব্ব সাধারণের নিকট, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র জাতির নিকট, তাহাদের বোধ্য ভাষায় বহুলভাবে বেদবিদ্যা প্রচারের জন্যই স্মৃতি শাস্ত্রের এবং বিশেষতঃ পুরাণ ইতিহাসের রচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এইখানে মনে রাখিবেন যে, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষাদি সমুদয় বেদাঙ্গ, কপিলাদি প্রণীত সমুদয় দর্শন শাস্ত্র, মন্বাদি প্রণীত সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারতাদি সমুদয় কাব্য ও ইতিহাস এবং যাবতীয় পুরাণ উপপুরাণ ঐ স্মৃতি literatureএর অন্তর্গত। এ সমুদয়ই বেদের তাৎপর্য্য "উপবৃংহণার্থ" বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তটাই popularise করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, এবং এই সকল শাস্ত্রের গোপনার্থ কেহ কোনও রূপ চাবি তৈয়ারি করিয়া নিজের হাতে রাখেন নাই। অমুকের বেদে অধিকার নাই—ইহার অর্থ এই মাত্র যে, বেদের ভাষায় তাহার অধিকার নাই; বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকার নাই বলিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে।

"যাহা হউক, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহার যদি কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি

যে ঐ মহর্ষি একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়াইয়া প্রাচীন কালের সাহিত্য সঙ্কলন করিয়া, edit করিয়া, তাহা রক্ষার জন্য schools স্থাপন করিয়া, এদেশের যাহা Old Learning, যাহার উপর এদেশের সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা conserve করিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকেও তিনি ইতিহাস ও পুরাণ রচনার প্রবর্ত্তন করিয়া জন সাধারণের সমক্ষে স্ত্রী শূদ্র নির্ব্বিশেষে জ্ঞান প্রচার দ্বারা বিপুল চেষ্টায় mass education প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, এবং তৎকালোপযোগী New Learning এর অবতারণা করিয়াছেন। এই যুগাবতার মহর্ষিকে সমুদয় সমাজ একবাক্যে ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। বস্তুতঃই পৃথিবীর কোনও দেশের Literary ইতিহাসে এত বড় giant figure দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

"ইতিহাস পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র পুরুষরচিত শাস্ত্র; ইহার আক্ষরিক বিশুদ্ধি রক্ষার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বেদবিৎ সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তির প্রণীত বলিয়া ইহা সমাদৃত হইত; এবং বেদের সহিত বিরোধ না থাকিলেই ইহা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্য ও লোকমুখে পুরুষপরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছিল, এবং দেশভেদে ও কালভেদে পল্লবিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। একালে যে সকল পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, পণ্ডিতদের মতে উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সেরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। মূল মহাভারত, মূল রামায়ণ, মূল মনুসংহিতা, প্রভৃতি যে আমরা পাই নাই, তাহার প্রমাণ ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যেই আছে। যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহা খুব সম্ভব ঐ সকল গ্রন্থের final redaction; সম্ভবতঃ লিপি প্রচলনের পরে ঐ সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এ কালের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে ঐ সকল গ্রন্থকে স্থান দিতে চাহেন। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে যখন বৈদিক ধর্ম্ম নষ্ট ও বেদমূলক

শাস্ত্র গ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল—সেই সময়ে প্রচলিত tradition অবলম্বন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা যেমন সঙ্গীতি ডাকিয়া আপনাদের শাস্ত্র সঙ্কলনের ও রক্ষার ব্যবস্থা করিত, বেদপন্থী সমাজেও হয়ত সেইরূপ কোনও চেষ্টা হইয়াছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন Brahmanic Revival হয়, সেই সময় হইতে নরপতিগণ হয়ত বেদপন্থীর প্রচীন শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহার authorised version প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—এবং বহু শত বৎসর ধরিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছিল। একবার লিপিবদ্ধ হইয়া গেলে আর বিকারের তত সম্ভাবনা থাকেনা। কোনও একটা authorised version কোনও চক্রবর্ত্তী রাজা তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে চালাইলে তাহা টিকিয়া যায়।

ফলে ভারতবর্ষের বিপুল স্মৃতি সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যাহা আমরা পাইয়াছি তাহা ঐরূপ final redaction মাত্র; তাহার মধ্যে কতটুকু আধুনিক, কতটুকু প্রাচীন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা কঠিন। ভবিষ্যতে criticismএর অপেক্ষায় এজন্য আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্য সমাপ্ত হওয়ার পর এবং স্মৃতি সাহিত্যের এই সকল নূতন সঙ্কলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে হাজার খানেক বৎসরের সাহিত্য আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সাহিত্য পুনরুদ্ধারের আর আশা নাই। বেদে যে সকল myth উপাখ্যান ideas ও concepts আমরা অপুষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাই, এবং পৌরাণিক সাহিত্যে পূর্ণ পল্লবিত অবস্থায় দেখিতে পাই, মাঝের এই gapটা কোনওরূপে পূর্ণ না হইলে, ইতিহাসের ধারা সঙ্কলন কাহারও সাধ্য হইবে না। এমন কি, একালের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে যে সকল নূতন কথা দেখিতে পান, এবং হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্য তাহা বৌদ্ধ সাহিত্যের নিকট ঋণ করিয়া লইয়াছেন মনে

করেন, তাহারও গোড়া হয়ত এই লুপ্ত সাহিত্য মধ্যে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়েই সেই মধ্যবর্ত্তী সাহিত্য হইতে আপন আপন সাহিত্য develope করিয়া লইয়াছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণু পুরাণের tradition ধরিয়া যদি আমরা যুধিষ্ঠিরকে নন্দাভিষেকের হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ধরি, তাহা হইলে এই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাসের কয়টা missing link অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

অথচ এই হাজার বৎসরের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয় ত অত্যন্ত ঘটনা-বহুল যুগ। এই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র একটা পুনর্গঠন ঘটিয়াছিল। রেশমের পোকা যেমন কীটের অবস্থা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য গুটির মধ্যে লুকাইয়া থাকে, এবং তাহার পরে একেবারে নূতন আকৃতি গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি সাজিয়া বাহিরে আসে; আমাদের সমাজের এটাকেও সেইরূপ গুটিপোকার অবস্থা ( chrysalis stage ) মনে করিতে পারি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আর্য্য সভ্যতা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথও ছাইয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্বে অনার্য্য শূদ্রের সহিত আর্য্য দ্বিজাতি সমাজের যে বিরোধের সম্পর্ক ছিল, তাহা এই সময়ে অন্তর্হিত হয়,—এবং দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার সহিতও আর্য্য সভ্যতার আদান প্রদান ঘটিয়া বৈদিক সমাজের পুনর্গঠন ঘটে। এই যুগের শেষভাগেই পারসীক, গ্রীক, শক প্রভৃতি বিদেশীয়েরা তাহাদের নূতন আচার নূতন ভাব লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এবং ভারতবর্ষের সমাজে স্থানলাভ করিয়া মিশিয়া যায়। তৎপূর্ব্বে কোন বিদেশীর ভারতবর্ষ আক্রমণের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আর্য্য শূদ্র ও দ্রাবিড়ীয় ও অবশেষে বৈদেশিক,—এই সকলকে লইয়া এক থলে পিষিয়া মাড়িয়া যে নূতন আকারের culture প্রস্তুত হইয়া-

ছিল,—এই বিপুল synthesis এবং reconstruction ব্যাপারের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

এই যুগ ধরিয়া দেশের মধ্যে যে একটা বিপুল ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই; সমাজের মধ্যে দলে দলে free thinkers এর দল দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। ঐ সমাজ কস্মিন্ কালে free thinkingএর অন্তরায় হয় নাই। খাঁটি বেদপন্থী সমাজ বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াআছে সত্য; কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুরা স্বাতন্ত্র ছিল। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সমাজের মত কোনও সঙ্গীতি ডাকিয়া বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোনও রূপ চেষ্টা হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ নাই; এবং সেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রাজার আদেশে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সমাজ মধ্যে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের সমাজের বেদপন্থীর জন্য কোনওরূপ কাটা ছাঁটা creed নাই; এবং সেই creedকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চালাইবার জন্য কোনও Pope বা কোনও Caesar প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয় নাই। ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণের প্রশ্রয় দিত না, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু কেহ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিত ; এবং কালক্রমে সন্ন্যাসীর বাঁধা দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসীদের উপর সামাজিক শক্তির, এমন কি রাষ্ট্রীয় শক্তির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না। সমাজ কিছু বলিতে চাহিত না। গৃহীর পক্ষে যে সকল বিধি নিষেধ ছিল, ইহাদের উপর সে সকল বিধিনিষেধ কিছুই ছিল না।—লোকালয় হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ইহারা অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকিতে পারিত। ইহার ফল ভাল মন্দ দুই রকমই হইয়াছিল। সে সকল কথা এখন থাক।

এই সকল সন্ন্যাসী দলের মধ্যে বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীর দল বেদপন্থী হইতে কতকটা বেশীদূরে গিয়াছিল। এই দল জগতে যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও

স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। এ কালের হিন্দু সমাজের মধ্যে এবং আধুনিক খ্রীষ্টীয় সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কতখানি ব্যাপিয়া আছে, তাহা যতদিন নিরপেক্ষ ভাবে মাপিয়া দেখা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন ব্যাপারের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপিত হইবে না। অথচ বুদ্ধদেব যে ভারতবর্ষে খুবই একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন কথা প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আমি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের হাজার খানেক বৎসরের ফাঁকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সময়ের সাহিত্য যদি লুপ্ত না হইত, তাহা হইলে হয়ত দেখা যাইত যে, বুদ্ধ দেবের আবির্ভাব তৎকালে একটা অসাধারণ আকস্মিক ঘটনা অথবা একটা বিপ্লবের সূচনা বলিয়া কেহ মনে করে নাই। একটা জিনিষ তিনি নূতন আনিয়াছিলেন,—তাঁহার অলোকসামান্য Personality। ঐতিহাসিক যুগে ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের মধ্যে এত বড় মহাপুরুষের যে আবির্ভাব হয় নাই, ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের সকল দিক দিয়া দেখিলে এবং সমস্ত মানব জাতির উপর, সমস্ত মানব ইতিহাসের উপর, তাঁহার প্রভাব দেখিলে একথা না মানিলে চলিবে না। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের দিনে সমস্ত জীবের উপর যে করুণাধারার অভিষেক হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই Personality'র কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিকে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে যে খুবই একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। জ্ঞানকাণ্ডে তিনি যে আর্য্যসত্য প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা নহে। বেদান্তের অদ্বয়বাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলা হইয়া থাকে। ইহা কতকটা ঠিক বটে, আবার সম্পূর্ণ ঠিক নহে। এই অদ্বয় বাদ যে শঙ্করাচার্য্যই প্রথম আবিষ্কার করেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যায়

না। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে ঋগ্বেদ সংহিতার অন্তর্গত অম্ভৃণ-ঋষিকন্যা দৃষ্ট বিখ্যাত দেবী স্থক্তের যদি কোনও তাৎপর্য্য দেওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ অদ্বয় বাদ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অদ্বয়বাদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এই অদ্বয় বাদ মতে আত্মা অথবা আমি একমাত্র সৎ পদার্থ, যাহার সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ মাত্র হইতে পারে না; আর যাহা কিছু আমার objectরূপে প্রতীয়মান হয়, সে সমস্তই আমার পক্ষে প্রাতিভাসিক বা phenomenal মাত্র, অথবা ব্যাবহারিক বা pragmatic মাত্র। এই হিসাবে জগৎ মিথ্যা। উহার ভিতরে আমা হইতে স্বতন্ত্র, আমা হইতে নিরপেক্ষ স্বাধীন কোনও substance নাই। বুদ্ধদেবের প্রচারিত জগৎতত্বে বেদান্তের এই শেষ কথাটুকু মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদান্তী এবং বৌদ্ধ উভয়েই extreme idealistic position গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরেই বেদান্তী এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে মস্ত প্রভেদ। প্রতীয়মান জগৎ যে প্রত্যয়ের পরম্পরা মাত্র, এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নিরস্ত হয়েন; এই প্রত্যয় পরম্পরার basis কোথায় সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতে চাহেন না। Empirical Philosophy জগৎ ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করিয়া যতদূর যাইতে পারে, বৌদ্ধ ততদূর পর্য্যন্ত গিয়াছেন; হয়ত তাহার অধিক যাওয়া Empirical Philosophyর পক্ষে আবশ্যকও নহে, এবং উচিতও নহে। কিন্তু বেদান্ত এখানে থামিতে পারেন নাই। তিনি বৌদ্ধ-স্বীকৃত এই বিশ্বজগৎ রূপ ভুয়া বাজির ভিতরে একটা তত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই তত্ব আর কিছু নহে,—আমি; ইহাকে আত্মাই বল আর ব্রহ্মই বল, Self বল Ego বল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বেদান্ত এই পরম পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দিহান নহেন। ইহাই তাঁহার মতে একমাত্র সৎ পদার্থ; যাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ সংশয় মাত্র চলে না।

এই আমি কোনও রূপ তর্কের বা বিচারের বিষয় নহে; ইহা একেবারে উপলব্ধির বা সাক্ষাৎকারের বিষয়। যতক্ষণ উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ হাজার বিতর্কেও ইহার সন্ধান মিলিবে না। এমন কি সাধনার পথে নামিলেও ইহার আসে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে। কিন্তু একবার কোনও রূপে তাহার দেখা পাইলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে। তখন ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। বৌদ্ধ দেখা পান নাই, তাই তাহার অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না। তিনি ঠিকই বলিতেছেন; তর্কের দ্বারা যখন তাঁহাকে মানাইতে পারিব না, তখন তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ কি?

এইখানে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। বেদান্ত যাহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৌদ্ধ তাহার কোনও প্রমাণ পান না, অতএব মানিতে চাহেন না। দুয়ের মধ্যে কোনও রূপ সামঞ্জস্য সাধন একেবারে অসম্ভব। দুয়ের মধ্যে গোড়ায় অনৈক্য থাকায় practical conduct ব্যাপারে উভয়কে কতকটা ভিন্ন পন্থা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। এই practical জগৎ ব্যাপারটাকে উভয়েই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ধরিয়া লইয়াছেন; এই অবিদ্যা,—জ্ঞানের অভাব অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে আমার আনন্দের জন্য বদ্ধ সাজিয়া সুখ দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি। সুখের অভিনয়ের সহিত ইহাতে যে দুঃখের অভিনয় দেখা যায়, সেও আমার আনন্দেরই জন্য; কেন আমি আমার এই দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি, এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই আমার স্বাধীনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ হয়। আমি সর্ব্ববন্ধনমুক্ত; আমার এই লীলাভিনয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

বৌদ্ধের পক্ষে এ পথে যাওয়া অসম্ভব। তিনি এই আনন্দস্বরূপ

আত্মাকে একেবারে দেখেন নাই; এবং প্রতীয়মান জগতে যে মহাদুঃখ বিদ্যমান, সেই দুঃখকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এই দুঃখকেই তিনি অন্যতম আর্য্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় জীবের দুঃখ দেখিয়া যে উথলিয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময় কি? বোধিদ্রুমতলে সম্বোধিলাভের সময় তিনি সেই দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই দুঃখ নিরোধের নাম,—নির্ব্বাণ। বেদান্তের মুক্তি আর বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, এই দুইয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। মানুষে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এটা সকলেই মানে। কেবল মানুষ কেন, জীব মাত্রকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমন কি sentient জীবের পক্ষে সুখ লাভের এবং দুঃখ বর্জ্জনের নিরন্তর চেষ্টাই জীবন। ঐ চেষ্টার সমাপ্তিই জীবের মৃত্যু। ইহা Cosmic Process-এর অন্তর্ভুক্ত। এই Cosmic Processটা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা মানে না; আপন মনে আপন নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলে; ইহার উপর মানুষের প্রভুত্ব নাই, বরং মানুষ ইহার অধীন হইয়াই সুখ দুঃখ ভোগ করে। এখানে Law of causality বিদ্যমান; তাহাকে নিয়তি বলিতে পারা যায়; উহা নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম। বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থী উভয়েরই ভাষায় ইহার নাম,—ঋত নিয়ম।

মানুষ ইহার অনুগত হইয়া চলিলে সুখ পায়; প্রতিকূল ভাবে চলিলে দুঃখ পায়; ইহা সেই নিয়তির ব্যবস্থা। ঝড়বৃষ্টি ভূকম্পের উৎপাত হইতে আগুনে হাত পোড়া পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা। ইহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনওরূপ সম্পর্ক নাই; সমস্ত Physical Science এই নিয়তির জটিলতা উদ্ঘাটনে নিযুক্ত আছে। এই নিয়তির কাছে প্রধান পাপ,—অজ্ঞতা। Physical Law সাধু অসাধু বিচার করে না; নির্ব্বিচারে সকলকেই সমান দণ্ড দেয়।

Biological Law ইহারই একটা particular aspect. Physical এবং Biological Science মানুষের অজ্ঞতা দূর করিয়া মানুষের সুখ বৃদ্ধির ও দুঃখ হ্রাসের চেষ্টা করে। ব্যাপারটা Natureএর সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন মাত্র। Biologyর উপর প্রতিষ্ঠিত একালের Sociology নানা উপায়ে মানুষকে এ বিষয়ে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। Utilitarian Ethics এবং Evolutionary Ethics ইহার উপর উঠিতে সাহস করে না। তাহারাও এই cosmic process এর দোহাই দিয়া মানুষের কর্ত্তব্য নিরূপণের চেষ্টা করে; এমন কি ethical conductএর ও basis এবং sanction খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। আমার 'কর্ম্মকথা' নামক পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধেই আমি এই পথে গিয়াছি; এবং Evolutionary Ethics হইতে এই সমস্যার যতটা সমাধান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে না; সেই জন্য একটা tribe, community অথবা stateএর অধীনতা স্বীকার করিয়া সাধারণের হিতের জন্য আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; এবং যে কর্ম্ম এই সাধারণ হিতের অনুকূল, তাহা নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। দলের সহিত দলের, stateএর সহিত stateএর, অবিরাম জীবন যুদ্ধে natural selectionএর প্রভাবেই মানুষের যে সকল প্রবৃত্তি সমাজ হিতের অনুকূল, তাহা আপনা হইতে evolved হইয়া উঠিতেছে। Evolutional Ethics এইরূপে মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানের বা conscience এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। আমার কর্ম্মকথায় ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আসল কথাটার সমস্যা ইহাতে মিলে না। সমাজ হিতের জন্য বা লোক হিতের জন্য মনুষ্য যে ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা খাঁটি

morality নয়। গোড়াতেই যখন ধরা হইতেছে, যে সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সমাজের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার, তাহা শেষ পর্য্যন্ত নিজের জন্যই ত্যাগ স্বীকার। যে ত্যাগের ভিতরে স্বার্থের কিঞ্চিৎ গন্ধ মাত্র আছে, তাহা বিশুদ্ধ morality হইতে পারে না। যে goodএর জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করে, উহাকে good of the greatest number বল, আর good of humanity বল, জমকাল নামের আবরণের ভিতরে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে। এবং স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যে ত্যাগ,—উহা যত বড়ই হউক, উহাতে একটুকু মলিনতা থাকে। Scienceএর তরফ হইতে ইহার উপরে আর যাওয়া চলে না। কাজেই খাঁটি morality ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এমন সব কথা আনিতে হয়, যাহা scienceএর আলোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়ে, এবং science তাহা শুনিয়া ঘাড় নাড়েন। Natural selectionকে নিংড়াইয়া cosmic process হইতে যতটা আদায় করিতে পারে, তাহা আদায়ের পর অন্য পথ আশ্রয় করিতে হয়। কর্ম্মকথার শেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞে' আমি সেই নূতন পথের আভাস দিয়াছি।

ভাল কাজের ফল ভাল না হইলে ভাল কাজের কোনও motive পাওয়া যায় না ; এবং cosmic processএ মানুষের জীবনে ভাল কাজের ফল ভাল হয় না দেখিয়া বেদপন্থী ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ উভয়কেই Natureএর order এর পাশাপাশি আর একটা Order এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে কর্ম্মনিয়ম—বা Moral order। এই জন্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ উভয়েই একটা অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ স্বীকার করেন ; সধারণতঃ ইহারই নাম transmigration বা জন্মান্তর গ্রহণ। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল মানুষকে ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়, এবং এ জন্মের কর্ম্ম

ফল পর জন্মে ভোগ করিতে হয়; এইরূপে জন্ম পরম্পরায় বিচরণের নাম—সংসার। Scienceএর বর্ত্তমান অবস্থায় এই জন্মপরম্পরার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। একালের কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক পরজন্ম মানিতেছেন, কিন্তু যে প্রমাণটুকু নহিলে উহা সর্ব্বসম্মত বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, সে প্রমাণ এখন উপস্থিত নাই। মৃত্যুর পর কোনওরূপ সুক্ষ্মতর দেহ অবলম্বন করিয়া মানুষ থাকে কি না তাহা বিজ্ঞানেরই আলোচ্য। ভবিষ্যতের বিজ্ঞান শাস্ত্র ইহার হয়ত উত্তর দিবে; বর্ত্তমানে সে তর্ক তুলিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধের পক্ষে moral science গড়িবার জন্য এই hypothesis আবশ্যক হইয়াছে। এ জন্মের যত কিছু কষ্ট, তাহা গত জন্মের অসৎ কর্ম্মের ফল, এবং এ জন্মের সৎকর্ম্মের পুরস্কার এ জন্মে না পাইলেও পরজন্মে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে পারিলে moral conductএর একটা sanction পাওয়া যাইতে পারে। Nature এর orderএ যেমন একটা causationএর chain বাঁধা আছে, moral orderএ ও সেইরূপ একটা কর্ম্মপ্রবাহের chain বাঁধা আছে। উভয়ই মানুষ হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। উভয়কেই নিয়তি বলিতে পারা যায়। জীবমাত্রেই, দেবতারা পর্য্যন্ত,—এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত,—এই নিয়তির অধীন; তাঁহারাও কর্ম্মবশতঃ দুই রকমের অধীনতা, unmoral cosmic processএর অধীনতা, এবং moral ultracosmic processএর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। এই অধীনতাই জীবের পক্ষে প্রকৃত বন্ধন এবং এই বন্ধনের ফল কখনও সুখ কখনও দুঃখ। কেবল ইহজীবনে নহে, জীবনপরম্পরায়; সুখে দুঃখে মিশিয়া জীবন পরম্পরা চলিয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ ইহাতে

দুঃখের ভাগটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন; তাহাতে কিছু যায় আসে না।

স্বকৃত কর্ম্মের ফলে এই জন্ম জন্মান্তরের ভ্রমণ হইতে কোনও রূপে খোলসা না পাইলে এ দুঃখ হইতে নিস্তার নাই। বৌদ্ধ এবং বৈদান্তিক এই নিস্তারের পথ দেখাইয়াছেন। বেদান্তী বলেন, আমি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত পুরুষ; কেবল নিজের আনন্দের জন্য একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, এবং সেই জগতে যে নিয়তি দেখা যাইতেছে সেই নিয়তির বন্ধন স্বীকার করিয়া, একটা সুখ দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি মাত্র। আমি মুক্তই; আমার এই বদ্ধবৎ আচরণে আমার আনন্দ। বাহির হইতে অন্য কেহ আমাকে এই বাধ্যবাধকতায় আনে নাই। আমি পূর্ণকাম অথবা আপ্তকাম। আমার কোন কামনা না থাকিলেও কেবল মজা দেখিবার জন্য এই লীলাভিনয় করিতেছি মাত্র। কাজেই এই জন্মজন্মান্তরে পরিভ্রমণ ব্যাপারটাই একটা ভুয়াবাজি বা কৌতুক মাত্র। বাহিরের যে নিয়তির—natural orderই হউক বা moral orderই হউক—যে নিয়তির অধীনত্ব আমি স্বীকার করিয়াছি, সে নিয়তিটাও আমার এই খেলার জন্য সৃষ্ট। স্বকল্পিত নিয়মের বন্ধনে সুখ দুঃখ ভোগের অভিনয় করিয়া আমি আনন্দ পাইতেছি; অন্য কেহ আমাকে দুঃখ ভোগে বাধ্য করে নাই। আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমেই যাহাকে দুঃখ বলে, তাহাই ভোগ করিতেছি। দুঃখনিবৃত্তির solution ত আমার হাতেই রহিয়াছে। আমি দুঃখী নহি, দুঃখভোগের অভিনয়কারী মাত্র। আমি চিরমুক্তই, কাজেই আমার পক্ষে 'কিরূপে মুক্তিলাভ করিব' সে কথাই উঠিতে পারে না।

আমা ভিন্ন অন্য জীব কেন দুঃখ ভোগ করে, এবং কিরূপে সে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, সেরূপ প্রশ্নই বেদান্তের কাছে উঠে না; কেন

না বেদান্ত অন্য জীবের অস্তিত্বই মানেন না। মৎসদৃশ আর যে সকল জীবকে রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই, আমি তাহাদিগকে আমার অভিনয়ের জন্য তৈয়ার করিয়া লইয়াছি মাত্র। তাহাদের কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই।

বৌদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ বলেন, তাহা বেদান্তের এই মুক্তির সঙ্গে ঠিক এক নহে, হইতেই পারে না; কেননা, বৌদ্ধ এই আমার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধের নিকটেও জগৎ প্রত্যয়পরম্পরামাত্র; কিন্তু কাহার প্রত্যয়? এ প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন, কাহারই নহে। প্রত্যয় আছে বটে; কিন্তু সে প্রত্যয়ের অনুভবকর্ত্তা কেহ নাই। বেদান্তের নিকট যে আত্মা বা self বা আমি স্বতঃসিদ্ধান্ত পদার্থ, বৌদ্ধের কাছে তাহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণই নাই। এই selfএর যখনই তিনি অনুসন্ধান করিতে যান, তখনই তিনি selfকে দেখিতে পান না। Perceptionটাই দেখা যায়; কে perceive করিতেছে, তাহাকে দেখা যায় না। কর্ম্ম আছে, কিন্তু কর্ম্মের কোনও কর্ত্তা নাই। দুঃখের ভোগ আছে, কিন্তু দুঃখ ভোগ করিবার কোনও লোক নাই। আমি একজন আছি, এবং সেই আমি ইহ জন্মে এবং জন্ম জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা মনে করাই ভুল। ইহাই অবিদ্যা। কাজেই আমি নাই; অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিবার কেহ নাই, এইটা মনে করিলেই, অর্থাৎ অবিদ্যাটা দূর হইলেই দুঃখের অস্তিত্বে কিছুই যাবে আস্‌বে না। ঐ ভ্রমটা বা অবিদ্যাটা গেলেই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর মানুষের কি অবস্থা থাকে, তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা এবং আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, উহা দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। তখন দুঃখ কিছুই থাকে না। দুঃখ একটা প্রত্যয় মাত্র। এবং সেই প্রত্যয়টা অবিদ্যা-জাত; অর্থাৎ একটা ভ্রম মাত্র। ইহা বুঝিলে আর দুঃখ কোথায় থাকিবে? অতএব নির্ব্বাণের অবস্থা পরম শান্তির অবস্থা। কেবল এইটুকু বলিয়া

অনেকে তৃপ্ত থাকিতে চাহেন না। যে অবস্থায় দুঃখ নাই বা কেবল শান্তি আছে, তৎপ্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই উহাতে আনন্দ থাকিবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও যেখানে নির্ব্বাণের অবস্থাকে আনন্দের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা আছে, এই দলের পণ্ডিতেরা সেই সকল স্থানকে প্রমাণ বলিয়া দেখান। কিন্তু ইহাতে logic এ বাধে। বৌদ্ধ যখন আত্মাকে বা জীবকে মানেন না, কোনওরূপ অধিকারী নিত্য বস্তু মানেন না, তাঁহার কাছে Life যখন কোনওরূপ Being নহে, কেবল একটা Becoming মাত্র, এবং সেই becomingএর অন্তস্তলে কোনও substance নাই, তখন নির্ব্বাণের অবস্থাকে আনন্দের অবস্থা কিরূপে বলা যাইবে, শান্তির অবস্থাই বা কিরূপে বলা যাইবে? বৌদ্ধ মতকে যে Idealistic Nihilism বলা হয়, তাহা এড়াইবার কোনও উপায় দেখি না। Nihilist বলিলে বৌদ্ধও সম্ভবতঃ দুঃখিত হইবেন না। বৌদ্ধ মতের logical পরিণতি মাধ্যমিকদের শূন্যবাদে। Life অবশ্যই becoming মাত্র; এবং সেই becomingএর ধারাটা বা courseটা ধরাবাঁধা নিয়তির অধীন। ইহা একেবারে determinate; কাহারও কোনও তোয়াক্কা না রাখিয়া আপন মনে আপন পথে চলিতেছে। কিন্তু ইহা দেখিতেও কেহ নাই, ইহা ভুগিতেও কেহ নাই। ঐরূপ যে ঘটিতেছে, ইহা মনে আনাই যখন অবিদ্যা, তখন সেই অবিদ্যা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই এই becoming। অবিদ্যা লোপের বা নির্ব্বাণের সহিত ঐ becomingটাও লুপ্ত হয়। উহা শূন্য। এই শূন্য মানে কি? মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন "উহা আছে, তাহা বলিব না; উহা নাই, তাহাও বলিব না।"

কাজেই বেদান্তীকে কখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা চলে না। জগৎ প্রত্যয়পরম্পরা; এবং এই প্রত্যয়পরম্পরা আপাততঃ determinism

এর অধীন; এইটুকু উভয়েই স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্তী জোরের সহিত বলিলেন যে প্রত্যয় পরম্পরার সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সাক্ষী একজন আছেন। সে আমি বই আর কেহ নহেন। আমি আমার আনন্দের জন্য এই determinismএর সৃষ্টি করিয়া এবং আপনাকে সেই বন্ধনের পাশে বদ্ধ করিয়া বদ্ধবৎ আচরণ করিতেছি, এবং বদ্ধ সাজিয়া খেলা করিতেছি।

Physical ও moral উভয় orderই যদি এই রকম ভুয়া বাজি হয়, তাহা হইলে মানুষ কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করিবে, এই একটা বিষম প্রশ্ন উঠিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য সবই মিথ্যা হইয়া যায়। কোনও রূপ বিধি নিষেধও থাকে না। কাজেই এই মত প্রচারের ফলে Antinomian—ism বা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। কাজেই এই মতটা শেষ পর্য্যন্ত anti-social এমন কি immoral হইয়া পড়ে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই মত প্রচারের ফলে যে এইরূপ কুফল ঘটিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। বৌদ্ধের নির্ব্বাণলাভ বা বেদান্তের মুক্তিলাভ এক হিসাবে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ; ইহা বুঝিলে কর্ম্মে আসক্তিও থাকে না, প্রবৃত্তিও থাকে না। কিন্তু বুঝিয়াছি মনে করিলেই বুঝা হয় না। নির্ব্বাণ বা মুক্তি একটা Ideal মাত্র। জীবের যত দিন জীবন, তত দিন সে বদ্ধবৎ আচরণে বাধ্য। এই বন্ধনের অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগের কাহারও ক্ষমতা নাই; এবং cosmic proces এর অধীন থাকিয়া, Physical ও Moral উভয় order এর অধীন থাকিয়া, দুঃখ বর্জ্জনের এবং সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকে বাধ্য। বৌদ্ধ বলেন,—আচ্ছা কর্ম্ম যখন তোমাকে করিতেই হইবে, তাহার ফলে সুখ ইহজন্মে না পাও, পর জন্মে নিশ্চয়ই পাইবে। কোন কাজটা ভাল কাজ ও তাহার ফল সুখ, ও কোনটা মন্দ ও তাহার ফল দুঃখ, কর্ম্ম নিয়মে তাহা নির্দ্দিষ্টই আছে। ইহাই বুদ্ধদেবের আষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাই সদ্ ধর্ম্ম। বৌদ্ধমতে ইহার প্রমাণ বেদ নহে, ইহার প্রমাণ ভগবান তথাগতের উক্তি।

এই ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ তথাগত মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইয়া ইহা পুনরায় প্রচার করেন। তথাগতের মাঝে মাঝে আবির্ভাব,—ইহাও cosmic process এর সামিল ; ইহার নাম ধর্ম্মনিয়ম। গাছে যেমন মাঝে মাঝে ফুল হয়,সর্ব্বদা হয় না, ইহাও তদ্রূপ। বেদান্তও ঠিক সেই রূপ বলেন। বন্ধনের দশায় কর্ম্ম ত্যাগের কোনও উপায় নাই। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন ভাল কাজ কর, ভাল ফল পাইবে ; এখন না হউক পরে। মন্দ কাজ করিলেও দুঃখ পাইবে, এখন না হউক, পরে। কোন্ কাজ ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিবেন, ইহাও নিয়তি নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা রহিয়াছে ; তুমি দেখিয়া লও।

এই ধরা বাঁধা কর্ম্ম-নিয়ম সকলে স্বচক্ষে দেখিতে পায় না। যারা দেখিতে পায় না তাহাদিগকে বলা হয়, ঋষিগণ ইহা দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যেরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কাজ কর ; অথবা তাঁহাদের বাক্য স্মরণে রাখিয়া মহাজনেরা যাহা বলেন, অথবা যাহা করেন, সেই মতে কাজ কর। অতএব ধর্ম্মের প্রমাণ,—শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার। ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা প্রায় একবাক্যে ধর্ম্মের আর একটা চতুর্থ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন ;—উহার নাম আত্ম তুষ্টি। টিকাকারদের মধ্যে অনেকে এই কথাটার সঙ্কীর্ণ অর্থ লইয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেখানে কর্ত্তব্য পথ দেখায় নাই, সেখানে নিজের যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই মতে কাজ কর। আমি কিন্তু এটাকে ছোট কথা মনে করি না। আত্মার যাহাতে পরিতোষ হয় ;—এখানে আত্মা অর্থে নিশ্চয়ই বেদান্তের আমি, যিনি আনন্দের জন্য এই বিশ্ব সৃষ্টির অভিনয় করিয়াছেন, এবং জীব সাজিয়া সেই জীবের অন্তর্যামী রূপে জীবকে কর্ত্তব্য পথে প্রেরণ করিতেছেন। ছোট করিয়া বলিলেই ইহাকে conscience বলা হয়, এবং এই Conseience এর প্রেরণাই কর্ত্তব্য পথে শেষ প্রেরণা এবং প্রধান প্রেরণা।

হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েই মানিয়া লইতেছেন যে ভাল কাজের ফল ভাল হইবেই। Physical science এ কথার কোনও প্রমাণ না দিলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের কাছে Moral Science এর ভিত্তি পত্তন এখানে। কোন কাজের ফল ভাল, কোন কাজের ফল মন্দ, তাহা এক রকম ধরা বাঁধা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা মতামতের কোন অপেক্ষা করে না। মানুষকে কেবল উহার আবিষ্কার করিয়া তদনুসারে আপনার জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। সকলের পক্ষে উহার আবিষ্কার সাধ্য নহে; সেই জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাঁহাদের সেরূপ চোখ আছে; তাঁহারা নিজে দেখেন এবং অন্যকে দেখাইয়া দেন। বৌদ্ধ মতে বুদ্ধগণ ও হিন্দুমতে ঋষিগণ ইহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধের নিকট ভগবান বুদ্ধগণের যে স্থান, আমাদের নিকট বেদের দ্রষ্টা ঋষিগণের সেই স্থান। অন্যান্য সমাজের নিকট মুসা, ও অন্য নবিগণ এবং মহম্মদের কতকটা সেই স্থান। এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ বিধি নিষেধ রূপে জনসমাজে প্রচারিত হয়। ইহাকে মোটামুটি কর্ম্মের পথ, সাধনার পথ, Religion of Law এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জনসমাজে অধিকাংশ লোকই এই পথ ধরিয়া ধর্ম্মাচরণ করে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বলিবেন কর্ম্মের পথে মুক্তি বা নির্ব্বাণ আদৌ হইতেই পারে না। কেননা কর্ম্ম যতই সৎকর্ম্ম হউক না কেন, উহার একটা না একটা ভাল ফল হইবেই। সেই ফল ভোগ করিতেই হইবে; এবং ফল ভোগ মাত্রই বন্ধন। লোহার পিঁজরায় না হোক, সোনার পিঁজরায় বন্ধন। অধিকাংশ স্থলে ইহার ফল অস্থায়ী। যেখানে স্থায়ী ফল হয় সেখানেও দেবযান পথে, ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকে, বা গোলোকে, স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি ঘটে। ঐ সকল লোকে গেলে আর ফিরিতে হয় না। চিরস্থায়ী সুখের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই চিরস্থায়ী সুখ বেদান্তের মুক্তি

নহে। বৌদ্ধের নির্ব্বাণও নহে। দেবলোকে ইন্দ্র-লোকে যমলোকে বা নরলোকে বসবাস অধিকাংশ লোকের পক্ষে কর্ম্মফলে ঘটে। সেখানে সুখও আছে, দুঃখও আছে। সুখ দুঃখে মিশিয়া আছে, কিন্তু সুখ বা দুঃখ কিছুই সেখানে চিরস্থায়ী নহে। এই সকল অস্থায়ী লোকের সহিত নরলোক বা মর্ত্ত্য লোকের বিশেষ কোনও ভেদ নাই। মর্ত্ত্য লোক ইন্দ্রলোক যমলোক এ সমস্তই এক পর্য্যায়ের জিনিষ। সাধু বা অসাধুকে কর্ম্মফলে এখানে বা ওখানে কিছু দিনের জন্য থাকিতে হয়। কর্ম্মানুসারে সুখ বা দুঃখ ভুগিতে হয়। সর্ব্বত্রই বন্ধন, প্রভেদ কেবল সুখ দুঃখের duration এবং মাত্রা লইয়া। বেদের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বৌদ্ধেরা মানিয়া লইয়াছেন, এবং তাহার উপর আরো অনেক দেবতা চড়াইয়াছেন। অসুর, রাক্ষস, প্রভৃতিকেও মানিয়া লইয়াছেন। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশকোটী হইলে, বৌদ্ধের দেবতা বহু তেত্রিশ কোটি হয়। ইহারা সকলেই জীব এবং কর্ম্মফলভোগী; এবং সকলেই কাম লোকের অধিবাসী। বৌদ্ধেরা এই কামলোককে এগারটা কুঠুরিতে ভাগ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে ছয়টা,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিবাস বা দেবলোক। আর পাঁচটা যথাক্রমে, নরলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যক্‌লোক এবং নরকলোক। বৌদ্ধ মতে এই সমস্ত কামলোকটা মারের অধীন। জীবগণ তাঁহার অধীন থাকিয়া এ লোক হইতে ও লোকে, এ কুঠুরি হইতে ও কুঠুরি যাতায়াত করিতেছে, এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

বেদপন্থী হিন্দু এই মারের আধিপত্য স্বীকার করিবে না। কিন্তু তাঁহার নিকটেও এই সমুদয় লোক বর্ত্তমান; এবং সংসারে বদ্ধ জীব এখান হইতে ওখানে যাতায়াত করে। পূর্ব্বে যে পিতৃযানের কথা কহিয়াছি, খুব সম্ভব সেই পিতৃযান হইতেই এই বিবিধ লোকের শাখা পল্লব বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের সেই লুপ্ত অধ্যায় কয়টা পাওয়া গেলে

এই শাখা পল্লব কিরূপে কবে গজাইয়াছে তাহা বুঝা যাইত। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ফলে যাহারা দেবযানে যায়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। তাহারা মুক্তি পায় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাহারা যেখানে যায়, সেখানে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করে। ইহাকেই সগুণ ব্রহ্মের সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য বলা যাইতে পারে। যমের ভয় তাহাদের নাই; এমন কি ইন্দ্রলোকাদি দেবলোকের অস্থায়ী সুখও তাহাদের পক্ষে তুচ্ছ। ব্রহ্মলোকে শিবলোকে, বা বিষ্ণুলোকে যাহারা স্থান পায়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। সাধারণ হিন্দুর প্রার্থনাই এই,—আমাকে যেন শমনভবন যাইতে না হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,—যিনি যাহার আশ্রয়, সে তাঁহারই নিকট তাঁহারই পার্শ্বে, তাঁহারই চরণে স্থান পাইতে চায়। রথে চড়িয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে যাইবার যে কথা শুনা যায়, সেটা এর চেয়ে কিছু বেশী। ইহাকে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভ বা সারূপ্যলাভ বলা যাইতে পারে। বেদান্ত জীব ও ঈশ্বরের যে চরম ঐক্যের কথা বলেন, ইহা সেই সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও ঐক্যের অনেকটা কাছাকাছি। ভক্তের পক্ষে এতটা বোধ করি প্রার্থনীয় নহে। তিনি চরণ পাইয়া, সমীপে স্থান পাইয়া কৃতার্থ। গোলোকের কথায় একথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ণ মিলনে কেবল শ্রীরাধারই অধিকার। অন্যে তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের লীলা দেখিয়াই তৃপ্ত।

আমার অনুমান হয় যে বেদোক্ত দেবযানের মূল হইতে শাখা পল্লব বাহির হইয়া কালক্রমে ব্রহ্মলোক হইতে গোলোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের কল্পনা হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের মাঝের খানিকটা লুপ্ত না হইলে আমরা এই ইতিহাসের ধারা নির্ণয় করিতে পারিতাম। বৌদ্ধগণও সেই একই মূল হইতে প্রসারিত ডাল পালা ছাঁটিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ মতে যাহারা কর্ম্মের পথে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় অথচ নির্ব্বাণ পায় না, তাহাদিগকে ক্রমোন্নতি অনুসারে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীকে পরকালে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীকে নরলোকে একবার আসিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণী অনাগমী; ইহাদিগকে কামলোকে আদৌ ভিড়িতে হয় না। ইহারা মারের শাসন অতিক্রম করিয়াছে। অনাগমীদের স্থান যে লোকে, সেই লোক,—রূপলোক; ইহার নামান্তর ব্রহ্মলোক। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অনাগমীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ করিয়া বৌদ্ধেরা নানা নাম দিয়াছেন—ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মপারিষত্ত, ব্রহ্মপুরোহিত, মহাব্রহ্ম ইত্যাদি। হীনযাণী এবং মহাযাণী, দুইয়ের মধ্যেই এ সকল নাম পাওয়া যায়। এই নাম হইতেই বুঝা যাইবে, ইহা আমাদের সগুণ ব্রহ্মের সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বৌদ্ধদের এই অনাগমী-দিগের গতি আমাদের দেবযান পথে গতি হইতে অভিন্ন। কর্ম্মপথে বৌদ্ধ মতে যাঁহাদের স্থান সকলের উচ্চে, তাঁহাদের নাম অর্হৎ। ইঁহারা চতুর্থ শ্রেণীর সাধক। ইঁহারা প্রায় সর্ব্ববন্ধনমুক্ত; ব্রহ্মলোকের উপরেও ইঁহাদের স্থান। পরবর্ত্তীকালে ইঁহাদের অবস্থানের জন্য সুখাবতীর কল্পনা হইয়াছে।

বৌদ্ধ এবং বেদান্তী উভয়েই বিশ্ব জগৎকে নামরূপাত্মক অর্থাৎ একটা নাম মাত্র ও একটা রূপ মাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। বেদান্তী নামরূপের অতীত আত্মাকে মানেন। বৌদ্ধ আত্মাকে না মানিয়া তাহার জায়গায় একটা শূন্য বসাইয়া দেন। এই গূঢ় কথা জানিলেই একের মতে মুক্তি এবং অন্যের মতে নির্ব্বাণ। কিন্তু এই গূঢ় তত্ত্ব সাধারণের অধিকারের বহির্ভূত। তাহাদের জন্য কেবল কর্ম্মের পথ। কর্ম্মফলে বিভিন্ন লোকে যাতায়াত হয়, অথবা কোনও উচ্চতর লোকে চিরসুখে অবস্থিতি হয়। ব্রাহ্মণেরা মুক্তিপথ নিজের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আর

সর্ব্বসাধারণের জন্য সে পথে চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্ব্বাণের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয়েরই মুক্তিতত্ত্ব এবং কর্ম্মতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। উভয়ের মতেই মুক্তিতত্ত্ব জনসাধারণের অধিকারবহির্ভূত। তবে কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে এক দিন না এক দিন, এ জন্মে বা জন্মান্তরে এমন দিন আসিতে পারে, যখন মুক্তি জ্ঞানগম্য হইবে, এবং অধিকারে আসিবে। ব্রাহ্মণের মতে সেই অধিকার লাভে স্ত্রী এবং শূদ্রেরও কোনও বাধা নাই। বেদের text উচ্চারণে তাহাদের সামাজিক অধিকার না থাকিলেও স্মৃতি শাস্ত্রের বা পুরাণ ইতিহাসের সাহায্যে বেদান্তের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া মুক্তির তাহারা অধিকারী হইতে পারে। বেদের text পাঠে অধিকারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যে চেষ্টা মাত্রেই বেদাধ্যয়নের ফলে বা যাগযজ্ঞ দ্বারা মুক্তির অধিকারী হইবেন, এমন কথা কোনও জায়গায় নাই। যে দ্বিজ, সে পূর্ব্ব জন্মে সুকৃতির ফলে উন্নত;—দ্বিজাতি সমাজে জন্মলাভ করিয়া এবং বেদ বেদান্তের original text পাঠে সমাজদত্ত অধিকার পাইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবার কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়াছে, এই মাত্র। যে কোনও শূদ্র বেদ পাঠে অধিকারী না হইয়াও স্মৃতি পাঠের সাহায্যে অথবা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধনার বলে অথবা কৃপাবলে মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন। ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক, কাহারও পক্ষে মুক্তি অনায়াস লভ্য নহে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এবং "যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,"—একথা ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয়েরই প্রতি, এমন কি আর্য্য সমাজের সহিত নিঃসম্পর্ক ম্লেচ্ছদের প্রতিও প্রযোজ্য। বেদবিহিত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুক্তি হইতে পারে না, কেবল সদ্‌গতি মাত্র হইতে পারে; ব্রাহ্মণের সমুদয় শাস্ত্র একবাক্যে এই কথা বলিতেছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে

এবং কর্ম্মকাণ্ডে এ বিষয়ে কোনও বিসংবাদ নাই। বৈধ কর্ম্মের ফলে সদ্গতি হইবে, কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতীরা ইহার অধিক কিছুই বলেন না। সেই সদ্গতির নাম স্বর্গবাস; ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষায়,—কোনও না কোনও দেবতার সহিত একাত্মতা লাভ বা সাযুজ্য লাভ, অথবা কোনও না কোনও দেবতার প্রিয়ধামে গমন বা তাঁহার সালোক্য সামীপ্য ইত্যাদি লাভ।

বৌদ্ধ মতেও কেবল শীল বা সৎকর্ম্মদ্বারা নির্ব্বাণ হয় না। শীলের উপর সমাধি ( যোগবল ) থাকিলে অনাগমীর অবস্থা বা ব্রহ্মলোকে স্থান হয়। তদুপরি প্রজ্ঞা ( জ্ঞানবল) থাকিলে অর্হতের অবস্থা, অরূপ লোকে বা সুখাবতীতে স্থান হয়। অর্হতেরা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত নহেন। এক জন্মে অর্হৎ হওয়াও সকলের সাধ্য নহে। বহু জন্মের চেষ্টায় ক্রমোন্নতি আবশ্যক।

বৌদ্ধেরা বেদের এবং বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞের বিরোধী ছিল, এ কথা কতক সত্য এবং কতক মিথ্যা। আমরা যে অর্থে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করি, বৌদ্ধগণ অবশ্য সেরূপ করিত না। আমাদের পক্ষে ঋষিগণের যে স্থান, বৌদ্ধদের পক্ষে বুদ্ধগণের সেই স্থান। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধগণের মধ্যে অন্যতম মাত্র। আমরাও যেমন বলি,—কালে কালে ঈশ্বরের অবতার হয়; বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বলিত, কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ই যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, সেই ধর্ম্মকে সকলে দেখিতে পায় না; ঋষিগণ বা বুদ্ধগণ তাহা দেখিতে পান ও প্রচার করেন। এই অর্থে ঋষিগণ, এবং বুদ্ধগণ "সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মাণঃ"। আমরা ঋষিগণের উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের বাক্যকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহার অধিক উভয়ের মধ্যে বিরোধ

নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাগযজ্ঞের নিষেধ করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষেও যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ। এমন কি, আমাদের গৃহীর পক্ষে যে সকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি যাগযজ্ঞের নিষেধে কোনও নূতনত্ব নাই। বৌদ্ধ গৃহীদের জন্য বুদ্ধদেব কোনও রূপ পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা মোটামুটি বেদ বিধি মানিয়াই চলিত, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। একালের গৃহস্থের মধ্যে যাহারা গোঁড়া বৈষ্ণব, তাঁহারা যেমন সমাজের খাতিরে বেদবিধি মানিয়া চলেন, তবে বেদ বিধির প্রতি তত টা শ্রদ্ধা দেখান না, বৌদ্ধ গৃহীর অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। বুদ্ধদেব এই পাঁচ মহাযজ্ঞের সম্পাদন গৃহীরও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

Physical আর Moral এই দুইটা স্বতন্ত্র order এর কথা বলিয়া আসিতেছি। Physical আর moral law উভয়ের অধীনতায় যথাযোগ্য শাস্তিভোগ করিতে হয়, ইহা লইয়া একটা গণ্ডগোল আছে। Physical lawএর অনুজ্ঞাকে কেহ moral বলে না। তজ্জন্য যে শাস্তিভোগ, তাহাকে অসৎ কার্য্যের ফল মনে করা উচিত কি না বিচার্য্য। ইহজন্মে কর্ম্মের সহিত ফলের সঙ্গতি দেখা যায় না। যাহারা ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবি বলিয়া লোককে বুঝাইতে চাহে, তাহারা এইরূপে ফাঁপরে পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে পরলোকের কল্পনা করিয়া সেইখানে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্ম্মকথায় "ধর্ম্মের জয়" নামক প্রবন্ধে আমি এ বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ উভয়কেই এই গোলে পড়িতে হইয়াছে। এই জন্যই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দরকার হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্বর্গের সুখ ও নরকের দুঃখ বর্ণনায়

পরস্পরকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ বোধ হয় হিন্দুর এককাঠি উপরে গিয়াছেন। সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, দেবলোকের ঐশ্বর্য্য ও নরকের ভীষণতা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান এ বিষয়ে পিছুপাও হন নাই। দেবলোকের মধ্যে ইন্দ্রলোক বোধ করি শ্রেষ্ঠ। সেখানে কল্পবৃক্ষ, মন্দার, পারিজাত, কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু হিন্দু-সমাজের নিতান্ত মূর্খও জানে, ইন্দ্রলোক খুব যে একটা স্পৃহণীয় পদার্থ তাহা নহে! দেবতাদের এই রাজাকে যখন তখন অসুরেরা আসিয়া তাড়াইয়া দিত। সেই ইন্দ্রের পার্শ্বে স্থান লাভ যে পরম পুরুষার্থ, ইহা কোনও হিন্দুই বিবেচনা করে না। ইন্দ্রলোকে অবিমিশ্র সুখ নাই; এবং সেখানে বাস চিরস্থায়ী হয় না; নহুষের মত রাজা আসিয়া যে ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিত, অতি মূর্খ হিন্দুও সে ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করে না। হিন্দু ইন্দ্রত্ব চায় না; সে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত চায় না; সে এমন একটা স্থান চায়—যেখানে সে স্থায়ী ভাবে তিষ্টিতে পারে। মীমাংসা দর্শনের আচার্য্যদের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। ইঁহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা সমস্ত বেদ মানিতেন, বেদকে প্রতিষ্ঠা করাই ইহঁাদের কাজ, অথচ ইহাঁরা দেবতা মানিতেন না। সাধারণ লোকে দেবতা মানে। সাধারণের নিকট দেবতারা objects of perception, অথবা objects of possible perception; কিন্তু মীমাংসকদিগের নিকট তাঁহারা concepts মাত্র। মীমাংসকদের তর্ক প্রণালীতে ইংরেজি নবিশ খুসী হইবেন। তাঁহারা বলিতেন, ইন্দ্র অত বড় ঐরাবত সহ ঘটে অধিষ্ঠান করিলে ঘটে কুলায় কিরূপে? মাটির ঘট ভাঙ্গিবে না? দেবতার সম্বন্ধে যাঁহাদের এই মত, তাঁহাদের নিকট দেবলোক কি পদার্থ বলা বাহুল্য। অথচ বেদে স্বর্গের কথা আছে। স্বর্গের অর্থ তাঁহারা করেন,—পরম সুখ, বৈধকর্ম্ম সম্পাদনে মনের যে সুখ সেই সুখ। কর্ম্মের

একটা ফল আছে; তাহা কাহারও ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল যে মনের সুখ, তাহাই স্বর্গ।

এই মতের scientific worth যতই হউক, ইহা জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। তাহারা physical pleasures এর প্রলোভন চায়, physical painএর ভয় চায়। এই জন্যই নন্দন কাননের আর চৌষট্টি নরকের আবিষ্কার হইয়াছে।

সুখের প্ররোচনা যতই কার্য্যকরী হউক, সুখের উদ্দেশে যে কাজ তাহা খাঁটি morality অনুমোদিত নহে। নিজের সুখ না বলিয়া, সমাজ—হিত, লোকহিত, বিশ্বমানবের হিত বলিলেও চলে না; কেননা শেষ পর্য্যন্ত Humanity'র জন্য ত্যাগ স্বীকার আত্মরক্ষার নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একথা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোনওরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ত্যাগ স্বীকারে বিশুদ্ধ morality হয় না। ত্যাগের জন্য ত্যাগ স্বীকারই খাঁটি morality। এই খাঁটি ত্যাগ স্বীকারের একটী পুরস্কার অনিবার্য্য; উহাকে সুখ না বলিয়া অন্য কোনও নাম দেওয়া উচিত। শাস্ত্রে উহাকে আনন্দ বলা হয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আত্মতুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মতুষ্টিই এই আনন্দ। সৎকর্ম্মের ফল আত্মার পরিতোষ। পরার্থে ত্যাগস্বীকারে এই আনন্দ পাওয়া যায়; কিন্তু এই আনন্দ পাইব, এইরূপ হিসাব করিয়া ত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে ইহাকে moral বলা চলিবে না। ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই, সর্ব্বভূতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াই, যে আত্মার পরিতোষ, যে আনন্দ, ইহাতেই আত্মা যদি চরিতার্থ হয়, তাহাকে ইংরাজীতে self realisation বলা যাইতে পারে। সর্ব্বভূতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া এই self realisationকে আমাদের শাস্ত্রে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ভাষা হইতে এই শব্দটী কুড়াইয়া লইয়া তদুপরি এই চরম অর্থ

আরোপ করা হইয়াছে। যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ,—ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থ যাহাই হউক,—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার এই উক্তির লক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র করি না। কর্ম্মকথার শেষ প্রবন্ধে আমি এ কথার আলোচনা তুলিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আর গোটাকতক কথা বলিতে চাহি। অনেকে বেদান্তে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধ কল্পনা করেন। যে মুক্ত, তাহার পক্ষে সংসারই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কর্ম্মের প্রয়োজন কি? কর্ম্মও তাহার পক্ষে মিথ্যা। ফলে জ্ঞানপন্থীরা অনেকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন। এমন কি, পাপ পুণ্য উভয়ই তাহাদের নিকট অর্থশূন্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে antinomianism বা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। বেদান্তের মধ্যে এই বিরোধ আমি স্বীকার করি না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইহা বেদান্তেরই উক্তি। জীবত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম এড়াইবার আমার উপায় নাই। ভগবৎগীতা ইহা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত বলিয়াছেন। Physical law এর অধীনতা স্বীকার করিয়া যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেই হইবে, শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে হইবে, তখন moral lawএর অধীনতা মানিব না বলিলে চলিবে কেন? পার দুইটাই বর্জ্জন কর, একটা রাখিয়া অন্যের বর্জ্জন চলিবে না। কাজেই বেদান্ত এবং বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিগ্রন্থ ভগবদ্গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন না। কর্ম্মের সহিত মুক্তির বিরোধ নাই। আমি ত স্বেচ্ছাক্রমে নিজের আনন্দের জন্যই জীব সাজিয়া কর্ম্মের খেলা খেলিতেছি। এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের অভিনয় কি আমাকে বদ্ধ করিতে পারে? এই যে কর্ম্ম নিয়তি, ইহা ত আমারই স্থাপিত। স্বেচ্ছাক্রমেই আমি এই নিয়তির বশ হইয়াছি। ইহা যখন আমি জানি, তখন এই সংসার হইতে, এই কর্ম্মের বন্ধন হইতে আমার ভয়

কোথায়? আমার কামনা নাই, আমি পূর্ণকাম; এবং আপ্তকাম; অথচ স্বেচ্ছাক্রমেই এই কর্ম্মের লীলা করিতেছি। এই যে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া জীব সাজিয়াছি, এবং আমার হাতে গড়া জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, বড় হইয়াও যে ছোট সাজিয়াছি, ইহাই ত আমার আনন্দ। এই বিশ্বসৃষ্টিই যজ্ঞ। আর যে সকল যজ্ঞ আমি সম্পাদন করি, সবই ত এই আদি যজ্ঞের অনুকরণ মাত্র। এতদ্দ্বারাই আমি আপনাকে চরিতার্থ করিতেছি, ইহাই আমার self realisation; আমি ত সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়া সেই সর্ব্বভূতের অধীন হইয়াছি, তাহাদের নিকট আপনাকে বলিদান দিতেছি। আপাততঃ মনে হয় ইহা আমার আত্ম সঙ্কোচন, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ আমার প্রসারণ। সবইত আমার, এবং আমিই সব; কাহারও সহিত আমার ত বিরোধ নাই। এই ত্যাগ স্বীকারই যখন আমার আনন্দ, ত্যাগাত্মক কর্ম্ম করিয়াই যখন আমার চরিতার্থতা, তখন আমি কর্ম্ম করিব না কেন? আমি মুক্ত পুরুষ,—ইহা জানিয়াই যখন আমি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, এবং করিতেছি, তখন আমি কর্ম্মে ভয় পাইব কেন? কর্ম্ম করিও না,—এইরূপ আদেশে আমি free agent বাধ্য হইব কেন? আমার জন্য ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখের প্রলোভন আবশ্যক মাত্র নহে।

কেন কর্ম্ম করিব? এ বিষয়ে আমি স্বাধীন। বিশ্বসৃষ্টি রূপ মহা—যজ্ঞ, তদর্থে জীবত্বস্বীকার বা আত্ম বলিদান, ইহাই আমার প্রধান এবং একমাত্র কর্ম্ম। আর যে সকল ছোট কাজ, সবই এই কর্ম্মের অনুকূল হইলেই আমার আনন্দ। কোনওরূপ ফলাফল হিসাব না করিয়া কেবল ত্যাগের জন্য ত্যাগেই আমার চরিতার্থতা প্রাপ্তি self realisation, আনন্দ লাভ এবং আত্মার পরিতোষ। সেই আনন্দকে সম্মুখে রাখিয়া তদুদ্দেশে আমার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ণকাম আমার আবার উদ্দেশ্য কি? তবে আমি মৎকল্পিত পরের জন্য আত্মোৎসর্গ

করি, এবং তাহাতে আনন্দই পাই, এই মাত্র। কাজেই কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। সংসারে যাহাকে দুঃখ বলি, তাহাতে আমার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? আমি যখন জানি আমি চির মুক্ত, তখন এই বদ্ধবৎ আচরণে অথবা না জানিবার ভাণ করিয়া আত্মবিস্মৃতবৎ আচরণে বাধা দিবে কে? অতএব জ্ঞানের পথের সহিত কর্ম্মের পথের কোনও বিরোধ নাই। ত্যাগাত্মক কর্ম্মই আমার কর্ত্তব্য, কেননা তাহা বিশ্বসৃষ্টিরূপ যজ্ঞের অনুকূল; স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উহার অনুষ্ঠানে আমার আনন্দই হইবে।

কর্ম্ম যেমনই সাধু হউক, উহাতে মুক্তি বা নির্ব্বাণ হয় না; ইহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত। জ্ঞানীব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মের কথাটা বঙ্কিম বাবুই প্রথমে স্পষ্ট করিয়া ইংরেজি নবিশদের নিকট উপস্থিত করেন। গীতায় যাহাকে কামনা, কাম, আসক্তি বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ তাহাকে তৃষ্ণা বলেন। হিন্দু বলেন, কামনার ফলে বন্ধন; বৌদ্ধ বলেন, তৃষ্ণার ফলে সংসার। কর্ম্মত্যাগে কাহারও অধিকার নাই। নিষ্কাম নির্লিপ্ত ও ফলাফলে উদাসীন হইয়া কর্ম্ম করিবে,—গীতার এই সার উপদেশ আমরা বঙ্কিম বাবুর নিকট শিখিয়াছি। সমস্ত মহাভারতখানাকে আমরা গীতার textএর কাব্যাকারে illustration মনে করিতে পারি। অর্জ্জুনে ও ভীষ্মে আমরা নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত পাই। যেন কোনও একটা নিয়তি অথবা দুর্নিবার fate সমস্ত ঘটনা রাশিকে তাড়িত করিয়া একটা মহাপ্রলয়ের মুখে ঠেলিয়া চলিতেছে; তাঁহারা সেই তাড়নার বশে নিজের কার্য্য করিতেছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের শোকও নাই দুঃখও নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,— নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্; অর্জ্জুন আগাগোড়া সেইরূপ নিমিত্তমাত্রের মত আপনাকে চালাইয়াছেন। দু একটা

স্থান ব্যতীত অর্জ্জুনকে হর্ষে ক্রোধে বা শোকে অভিভূত হইতে দেখা যায় না; চোখের জল ফেলা তাঁহার অভ্যাস নহে। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুনই এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল তাঁহারই বীর্য্যের আয়ত্ত। তাহা তিনি জানেন, অথচ তিনি কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব করেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ অধীন; যুধিষ্ঠিরকে তিনি পরামর্শও গায়ে পড়িয়া দেন না, যুধিষ্ঠিরের কাজের সমালোচনাও করেন না। তিনি soldier মাত্র; যুদ্ধ করিয়াই খালাস। অর্জ্জুনে আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, ভীষ্মে তাহারই পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এত বড় প্রকাণ্ড massive পুরুষত্বের দৃষ্টান্ত আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কিনা জানিনা। যে বীর ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারে, অথচ ইচ্ছা করিয়া সবই পরিত্যাগ করিয়াছে; যে সন্ন্যাসী, সংসারে তাহার কর্ত্তব্য কিছুই রাখে নাই, অথচ যে সন্ন্যাস পালনের জন্য বনে যাওয়ারও আবশ্যকতা বোধ করে নাই; নিজের কর্ত্তব্য না থাকিলেও যখন যে কর্ম্ম আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সমাধান করিয়াছে; এমন করিয়া সমাধান করিয়াছে, যাহা অন্যে পারিত না; যাহার ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, কোনও অভিমান নাই, কোনও স্বার্থ সম্পর্ক নাই, এমন কি স্নেহ মমতা ভালবাসা পর্য্যন্তও নাই; যে জানে, আমি সকলের চেয়ে বড়—অথচ যে বিনা কারণে নিতান্ত ছোট হইয়া পরগৃহে বাস করে;—এত প্রকাণ্ড character কোনও সাহিত্যে আছে কি না আমি জানি না। ভারতবর্ষে এককালে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের বা chivalryর যে আদর্শ ছিল, ভীষ্মে আমরা সে আদর্শ মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাই। chivalryর আনুষঙ্গিক কোনওরূপ মলিনতা এ আদর্শকে স্পর্শ করে নাই। এ আপনার মাহাত্ম্যে এত বড় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করে না। ক্ষাত্রধর্ম্মের এই আদর্শ সৃষ্টির জন্য ভীষ্মকে একাধারে কর্ম্মী এবং সন্ন্যাসী করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, purity এবং chastity, নহিলে বোধ হয় এই আদর্শ সম্পূর্ণ হইত না; সেই জন্যই বোধ হয় ভীষ্মকে বিবাহ

করিয়া গৃহী হইবার অবসর দেওয়া হয় নাই। Arthurian Knight গণের মধ্যে Sir Galahad এ আমরা কতকটা এই চেষ্টা দেখিতে পাই। Sir Galahadএর মত ভীষ্ম বলিতে পারিতেন :

I never felt the kiss of love,
Nor maiden-hand in mine.

আরও বলিতে পারিতেন :

My good blade carves the casques of men,
My tough lance thrusteth sure,
My strength is the strength of ten,
Because my heart is pure.

Sir Galahad ই একমাত্র chaste knight, যিনি Holy Grail এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ভীষ্ম সেইরূপ একমাত্র ক্ষত্রিয়বীর, মৃত্যু যাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের এই আদর্শ যতই প্রকাণ্ড হউক, ইহার মধ্যে যে একটু সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহার জন্য আমরা ইহাকে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের ইনি হয়ত চরম আদর্শ; এই সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থ, ফলাফলে নিস্পৃহ, রাগদ্বেষ বর্জ্জিত, স্নেহ মমতা অনুরাগের উর্দ্ধে অবস্থিত, শোক ও মোহের অতীত, দৃঢ় বলিষ্ঠ চরিত্রের সম্মুখে আমরা প্রণত হই, এবং অভিভূত ধুল্যবলুণ্ঠিত হই ; কিন্তু ইঁহার প্রতি অনুরাগের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, আমাদের মত প্রাকৃত-জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; বোধ হয় এটা ঠিক হয় নাই। বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং ঈশ্বরের মানবরূপে অবতরণ অসম্ভব নহে এরূপ যুক্তিতর্কও উপস্থিত করিয়াছেন। বেদপন্থী হিন্দুর পক্ষে এইরূপ যুক্তি

তর্কের কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমিই ব্রহ্ম, ইহাই যখন বেদের চরম কথা, তখন এরূপ যুক্তিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যবহার জগতে যেখানে বহুজীবের অস্তিত্ব for pragmatic reasons স্বীকার না করিলে জীবন যাত্রা চলে না, তখন যে কোনও ব্যক্তি আমিই ঈশ্বর এইরূপ পরিচয় দিলে আপত্তি চলিবে না। "তৎ ত্বমসি" এই মহাবাক্যে সে কথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব লোকস্থিতির জন্য কোনও ধর্ম্ম উপদেষ্টা যদি কোনও মানব চরিত্র কল্পনা করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বলান, যে আমিই ঈশ্বর, এবং সেই চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য ইতিহাস বা পুরাণের সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করেন, তাহাতে বেদপন্থীর কোনই আপত্তি হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইলেও সে কথা চাপা দিয়া মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে মানবত্বের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহা ঠিক হয় নাই; ঈশ্বর ভাবে না দেখিলে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। মহাভারতের ঘটনাচক্র cosmic process এর অভিনয় মাত্র। সহস্রবিধ পাশবিক unmoral forces চারিদিক হইতে জটলা করিয়া একটা বিরাট ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কোটী মানবে সহস্র বৎসরের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা সেই ভীষণ tornadoর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ইহা একটা দারুণ determinism; ক্ষুদ্র মানবের চেষ্টায় ইহার গতি রুদ্ধ হয় না; ইহা নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ ব্যাপার; মনুষ্যের সুখ দুঃখের প্রতি ইহা দৃকপাতই করে না; ইহার ভিতর মানুষের ক্ষুদ্র পাপপুণ্যের হিসাব খুঁজিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। বহুকালের গড়ন্ত জিনিষকে ইহা এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করে, কোনওরূপ দ্বিধা করে না; ইহার মধ্যে কোনওরূপ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা চলে না। বৌদ্ধ বা হিউমের মত নাস্তিকের নিকট এই নিয়তি আপনা হইতে বিদ্যমান, কেহ তজ্জন্য দায়ী

নহে। আস্তিকের নিকট ইহা বিশ্ববিধাতার খেলা মাত্র ; কেন তিনি এই খেলা খেলিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কুরুক্ষেত্রের ঘটনা বস্তুতঃই ভূভার হরণের ব্যাপার। মানব সমাজে লোকস্থিতি যখন out of gear হইয়া পড়ে, তখন সমাজ আপনাকে এইরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হয়ত পুনর্গঠিত করিয়া equilibrium পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। সম্প্রতি ইয়ুরোপে যে আগুন জ্বলিয়াছে, ইয়ুরোপের সমুদয় culture তাহাতে পুড়িয়া ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাকেও সেই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আরও larger scaleএ পুনরভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারি। ব্যাপারটা cosmic processএর অন্তর্গত, এবং এই হিসাবে fully determinate অর্থাৎ নিয়তির বশ ; কিন্তু ইহার factorগুলা এত অসংখ্য এবং জটিল যে কোনওরূপ Science of History ইহার হিসাব করিতে পারে না। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে একথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ইহার সমস্ত ফলাফল পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্জ্জুন এবং অন্যান্য অভিনেতারা নিমিত্তমাত্র। সূত্রবিলম্বিত পুতুলের মত তাঁহারা একজন খেলোয়াড়ের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। ঈশ্বরবাদী মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণকে সেই খেলোয়াড়ের স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই মহানাটকের একমাত্র সূত্রধার। তিনি জানিয়া শুনিয়া সূত্র চালনা করিয়া এই প্রকাণ্ড খেলা খেলিতেছেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং পদে পদে আপনার সে পরিচয়ও দিয়াছেন, এবং সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নির্লিপ্তভাবে এই খেলা খেলিতেছেন। তিনি স্বয়ং যন্ত্রী, মহাভারতের সমস্ত যন্ত্রটা তিনি একা চালাইতেছেন ; অথচ মজা এই যে যিনি যন্ত্রী, তিনিও যন্ত্রারূঢ় হইয়া স্বকর-চালিত চক্রভ্রমিতে আরোহণ করিয়া নিজেও ঘুরিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত সকল মহারথ এবং অতিরথ তাঁহারই চক্র চালিত, অথচ তিনি নিতান্ত ন্যাকা

সাজিয়া অর্জ্জুনের রথে সারথিমাত্র হইয়া বসিয়া আছেন। মহাভারতের শেষভাগে যদুবংশ—ধ্বংস কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এও সেই ভূভার হরণ ব্যাপার; এও সেই বহুবৎসরের বহুচেষ্টায় বহু প্রযত্নে নিজের হাতে গড়া জিনিষ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলা ব্যাপার। কৃষ্ণ যে উচ্ছৃঙ্খল যদুকুলকে কংসের ও জরাসন্ধের হাত হইতে বহুচেষ্টায় বাঁচাইয়া, দ্বারকায় উপনিবিষ্ট করিয়া, অজেয় এবং দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, এক দিনের খেয়ালে সেই বংশ কাটাকাটি করিয়া লুপ্ত হইয়া গেল; তিনি তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলেন; তাঁহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল না; হৃদয়ে একটা স্পন্দন হইল না; অবশেষে তিনি নিজেই ব্যাধের হস্তে প্রাণ দিয়া মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিলেন। কৃষ্ণকে কেবল মানব আকারে দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না; তাঁহাকে ঈশ্বর রূপে দেখিলে তবে ইহার ষোল আনা significance বুঝা যায়। আমার চরিতকথা পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে এবং কর্ম্মকথা পুস্তকে ধর্ম্মের জয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস কাব্যে কৃষ্ণকে এইরূপ মানবেশ্বর ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমার বিবেচনায় অনেকটা সফল হইয়াছেন।

মহাভারতের কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে জীব সাজিয়া জীবের মত বদ্ধবৎ আচরণ করিতেছেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম, নির্লিপ্ত, শোক মোহের অতীত, সুখ দুঃখের পরপারে অবস্থিত; তাঁহার মমতা নাই, বোধ হয় করুণাও নাই। এই রূপ নিষ্কাম নির্লিপ্ত সুখদুঃখবর্জ্জিত পুরুষ আদর্শ মানব হইতে কিছুতেই পারে না। তিনি সর্ব্বতোভাবে ইতর মানবের অনুকরণের অতীত। ভীষ্মের বা অর্জ্জুনের মত নিষ্কাম মানব তাঁহার মর্ত্ত্য বা পার্থিব reproduction হইতে পারে। কৃষ্ণই বল, আর ভীষ্মার্জ্জুনই বল, ইঁহাদের মধ্যে যে নিষ্কাম নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব দেখা

যায়, তাহা লইয়া জনসাধারণের ethical conduct পরিচালনার আদর্শ পাওয়া যায় না। গীতার উপদিষ্ট নিষ্কাম ধর্ম্মের academic illustration এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইঁহাদিগকে দেখান যাইতে পারে; সাধারণ মানুষের মন ভিজাইতে যাহা দরকার, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষ চরিত্রে এবং ভীষ্মার্জ্জুনের মানুষ চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিষ্কাম নির্লিপ্ত উদাসীন পুরুষ নহেন; তিনি সর্ব্বতোভাবে সকাম, এমন কি সাক্ষাৎ কামের মূর্ত্তি। তিনি নিজে হাসেন এবং কাঁদেন, এবং অন্যকে হাসান এবং কাদান; নিজে চোখের জল ফেলেন। অন্যের চোখে জল ফেলাইয়া স্বহস্তে তাহা মুছাইয়া দেন। কিন্তু সকাম মানব সাজিলেও তিনি মানব নহেন; এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যায় না। সাধারণতঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বলিয়া যাহা গৃহীত হয়, তাহা তাঁহাতে নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আনন্দময় রূপ। এই আনন্দময়তাই তাঁহাতে প্রকট; ঈশ্বরত্ব ভাবটা তাহার নিকট পরাহত। বদনে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত থাকিলেও তিনি তাহা দেখাইতে চাহেন না; cosmic process এর খেলা হইতেও তিনি দূরে থাকিতে ইচ্ছুক। জগদ্ব্যাপারের বিভীষিকা যদি নিতান্তই কোনও অসুররূপে—কালিয় সর্পরূপে অথবা ইন্দ্রের ক্রোধ রূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসে, হেলায় অঙ্গুলি তাড়নে তিনি তাহাকে সরাইয়া ফেলেন, এবং তাহাকে চাপা দিয়া আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত আনন্দ লীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। তিনিও আপনাকে পূর্ণকাম বলিয়া জানেন; অথচ সম্পূর্ণ সকামের মত আনন্দ লীলার অভিনয় করেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যের ethical conduct এর আদর্শ পাইবার কোনও আশা নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ জানিয়া শুনিয়া বদ্ধবৎ আচরণ করেন, এবং সামাজিক মনুষ্যের মত সমুদয় বিধি মানিয়া চলেন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কেবল আনন্দের অভিনয় করেন, কিন্তু সে অভিনয়েও আপনাকে ধরা দেন না; কোনওরূপ সামাজিক বিধি

নিষেধের তিনি অধীন নহেন। এমন কি তাঁহার সে আনন্দলীলার পূর্ণতা সাধনের জন্য যে বাধ্যতাটুকু আবশ্যক, সে বাধ্যতাটুকু স্বীকারেও তিনি নারাজ। রাসমণ্ডলের নৃত্য গীত উৎসবের মধ্যে তিনি সহসা অন্তর্হিত হন; রাধিকাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি চন্দ্রাবলীর নিকট হঠাৎ চলিয়া যান; সমস্ত গো গোপ ও গোপিকাকে কাঁদাইয়া, বৃন্দাবনের তরুলতা পর্য্যন্ত কাঁদাইয়া, তিনি হঠাৎ এক দিন মথুরা চলিয়া যান। পূর্ণকামের এই কামাভিনয় কোনও রূপ বন্ধন স্বীকার করে না; অতএব ইহাও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের অনুকরণের অতীত। আত্মা যে free agent, অথচ determinismএর অধীনতার অভিনয় করে মাত্র, বৃন্দাবনের ও মহাভারতের দুই কৃষ্ণকে দিয়া এই দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যাকারে ফুটান হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় দর্শন শাস্ত্র freedom ও necessity এই দুয়ের বিরোধ সমন্বয়ের জন্য অদ্যাপি মাথা খুঁড়িতেছে।

ফলে মহাভারতে বা বৃন্দাবনলীলায় আমরা সামাজিক জীবরূপী মানবের ethical আদর্শ পাই না; তজ্জন্য আমাদিগকে রামায়ণে আসিতে হয়। মানবের পূর্ণ আদর্শ যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে এই খানে আসিতে হইবে। রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর, এ ত ঠিকই কথা। বেদপন্থীর কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; কিন্তু তিনি পুরাপুরি মানব। রামায়ণের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বর ভাবকে কোথাও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। যেখানে তাঁহার ঈশ্বরত্বের উল্লেখ আছে, সেখানটা প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও হানি হইবে না। তিনি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই। সাধারণের মধ্যে একটা কথা আছে যে তিনি ঈশ্বর হইলেও আত্মবিস্মৃত ছিলেন; তিনি কে, তাহা তিনি জানিতেন না; এ কথা ঠিক্। তাঁহাতে জীবভাব, মানুষভাব, বদ্ধভাব পূর্ণ প্রকটিত; এবং তাঁহার মনুষ্যত্ব কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। তিনি ইতর প্রাকৃত জনের মত

আপনাকে যুগধর্ম্মে বদ্ধ করিয়াছিলেন। নির্লিপ্ত নিষ্কাম সমদুঃখসুখ প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা যায় না; তিনি দুঃখ এবং শোক যোল আনা ভোগ করিবার জন্যই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, আর কোনও মনুষ্য তাহা করে নাই। তিনি যত কাঁদিয়াছেন, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যই তত কাঁদে নাই। অথচ এই শোক দুঃখের বিভীষিকা তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্য পথ দেখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মত তাঁহাকে সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে হয় নাই; কোনও রূপ ফলাফল হিতাহিত গণনা করিতে হয় নাই। তাঁহার নরদেহের ভিতরে গুপ্ত ভাবে যিনি অবস্থিত ছিলেন, তিনি একবারে তাঁহাকে সরল পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; সেই প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কেবল আত্ম পরি-তোষের জন্য, আপনার চরিতার্থতা প্রাপ্তির জন্য, তিনি আপনার সমস্ত জীবন-টাকে পুরুষ যজ্ঞে পরিণত করিয়াছিলেন; দ্বিধামাত্র না করিয়া আপনার হৃৎপিণ্ডকে সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সীতা-নির্ব্বাসন ব্যাপারটা সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল। অসঙ্কোচে পিতার আদেশ পালন করিয়া বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের সমাপ্তি কল্পিত হইতেও পারিত। কিন্তু তখনও যজ্ঞের পূর্ণাহুতি বাকী ছিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি নূতন বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তৎকালোচিত রাজধর্ম্মের বন্ধন। কোনও কালে কোনও দেশে কোনও সমাজেই জনসাধারণের যে স্বাধীনতা আছে, রাষ্ট্রপতি রাজার সে স্বাধীনতা নাই। রাষ্ট্রচালনার ভার গ্রহণ করিবামাত্র রাজা রাষ্ট্রমধ্যে প্রচলিত যুগধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়েন, তদুপরি হস্তক্ষেপে তাঁহার স্বাধীনতা থাকেনা। রামচন্দ্রেরও সেই স্বাধীনতা ছিল না। সীতার প্রতি চাহিয়া রাজ্যভার abdicate করিবার

স্বাধীনতাও বোধ করি তাঁহার ছিল না। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া নরহত্যায় সঙ্কুচিত হইবার স্বাধীনতা যেমন পায় না, এমন কি সেই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ কি অন্যায় যুদ্ধ, তাহার বিচারেরও স্বাধীনতা পায় না, রাজধর্ম্মের অধীন হইয়া রামেরও সেই দশা হইয়াছিল। এই জন্য তিনি দ্বিধাহীন হহয়া কোনওরূপ গণনা মাত্র না করিয়া আপনার হইতে প্রিয়তর আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে সেই পুরুষ যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। ইহা সেই ছান্দোগ্যোপনিষদের পুরুষ যজ্ঞের ব্যাপার; গীতাশাস্ত্র এই পুরুষ যজ্ঞকে ভিত্তি করিয়া ethical শাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারত সেই শাস্ত্রের illustration বটে, কিন্তু মহাভারতে জীবের জীবভাবের সহিত ব্রহ্মভাবকে মিশাইতে গিয়া যে সকল নিষ্কাম নির্লিপ্ত আসক্তিরহিত উদাসীন পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মানবত্বের চরম আদর্শ পূর্ণ হইতে পারে নাই; জন সাধারণের চিত্ত তাহাতে স্নেহ রসে এবং করুণ রসে তেমন আর্দ্র করিতে পারে নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের জনসমাজে নরনারীর গার্হস্থ জীবনের উপর মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রভাব অনেক অধিক। আত্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের অতি-মানুষ চরিত্র ভারতবর্ষে পূজা পাইয়া আসিতেছে; কিন্তু আত্মবিস্মৃত শ্রীরামের মানুষ চরিত্র ভারতবর্ষে জনসমাজের জীবনের ধারা চির-কাল ধরিয়া নানা রসে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত রাখিয়াছে।

এই পুরুষ যজ্ঞের গোড়া ঋগ্বেদ সংহিতার পুরুষ সূক্তে পাওয়া যায়। এই সূক্তে বলা হইয়াছে যে এক সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাদ পুরুষ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যজ্ঞের জন্য আপনাকে যজ্ঞে আহুতি দেন; তাঁহার দেহের খণ্ডিত অংশ হইতে বিশ্ব জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। James Mill নাকি বলিয়া

ছেন যে বৈদিক ঋষির এই কল্পনা grotesque এবং hideous; Andrew Lang দেখাইয়াছেন যে এইরূপ একটা বিকটাকার জন্তুর দেহ খণ্ডিত করিয়া জগতের উৎপত্তির কল্পনা অন্যান্য savage জাতির মধ্যেও দেখা যায়। Myth হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, ব্রাহ্মণের হাতে এই কল্পনা বেদপন্থী সমাজের ethical philosophy এবং religion of redemption দুইএরই ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই বিরাট পুরুষ আত্মারই বিশ্ব মূর্ত্তি; আত্মাই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারই যজ্ঞ; এই যজ্ঞে তিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, এবং আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কেবল ত্যাগের জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, বড় হইয়াও ছোট হইয়াছেন, মুক্ত এবং স্বাধীন হইয়াও বদ্ধ ও পরাধীন হইয়াছেন। এ সকল কথা ঐ পুরুষ সূক্ত মধ্যেই স্পষ্টাক্ষরে আছে। বিশ্বস্রষ্টার এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মই সমস্ত ethical conduct এর চরম আদর্শ। মনুষ্যের যে কর্ম্ম এই আদিম sacrificeএর অনুরূপ ও অনুকূল, তাহাই খাঁটি moralityর অনুমোদিত। ইহা কেবল ত্যাগমাত্র; নিজের বা পরের স্বার্থের সহিত ইহার কোনও সম্পর্কমাত্র নাই। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে পুরুষ যজ্ঞের বিবরণে এবং গীতাশাস্ত্রে এই তত্ত্বই ফলান হইয়াছে। বৌদ্ধেরা আত্মা মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না, তাঁহাদিগের ethical scienceএর ভিত্তি স্থাপনে তাঁহারা বড় গোলে পড়িয়াছেন। সাধু কর্ম্মের ফলে হিত হয়, যে ভাল কাজ করে সে ভাল ফল পায় অতএব ভাল কাজই করিবে, ইহার অধিক তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। এইরূপ একটা কর্ম্মনিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা মানিলেই

ফল ভাল হইবে, না মানিলে মন্দ হইবে, এইরূপ প্রলোভন সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে ethical scienceএর পত্তন করিতে হইয়াছিল। কাজেই বৌদ্ধদের ethical science এর ভিত্তি utilitarian। ব্রাহ্মণও এই কর্ম্মনিয়মের অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের চরম কথা নহে। ফলাকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক থাকিলে কোনও কর্ম্মই purely ethical হইতে পারে না। তাহাতে সংসারের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেই হয়। বৌদ্ধও যে এটুকু বুঝিতেন না এমন নহে; sacrifice for the sake of sacrifice, যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞ, যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, কোনওরূপ প্রলোভনের সম্পর্কে আসিলেই উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, সেটুকু তিনিও বুঝিয়াছিলেন; তবে ইহার philosophical basis তিনি খুঁজিয়া পান নাই। আত্মাকে অস্বীকার করিয়া তিনি তাহার ভিত্তি গোড়াতেই উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। Doctrinal basis দৃঢ় না হইলেও বৌদ্ধেরা কার্য্যতঃ একটা concrete দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়াছিল, যাহার চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ পায় নাই। স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবন এই দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেবের পক্ষে বাহিরের কোনও প্রলোভন ছিল না; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে কেবল ভিতরের প্রেরণায় নিজের সমস্ত জীবনটাকে জীবলোকের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, পুরুষ যজ্ঞের এত বড় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই; doctrine এর ভিত্তিটা তেমন দৃঢ় ছিল না বলিয়াই বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের personalityর এই আদর্শটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল; এবং কাব্যে, কথায়, গল্পে, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে, সহস্র উপায়ে এই আদর্শকে জনসমাজের চোখের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল; এবং বুদ্ধদেবের ইহ জীবনে সন্তুষ্ট না হইয়া সহস্র পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিয়া নানা জন্মে নানা অবদানের উপাখ্যান প্রচার করিয়াছিল। সর্ব্বত্রই সেই এক কথা। করুণাসিন্ধু ভগবান জীবহিতের

জন্য আপনার দেহ এবং প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। করুণাসিন্ধুর দয়া অসীম; কৃমি কীট কেহই বাদ যায় না; সকলকেই রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা আপনার প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই জন্যই কতকটা বাধ্য হইয়া বৌদ্ধগণকে মূর্ত্তি গড়িয়া বুদ্ধপূজা প্রচলন করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টানেরা এই যজ্ঞ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে বেদপন্থীর সহিত খৃষ্টানের মিল বরং অধিক; কেন না খৃষ্টান ঈশ্বরবাদী। ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানব জাতির হিতার্থ আপানাকে বলি স্বরূপে অর্পণ করিতেছেন। এই sacrifice এর জন্যই Christএর অবতরণ। খৃষ্টানের নিকট যে ঘটনা একবার মাত্র ঘটিয়াছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধের নিকট তাহা বহুবার ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। Christian ethicsএর ও ভিত্তি পত্তন এই যজ্ঞব্যাপারে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ইহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই; সেই পুরুষ সূক্তেই আমরা Redeemerএরও প্রথম সন্ধান পাই। বিরাট পুরুষ স্বয়ং সেই Redeemer; তিনি জগৎ হিতের জন্য আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহার সহস্র চক্ষু সেই জগতের দিকে চাহিয়া আছে; সহস্র পদদ্বারা সেই জগতে তিনি ভ্রমণ করিতেছেন। অন্যত্র তাঁহাকে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতো মুখঃ, বিশ্বতঃ পাণিঃ উত বিশ্বপাৎ - বলা হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপবর্ণনায় অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র ইত্যাদি বিশেষণও মনে করিবেন। আমাদের প্রধান দেবতাগণের বহু মস্তক বহু লোচন বহু হস্ত প্রভৃতি কল্পনার গোড়া এইখানে। বৌদ্ধদিগের saviour অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের রূপকল্পনাও এইরূপ। অবলোকিতেশ্বরের বহু হস্ত ও বহু মস্তক। অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিতে থাকে থাকে অনেকগুলি মাথা সাজান রহিয়াছে দেখা যায়। অবলোকিতেশ্বরের অন্য নাম "সমন্তমুখ," চারিদিকে যাহার মুখ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন চতুরানন ব্রহ্মার অনুরূপ করিয়া ইহাঁর মূর্ত্তি কল্পনা করা

হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অবলোকিতেশ্বরের বাহন হংস, ইহাতেও সেই অনুমান সমর্থন করে। বেদমতে হংস আত্মার রূপ ; বৌদ্ধ মতে হংসের কোনও সার্থকতা নাই। অবলোকিতেশ্বর ব্রহ্মার মতই রক্তবর্ণ, এবং রক্ত পদ্মের উপরে আসীন। বৌদ্ধ Trinityর কথা আগে বলিয়াছি ; ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ব এবং মানুষ বুদ্ধ এই তিন লইয়া সেই Trinity। বর্ত্তমান জগতের ধ্যানী বুদ্ধের নাম অমিতাভ ; তাঁহার আনুষঙ্গিক বোধিসত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর, এবং মানুষ বুদ্ধের নাম শাক্যমুনি। এই অমিতাভকে আমরা খৃষ্টানদের God the Fatherএর অনুরূপ মনে করিতে পারি। অমিতাভের সহিত অবলোকিতেশ্বরের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মত ; অতএব অবলোকিতেশ্বর খৃষ্টানদের Son of God বা Christএর স্থানীয়। এই Christ মানব দেহ ধরিয়া যীশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের সেই যীশু বৌদ্ধদের মানুষ বুদ্ধ শাক্যমুনির স্থানীয়। Christ তাঁহার fatherএর পার্শ্বে বসিয়া মানব জাতির জন্য সর্ব্বদা করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। যে লোকে তিনি আছেন, সেই লোক খৃষ্টানদিগের Heaven ; তিনি আবশ্যক মত নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া মানব জাতির নিষ্ক্রয় বা ransom রূপে আপনাকে বলি দিয়াছেন। অবলোকিতেশ্বরও সেইরূপ সুখাবতী নামক লোকে অমিতাভ বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের প্রতি চারিদিকে চাহিয়া আছেন এবং সর্ব্বজীবের দুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন। তিনি মানুষ বুদ্ধ রূপে কপিলবাস্তুতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব যে পথ দেখাইয়াছিলেন, উহা উৎকট সাধনার পথ। পথে চলিতে চলিতে বহুজন্মের সাধনায় অবিদ্যা মোচন হইলে তবে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। নির্ব্বাণ অতি দুর্ল্লভ জিনিষ, তাহা বৌদ্ধেরাই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সর্ব্ব সাধারণের উদ্ধার

লাভের একটা সহজ বন্দোবস্ত না হইলে ভগবানের করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই বৌদ্ধদিগকে এই অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কল্পনা করিতে হইয়াছিল। ইনি প্রকৃত পক্ষে saviour; জীবের উদ্ধারই ইঁহার একমাত্র কার্য্য। ইঁহার পত্নী তারা দেবী প্রকৃতই ভবতারিণী। হিন্দুরা এই তারা দেবীকে বৌদ্ধের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা উভয়েরই কোন সাধারণ মূল ছিল, ভারত ইতিহসের লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কৃত না হইলে তাহার মীমাংসা হইবে না। খৃষ্টের পত্নী নাই, তবে মাতা আছেন,—Virgin Mary; তিনি কতকটা তারাদেবীর অনুরূপ।

বৌদ্ধেরা বেদকে যতই অগ্রাহ্য করুন, এই ব্যাপারে বেদবাদের গন্ধ প্রচুর পাওয়া যায়। বুদ্ধ অমিতাভ, নামেই তাহার পরিচয়! ইংরাজী তর্জ্জমায় ইঁহাকে বলা হয় Buddha of Boundless Light। এই জ্যোতির কথা বেদের কথা। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ, light; অন্যান্য দেবগণ স্বয়ং প্রকাশ না হইলেও আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। এই জ্যোতির্ম্ময়তা বাদ দিলে ব্রহ্মণ্য আদৌ টিকে না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই জ্যোতিঃ পদার্থের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বুদ্ধ অমিতাভের আর একটি নাম "বুদ্ধ অমিতায়ু"। বৈদিক শাস্ত্রে পদে পদে নিত্যবস্তুর উল্লেখ আছে; বৌদ্ধমতে সমস্তই অনিত্য ও ক্ষণিক; মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা সমস্ত বস্তুকেই শূন্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। অথচ এই চিরজীবী "অমিতায়ু বুদ্ধ" তিব্বত হইতে চীন জাপান কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া জুড়িয়া বসিয়া আছেন। খাঁটী বৌদ্ধমতে eucharist ভক্ষণ বা ইড়া ভক্ষণের বিশেষ সার্থকতা থাকিতে পারে না; অথচ এসিয়া মহাদেশের উত্তর অঞ্চল ব্যাপিয়া

সকলে eucharist ভক্ষণ দ্বারা অমিভায়ু বুদ্ধের একাত্মতা লাভে অমরতা পাইবার জন্য ব্যাকুল। বৌদ্ধরা বেদকে যতই অবজ্ঞা করুন, এই অমিতাভ বুদ্ধ বা অমিতায়ু বুদ্ধকে তাঁহারা বেদ হইতেই পাইয়াছেন, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। তৎপরে অবলোকিতেশ্বর। মহাযানী বৌদ্ধ দিগের practical religion এ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব স্বয়ং বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। চীনে ভাষায় অবলোকিতেশ্বরে নাম "কোয়াং য়িং"। খৃষ্টান পাদরিরা চীন মুলুকে ইহার সহিত খৃষ্টের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন; এবং কোনও অতীত কালে খৃষ্টান মিশনারীরা চীন মুলুকে প্রবেশ করিয়া খৃষ্ট পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, অবলোকিতেশ্বর পূজা তাহারই অবশেষ, এইরূপ অনুমানে কুণ্ঠিত হন নাই! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই "কোয়াং য়িং" দেবতার নানা মূর্ত্তির মধ্যে এক প্রধান মূর্ত্তির সহস্র চক্ষু এবং সহস্র হস্ত। আরও আশ্চর্য্য যে এই দেবতার নামান্তর "বাক্" অর্থাৎ ইনি বাগ্‌দেবতা বা শব্দ ব্রহ্ম। পাদরী Beal সাহেব তাঁহার Catena of Buddhist scriptures from Chinese নামক গ্রন্থে চীন দেশের অবলোকিতেশ্বরের পূজার প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, যে সময়ে বুদ্ধবাক্য সঙ্কলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, সেই সময়ে সেই ঘটনার স্মরণার্থ অবলোকিতেশ্বরের বাক্য-রূপত্ব কল্পিত হইয়াছিল! বাগ্‌দেবতা এবং শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার পর ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্বেষণে অধিক দূর যাইতে হইবে না। মনে রাখিবেন, Christ মানবদেহধারী Logos অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম। খৃষ্টের সহিত অবলোকিতেশ্বরের সাদৃশ্য কোথা হইতে কিরূপে আসিল, এ সম্বন্ধে অলমতি বিস্তরেণ!

এই বুদ্ধ অমিতায়ুঃ এবং তাঁহার পুত্র অবলোকিতেশ্বর যে লোকে বাস করেন, সেই লোকের নাম সুখাবতী। এই সুখাবতীর ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় বৌদ্ধ

লেখনী অনন্তনাগের মত সহস্রজিহ্ব হইয়া পড়িয়াছে। Max Mullerএর প্রকাশিত সুখাবতী ব্যূহ নামক গ্রন্থখানি আনাইয়া রাখিয়াছি, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখুন। স্বয়ং বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন, ওহে আনন্দ, যে পশ্চিমদেশে সুখাবতী নামে বুদ্ধক্ষেত্র আছে, সেখানে অসংখ্য বোধিসত্ত্বেও শ্রাবকগণে পরিবৃত হইয়া অমিতাভ বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। তিনি বজ্রাসনে আসীন ; উহা diamond throne। অমিতাভ অন্ত প্রভা, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। অপরিমিত তাঁহার আয়ুর প্রমাণ। সুখাবতীতে কেবলই রত্ন বৃক্ষ, সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদূর্য্যময় ; তাহার ফল সকল স্ফটিকময় ; সেখানকার পুষ্করিণীতে রত্ন পদ্ম ফুটে, সেই সকল পদ্ম হইতে শত সহস্রকোটি রশ্মি বিকীর্ণ হয়। তাহার চারি দিকে রত্ন পর্ব্বত ; সেই সকল পর্ব্বতের পার্শ্বে ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মপুরোহিত মহাব্রহ্ম সকল বাস করেন। সেই সকল পর্ব্বত হইতে যে সকল নদী নির্গত হইতেছে, বুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের সুরভি বারি বহন করিতেছে ; রত্নময় পুষ্প স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে ; উভয় তীরে নানা জাতীয় পশু পক্ষী শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখকর শব্দ করিতেছে ; সেই শব্দ মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, পারমিতা মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে। সেখানে কোনও অসুর প্রেত তির্য্যক যোনির প্রবেশ নাই। সেখানকার অধিবাসীরা রত্নময় মুকুট কুণ্ডল কটক কেয়ূর প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত। সেখানে চিরকাল মৃদু মন্দ সুরভি বায়ু বহিতেছে। সে দেশ সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়; অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। ভগবান্ অমিতাভের চতুঃপার্শ্বে বুদ্ধগণের সংখ্যা গঙ্গানদীর বালুকাপ্রমাণ ; তাঁহারা সকলেই অমিতাভের নাম কীর্ত্তন ও গুণগান করিতেছেন। অমিতাভের চারিদিকে বোধিসত্ত্বগণের সংখ্যা গঙ্গানদীর বালুকা প্রমাণ ; তাঁহারা সেই অমিতাভকে পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার বন্দনা ও উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাদের গাত্র হইতে শতসহস্র কোটী প্রভা নির্গত হইতেছে।

এই বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। সেখানে অর্হতের সংখ্যাও অপরিমিত—শত কোটী, কি সহস্র কোটী, কি শত সহস্র কোটী তাহা গণা যায় না।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। বৌদ্ধদিগের এই সুখাবতীর বর্ণনার সহিত আমাদের পুরাণে ও আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোলোকের এবং ব্রজমণ্ডলের বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন। সর্ব্বত্রই দেখিবেন মণি রত্ন বৈদূর্য্য প্রবালের ছড়াছড়ি, সর্ব্বত্রই নদীতে রত্ন পুষ্প ভাসিতেছে। রত্ন বৃক্ষে মাণিকের ফল ঝুলিতেছে ; রত্ন সজ্জায় ভূষিত নরনারী ক্রীড়া করিতেছে। সর্ব্বত্রই গান এবং বাদ্য এবং উৎসব। সর্ব্বত্রই সেই একই কথা—আলো আর আলো আর আলো ; আনন্দ আর আনন্দ আর আনন্দ। সুখাবতীর বোধিসত্ত্বগণের ও অর্হৎগণের স্থলে গোলোকে গোপগণ ও গোপীগণকে বসাইবেন। এক এক যূথেশ্বরী গোপীর শত সহস্র অনুচরীকে বসাইবেন। ফলে একের বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যাইবে। বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব,—কে কাহার নিকট ধার করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে চাহি না ; তবে মূল অন্বেষণ কোথায় করিতে হইবে, তাহাও খুলিয়া বলা অনাবশ্যক।

বৌদ্ধেরা এক বাক্যে এই সুখাবতীর অবস্থান "পশ্চিমায়াং দিশি" কল্পনা করিয়াছেন। সে কোথায় ? পৌরাণিকের কল্পনায় ক্ষীরসমুদ্রের তটে শ্বেতদ্বীপ—সেও ত পশ্চিমে। King Arthur তাঁহার তিরোভাবের পর যে Avallon দ্বীপে গিয়াছেন, আর ফিরেন নাই, সে দ্বীপও ত পশ্চিমে। সেই island valley of Avallon,—

Where falls not hail, or rain, or any snow,
Nor ever blows wind loudly, but it lies
Deep meadowed, fair with orchard lawns.

এই বর্ণনা কি সুখাবতীর দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র ?

আর পারেন যদি, খ্রীষ্টানদের Heaven এর সহিতও এই সুখাবতীর একবার তুলনা করিয়া লইবেন। হাতের কাছে Paradise Lost খানা খুলিয়া দেখুন। 'দেখুন, সেখানে "above the starry spheres" Father God বসিয়া আছেন—তিনি immortal Eternal (অমিতায়ু) এবং Fountain of light (অমিতাভ) জ্যোতির্ম্ময় "Invisible amidst the glorious brightness"; সেইখানে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে বসিয়া তিনি চারিদিকে চাহিয়া আছেন—

From the pure empyrean where he sits
High-throned above all highth, bent down his eye,
His own works and their works at once to view.

তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার পুত্র Son-God বসিয়া আছেন—

"And in the face
Divine compassion visibly appear'd,
Love without end, and without measure grace."

তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য archangels ও angels সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতি গায়িতেছে—

... ... ... ... Heav'n rung
With jubilee, and loud hosannas fill'd
Th' eternal regions: Lowly reverent
Towards either throne they blow, and to the ground
With solemn adoration down they cast
Their crowns inwove with amaranth and gold,
And flow'rs aloft shading the fount of life,
And where the river of bliss through midst of Heaven
Rolls o'er Elysian flowers her amber stream.
... ... ... ... The bright
Pavement, that like a sea of Jasper shone,
Impurpled with celestial roses smiled.

আর দরকার নাই। সুখাবতীর অক্ষরে অক্ষরে ইংরেজি তর্জ্জমার মত শুনায় না কি ?

মানুষের "ransom"—বেদের ভাষায় নিক্রয়—দরকার,

তজ্জন্য Son God প্রার্থনা করিলেন—

Behold me then; me for him, life for life
I offer, on me let Thine anger fall;
Account me Man; I for his sake will leave
Thy bosom, and this glory next to Thee
Freely put off, and for him lastly die
Well pleased, on me let Death wreak all his rage."

পুরুষ সূক্তের প্রার্থনা মনে করিয়া এই প্রার্থনার সহিত বুদ্ধদেবের প্রার্থনাটাও মিলাইয়া যাইবেন—"কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোকঃ'—কলি রূপলোকে যত পাপ আচরণ করিয়াছে, তাহা আমার উপর পতিত হউক, লোক তাহা হইতে মুক্তিলাভ করুক।

কথার জঙ্গলে পথহারা হইয়াছেন নিশ্চয়; শেষে একবার sum up করা যাউক। বেদপন্থীর মুক্তি, বুদ্ধপন্থীর নির্ব্বাণ—উভয়ের পক্ষে জগৎ মিথ্যা—ইহপরকাল নাস্তি, স্বর্গ নরক নাস্তি; চিত্রে representation হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলীও সেদিন বলিয়াছিলেন—হিন্দুর মন্দিরের অভ্যন্তরে কোনও ভাস্কর্য্য ও চিত্র থাকে না ইহাই সাধারণ নিয়ম। মুক্তি বা নির্ব্বাণের অনুরূপ কোনও অবস্থা খ্রীষ্টানিতে নাই। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাকালে দেবযানে গতি, আর দেবতার সহিত একাত্মতা-লাভের চেষ্টায় দেবতার সালোক্য সমীপ্য সাযুজ্য সারূপ্য লাভ—ইহা হইতে পৌরানিক হিন্দুর ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকের গতি; উহা মুখ্যতর ভক্তিমার্গে প্রাপ্য—ওখান হইতে সংসারে ফিরিতে হয় না।

সাধারণ হিন্দুর পক্ষে উহা ভবসংসার হইতে নিষ্কৃতি—শমন ভয় হইতে নিষ্কৃতি। বৌদ্ধমতে ইহা অনাগমীর অবস্থা—অনাগমীরা শীল (সৎকর্ম্ম ও সমাধি (যোগবল) দ্বারা এই অবস্থা পান ; ফলে রূপলোকে বা ব্রহ্মলোকে গতি হয়—সেখান হইতে ফিরিতে হয় না। হিন্দুর পক্ষে ইহার চরম পরিণতি গোলোকে—বিষ্ণুলোকেরও উর্দ্ধে ; সেখানে যুগল উপাসকদের স্থান। বৌদ্ধগণের চরম পরিণতি সুখাবতীতে—সেখানে বোধিসত্বগণের ও অর্হৎগণের স্থান। শীল ও সমাধির উপরে প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) দ্বারা অর্হতেরা এই লোকে স্থান পান। কিন্তু গোলোকবাসীও মুক্ত নহেন, সুখাবতীবাসীও নির্ব্বাণ পান নাই।

হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে যদি কোনও representation থাকে, তাহা এই অবস্থায়। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে painting গুলি এই অবস্থা জ্ঞাপক।

বেদের পিতৃযানের পরিণতি নরলোক হইতে দেবলোকে যমলোকে বা নরকে যাতায়াত। সাধু বা অসাধু কর্ম্মের ফলে এই সকল লোকে কিছুদিনের জন্য যাতায়াত করিতে হয়। ইহাই সুখদুঃখের বন্ধন ; অতএব ইহা বদ্ধাবস্থা। হিন্দুর ভাষায় ফলকামনা, বৌদ্ধের ভাষায় তৃষ্ণা এই গতায়াতের হেতু। বৌদ্ধমতে এই সমুদয় লোক মারের অধীন। মারের নামান্তর কাম। দেবলোক, নরলোক, যমলোক, নরক, সমুদয়ই কামলোকের অন্তর্গত—এক পর্য্যায়ের জিনিষ—কেবল এ ঘর আর ও ঘর। এ বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ এক মত।

মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে এই কামলোকের চিত্র পাইবেন। অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য হইতে নরলোকের সুখ দুঃখ এবং নরকের যাতনা সবই চিত্রিত দেখিবেন। দেবতাদের নানা খেলার সহিত মানবজীবনের সমুদয় খেলা পর্য্যন্ত দেখিবেন। রাজারাজড়ার কাণ্ড হইতে গরিব

গৃহস্থের গৃহস্থালী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন। এমন কি, ভগবান বুদ্ধের মর্ত্তালীলার চিত্র হইতে মানবদেহধারী রামচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের লীলা পর্য্যন্ত দেখিবেন। সবই কামলোকের ব্যাপার। বৌদ্ধেরা ইহার জঘন্য দিক্‌টা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কেননা দুঃখবাদী বৌদ্ধের নিকট কামলোক বর্জ্জনীয়, জঘন্য, কুৎসিত। আনন্দবাদী ব্রাহ্মণ ইহাকে কুৎসিত ভাবেন না। হিন্দুমন্দিরে জঘন্য চিত্র দেখিলে তাহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বুঝিবেন।

খ্রীষ্টানের Heavenকে আমরা গোলোক ও সুখাবতীর অনুরূপ মনে করিতে পারি। খ্রীষ্টান transmigration মানেন না; কাজেই পিতৃযানের অনুরূপ কিছু খ্রীষ্টানিতে নাই। Heaven এর পরে একেবারে Hell; Heaven খ্রীষ্টের রাজ্য, ওখানে অনন্ত সুখ; Hell শয়তানের রাজ্য, সেখানে অনন্ত দুঃখ। মাঝামাঝি কিছু নাই। কাজেই খ্রীষ্টানের নিকট পরকালটাই সব—ইহকাল কিছুই নহে। বৌদ্ধ ইহা অবৈজ্ঞানিক বলিবেন। Roman Catholic Christianরা একটা Purgatory মানেন; সেখানে পাপী শাস্তিভোগ করিয়া কতকটা বিশুদ্ধি পায়। Protestant রা সেই Purgatory ও উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যে পাপী খ্রীষ্টের শরণ লয় নাই, তাহার কোনও আশাই নাই। আর খ্রীষ্টানদের Doctrine of Pre-destination—তদনুরূপ কোনও কিছু হিন্দু বা বৌদ্ধ মতে পাইবেন না।

আর না। এইখানে কথা ইতি করা যাক্।”

সম্পূর্ণ।